

প্রেত-কুকুর

অনীশ দাস অপু





অক্টোবর-২০১২

প্রেত-কুকুর



প্রকাশক

লায়ন আ. ন. ম. মিজানুর রহমান পাটওয়ারী পিএমজেএফ

মিজান পাবলিশার্স

৩৮/৪ বাংলাবাজার (তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০

ফোন : ৯৫১২৯৪৬, ৭১১১৪৩৬

মোবাইল : ০১৫৫২৩৯১৩৪১, ০১৭১১ ৪০০২১৮

ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৫১২৯৪৬

E-mail : info@mizanpublishers.com

www.mizanpublishers.com

প্রকাশকাল : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২

প্রচ্ছদ

মাওদুদুর রহমান

বর্ণবিন্যাস

লাভলী কম্পিউটার্স

৩৮ বাংলাবাজার (চতুর্থ তলা),ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ

লাভলী প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রিজ (প্রাঃ) লিমিটেড

২৪ই শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

ফোন ৭১১২৩৯৫

মূল্য

১৫০ টাকা মাত্র

ISBN

987-984-8163-80-4

PRET-KUKUR by ANISH DAS APU

Published by Ln. A. N. M. Mizanur Rahman Patoary PMJF

Mizan Publishers, 38/4 Banglabazar (2rd Floor), Dhaka-1100

Printed by : Lovely Printers & Packaging Industries (Pvt) Limited

24E Srish Das Lane, Dhaka-1100

উৎসর্গ

যাঁরা ভালবাসেন বিশ্বখ্যাত থ্রিলার লেখকদের সেরা রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী পড়তে, সেই পাঠকদেরকে

ভূমিকা

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আমরা বের করলাম সুপার-থ্রিলার সিরিজের প্রথম বই প্রেত-কুকুর। এ বইতে বিশ্বখ্যাত তিন রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিকের অন্যতম বিখ্যাত তিনটি থ্রিলার ছাপা হলো। প্রথম উপন্যাস স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের প্রেত-কুকুর খানিকটা হরর টাইপের মনে হলেও শেষের দিকের দুর্দান্ত চমকটি সত্যি চমকিত করে পাঠককে। দ্বিতীয় উপন্যাস আগাথা ক্রিস্টির অদৃশ্য আততায়ী পুরোপুরি একটি রহস্য উপন্যাস। এটিকে একটি গোয়েন্দা উপন্যাসও বলা চলে। এ উপন্যাসটি বাংলাদেশী পটভূমিকায় দারুণভাবে অ্যাডাপ্ট করেছেন সুলেখক কাজী সারওয়ার হোসেন। আর সর্বশেষ উপন্যাস অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিনের রাত্রি অন্ধকার সম্পূর্ণ একটি অ্যাডভেঞ্চার থ্রিলার। উপন্যাসটির গা টানটান কাহিনী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে পাঠকদের। আশা করি আমাদের নির্বাচিত এ তিনটি উপন্যাসই রহস্য রোমাঞ্চ প্রিয় পাঠকদের প্রভূত আনন্দ দেবে।

সুপার থ্রিলার সিরিজের উদ্দেশ্য পৃথিবী বিখ্যাত থ্রিলার রাইটারদের সেরা রোমাঞ্চ উপন্যাসগুলোর অনুবাদ কিংবা অ্যাডাপটেশন। এ সিরিজের থ্রিলারের মধ্যে অ্যাকশন, অ্যাডভেঞ্চার, মিস্ট্রি, হরর ইত্যাদি সবই থাকবে। আমাদের উদ্দেশ্য কম দামে ভাল মানের বই পাঠকদের হাতে তুলে দেয়া। আমরা প্রতি মাসেই *সুপার থ্রিলার* সিরিজ থেকে একটি করে বই উপহার দেয়ার আশা রাখি। আগামী মাসে *সুপার থ্রিলার* সিরিজ থেকে বেরুচ্ছে সাড়া জাগানো ইন্টারন্যাশনাল বেস্টসেলার সাইকো-ইরোটিক থ্রিলার *বেসিক ইন্সটিংক্ট*, পাঠক অপেক্ষায় থাকুন!

অনীশ দাস অপু

সূচিপত্র

এক

একটা কাঠের ছড়ি।

মাথাটা কন্দাকৃতি, হাতলের ঠিক নিচেই ইঞ্চিখানেক চওড়া একটা রূপোর পাটি-তার ওপর খোদাই করা-জেমস মার্টিমার, এম.আর.সি-কে সি.সি.এইচ-এর বন্ধুবর্গ।

গত রাতে দেখা করতে এসে এক ভদ্রলোক ছড়িটা ফেলে গেছেন। আজ সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে বসে সেটাই হয়ে উঠল আমাদের দু'বন্ধুর গবেষণার বিষয়।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি। তিনি কে, কী করেন, দেখতে কেমন, কিছুই জানা নেই।

হোমস বলল-ছড়ি পরীক্ষা করে ভদ্রলোকের বর্ণনা দাও দেখি।

বন্ধুর পদ্ধতি আমার অজানা নয়। সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে-বুঝতে পারলাম, ডক্টর মার্টিমার যথেষ্ট পয়সাওয়ালা চিকিৎসক, বয়স্ক, স্বীকৃতিস্বরূপ পরিচিতেরা শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে তাঁকে দিয়েছে ছড়িখানা।

এককালের বাহারি ছড়ি এখন অনেক মলিন, ডগায় আঁটা লোহার টুপিও ক্ষয়ে এসেছে। ভদ্রলোক যে ছড়ি হাতে প্রচুর হাঁটাহাঁটি করেছেন বুঝতে কষ্ট হয় না। শহুরে চিকিৎসকের হাতের ছড়ি এত চোট খায় না, নিশ্চয়ই তিনি গ্রামের ডাক্তার।

সনাক্তকরণের পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ দেখিয়ে বন্ধুকে তাক লাগিয়ে দিয়েছি ভেবে বেশ আত্মপ্রসাদের দৃষ্টি নিয়ে তাকালাম হোমসের দিকে।

হোমস্ আমার হাত থেকে ছড়িটা নিয়ে আতস কাচ দিয়ে কী যেন পরীক্ষা করল। তারপর বলল-ওয়াটসন, ভদ্রলোক গ্রামের ডাক্তার ঠিকই বলেছো, হাঁটেনও এন্তার। কিন্তু এরপরে তোমার সব অনুমানই ভুল। অবশ্য তোমার ভুলগুলোই আমাকে সঠিক সিদ্ধান্তের পথ দেখিয়ে দেয়।

দেখ, উপহার জিনিসটা ডাক্তাররা সাধারণতঃ হাসপাতাল থেকেই পায়। রোগীদের কাছ থেকে তেমন একটা ঘটে না।

হাসপাতালের নামের আগে সি পি লেখাটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে চেরিং ক্রস হাসপাতাল। তার মানে ভদ্রলোক গ্রামে আসার আগে শহরে প্র্যাকটিস করেছিলেন। ছড়ির তারিখ দেখে বোঝা যায় হাসপাতাল ছেড়েছেন পাঁচ বছর আগে। শহরেও জমজমাট প্র্যাকটিস না থাকলে চাকরি জোটে না। আর যাদের প্র্যাকটিস ভালো তারা শহর ছেড়ে গ্রামে যাবেন কোন দুঃখে?

আমার যদ্দুর ধারণা ভদ্রলোক হাসপাতালে বেতনভুক্ত ছিলেন না। মানে হাউস সার্জন বা হাউস ফিজিশিয়ান হয়েই ছিলেন।

তাহলে দাঁড়াচ্ছেটা কী- ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি।

উচ্চাশাহীন আর অন্যমনস্ক এই ভদ্রলোক গতকাল আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে গেছেন। লাঠিটা পরীক্ষা করে আরো জানা গেল টেরিয়ারের চেয়ে একটু বড় এবং মাসটিফের চেয়ে একটু ছোট একটা কুকুরের মালিক তিনি।

হোমসের বিবরণ শুনে মেডিক্যাল ডাইরেকটরী নামিয়ে সহজেই নামটা খুঁজে পেলাম। দেখলাম-হোমসের অনুমানই ঠিক। চেরিংক্রস হাসপাতালে ভদ্রলোক ১৮৮২ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত হাউস সার্জন ছিলেন। প্যাথলজির ওপর প্রবন্ধ লিখে জ্যাকসন পুরস্কার লাভ করেন।

- কিন্তু ভদ্রলোকের কুকুরের হদিস তুমি পেলে কী করে?

- ছড়ির ওপরে কুকুরের দাঁতের দাগ দেখে। মাঝখানের ফাঁকটুকু থেকে চোয়াল পর্যন্ত কতটা চওড়া তা বোঝা যায়। আমার মনে হয়, কুকুরটা স্প্যানিয়াল।

আমাদের আলোচনার মধ্যেই দরজায় বিজ্ঞান সাধক ডক্টর জেমস মার্টিমারের আবির্ভাব হল।

ছিপছিপে লম্বা চেহারা, পাখির চঞ্চুর মত তীক্ষ্ণ নাক; চোখে সোনার চশমা-উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

ঘরে ঢুকেই হোমসের হাতের ছড়িটার দিকে চোখ পড়ল। বললেন- বাঁচলাম-কোথায় যে ফেলেছি ছড়িটা ভেবে পাচ্ছিলাম না। বিয়ের পর হাসপাতাল ছেড়ে যাবার সময় বন্ধুরা দিয়েছিল। আমি নিশ্চয় মি. শার্লক হোমসের সাথে কথা বলছি?

- হ্যাঁ-ইনি আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসন।

- আপনাদের যুগল নাম এবং কীর্তি আমার অজানা নয়। পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। মি. হোমস, হঠাৎ একটা গুরুতর সমস্যায় পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। ব্যবহারিক বুদ্ধি আমার কম, তাই আপনার সাহায্য আমার দরকার।

- কি ধরনের সমস্যায় আমার সহযোগিতা আপনি চাইছেন?

ডক্টর মার্টিমার আসন গ্রহণ করে তাঁর কোটের পকেট থেকে একটা খাতা বার করে বললেন, 'এটা একটা পান্ডুলিপি-১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের। একটা পারিবারিক পান্ডুলিপি।

স্যার চার্লস বাস্কারভিল আমার জিম্মায় রেখে গেছেন। আমি ছিলাম তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু এবং চিকিৎসক। মাস তিনেক আগে ডেভনশায়ারে আকস্মিকভাবে তাঁর শোচনীয় মৃত্যু ঘটে।

হোমস পান্ডুলিপিটা নিয়ে হাঁটুর ওপর বিছিয়ে ধরল। হলদেটে ফিকে হয়ে আসা কাগজ। মাথায় লেখা বাস্কারভিল হল, ১৭৪২।

তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে দেখতে হোমসা বলল, বিবৃতি বলে মনে হচ্ছে?

- হ্যাঁ, বাস্কারভিল পরিবারে বংশপরম্পরায় একটা কিংবদন্তী চলে আসছে-এটা সেই কিংবদন্তীর বিবরণী। মি. হোমস্, ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরী। আমাকে আপনার সিদ্ধান্ত জানাতে হবে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে। লেখাটা আপনাকে আমি পড়ে শোনাচ্ছি তাহলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।

কৌতূহলী হোমস্ চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।

ডক্টর মার্টিমার পড়তে লাগলেন ঃ

আমি হিউগো বাস্কারভিলের বংশধর হিসেবে বাস্কারভিল কুকুরের রহস্যময় উৎপত্তি সম্পর্কে বাবার মুখে যা শুনেছি তাই এখানে লিখে রাখছি।

আমি বিশ্বাস করি আমার পরবর্তী বংশধরগণ এ কাহিনী পড়ে সাবধান হবে। পাপকর্মের সাজা বিধাতার অমোঘ বিধান। তবুও বিশ্বাস করি প্রার্থনা আর অনুতাপ থেকে অব্যাহতি দেয়।

আমি আশা করব আমার পুত্রগণ পরিণামদর্শী হবে, যে কর্মফলের অভিশাপ আমাদের পরিবার বহন করে চলেছে, তার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে।

মহাবিপ্লবের সময়ে বাস্কারভিল জমিদারের এই খামারবাড়ি হিউগো বাস্কারভিলের অধীনে ছিল। তিনি ছিলেন নাস্তিক এবং দুর্দান্ত প্রকৃতির মানুষ। উচ্ছৃঙ্খলতা এবং লাম্পট্যের জন্য তিনি গোটা পশ্চিম অঞ্চলে যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

বাস্কারভিল জমিদারির পাশেই এক তালুকদারের বসতি ছিল। একদিন হিউগো সেই তালুকদারের একমাত্র মেয়েটিকে খামারবাড়ি থেকে সাঙ্গপাঙ্গ দিয়ে তুলে নিয়ে এলেন। আটকে রাখলেন ওপরের একটি ঘরে। আর নিচে বসল মদ্যপানের আসর।

চিৎকার আর হৈ হট্টগোল শুনে ভাগ্যহীনা বন্দিনী মেয়েটি কিন্তু সাহস হারালো না। সে সাহসি ও তৎপর পুরুষ মানুষের মতো বাড়ির দক্ষিণ

দেয়ালের আইভি লতা বেয়ে নিঃশব্দে নেমে এলো নিচতলায়।

তারপর সেই রাতে জলাভূমির ওপর দিয়ে রওনা হল বাড়ির দিকে। ন মাইল দূরে মেয়েটির বাবার খামারবাড়ি।

কিছুক্ষণ পরে খাদ্য আর পানীয় নিয়ে হিউগো এলেন ওপরে বন্দিনীর ঘরে। ঘর ফাঁকা দেখে তিনি আর সেখানে দাঁড়ালেন না। শয়তান ভর করল তাঁর কাঁধে।

সেই রাতেই মেয়েটিকে মাঝরাস্তা থেকে ধরে আনবার সংকল্প নিলেন তিনি। তার মাতাল বন্ধুরাও উৎসাহিত হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করল।

হিউগোর আদেশে ঘোড়াশাল থেকে ঘোড়া বার করা হল, কুকুরশালা থেকে নেয়া হল হিংস্র কুকুরের পাল। মেয়েটির ফেলে যাওয়া একটি রুমাল তাদের শোঁকানো হলো।

সারবন্দী হিংস্র কুকুর সঙ্গে নিয়ে হিউগো ঘোড়ায় চেপে চন্দ্রালোকিত জলাভূমির ওপর দিয়ে ছুটে চললেন।

তার পেছনে তের জন বন্ধুর একটা দল ঘোড়ায় চেপে চলল।

মাইল খানেক যাবার পর সেই দলটার সঙ্গে দেখা হল একজন মেষপালকের। তাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল-হতভাগিনী মেয়েটিকে সে দেখেছে, পেছনে তাড়া করে চলেছে হিংস্র কুকুরের দল।

হিউগো বাস্কারভিলকেও কালো ঘোড়ায় চেপে ছুটে যেতে দেখেছেন- তার পেছনেও ছুটেছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো একটা প্রকান্ড কুকুর।

এই সময়ই তাদের পাশ দিয়ে ছুটে গেল হিউগোর কালো ঘোড়া। তার পিঠে জিন শূন্য-লুটোচ্ছে জলে। সেই দৃশ্য দেখে অজানা আতঙ্কে তাদের রক্ত হিম হয়ে গেল।

সেই অবস্থাতেই আরো খানিকটা এগিয়ে গেল তারা।

জলাভূমির ঢালু মতন জায়গাকে আমরা বলি গয়াল। সেরকম একটা জায়গায় গিয়ে কুকুরগুলোকে পেয়ে গেল তারা।

হিউগো বাস্কারভিলের প্রতিটা কুকুরই সাহসি। কিন্তু সবকটা কুকুরই দল বেঁধে ঘেউ ঘেউ করছে সেই গয়ালে।

সবকটি কুকুরই কেমন অস্থির। কেউ ঘন ঘন মুখ তুলে তাকাচ্ছে সামনের বিস্তৃত সংকীর্ণ উপত্যকার দিকে।

মাতালদের নেশা কেটে গেছে ততক্ষণে। সামনে এগুবার সাহস পাচ্ছে না কেউ। তবু তিনজনের একটা দল গায়ে গা লাগিয়ে খানিকটা আরো এগুলো।

ঢালু জায়গাটা শেষ হয়েই একটা প্রশস্ত চত্বর।

চাঁদের আলোয় ঝকমক করছে সেখানে খাড়া দুটো পাথর। চত্বরটার মাঝামাঝি জায়গায় দেখা গেল মেয়েটির নিষ্প্রাণ দেহ মাটিতে পড়ে রয়েছে।

পাশেই হিউগো বাস্কারভিলের দেহ। আর সেই দেহের পাশে দাঁড়িয়ে টুঁটি কামড়ে রয়েছে একটা অতিকায় জীব-অনেকটা দেখতে কুকুরের মতো।

হিউগোর টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে রক্তাক্ত মুখ তুলে তাকাল সেই কুকুরটা। তার চোখ আগুনের মত ধকধক করে জ্বলছে।

সাহসী তিন বন্ধু চোখের সামনে এই দৃশ্য দেখে আর দাঁড়াতে পারল না। বিকট স্বরে চিৎকার করতে করতে জলাভূমির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

শোনা যায়, সেই অপার্থিব কুকুর আর নারকীয় দৃশ্য দেখে এসে সেই রাতেই মারা যায় একজন-অন্য দুজন পাগল হয়ে যায়।

বাস্কারভিলের প্রেত-কুকুরের এই হলো আবির্ভাব কাহিনী। আর সেই ঘটনার পর থেকেই অনেক উপদ্রবের কারণ ঘটিয়েছে কুকুরগুলো। এ বংশের অনেকেরই মৃত্যু ঘটেছে আকস্মিক-রহস্যময়ভাবে। জানি না, এই অভিশাপ এখনো চেপে আছে কি না বংশের বংশধরদের ওপরে।

আমার পুত্র এবং উত্তরপুরুষদের জন্য আমার এই উপদেশ রেখে যাচ্ছি - তোমরা সর্বদা মহান পরমপুরুষকে স্মরণে রেখো- তাঁর আশীর্বাদ তোমাদের রক্ষা করবে।

আর জলাভূমির মাটিতে সন্ধ্যার পর অশুভ শক্তির অভিশাপ নেমে আসে-ও তল্লাটে সে সময়ে কেউ যেও না।

[বাস্কারভিল-কুকুরের অভিশপ্ত আবির্ভাবের এই কাহিনী হিউগো বাস্কারভিলের দুই ছেলে রজার আর জনকে বলা হয়েছে। নির্দেশ রয়েছে-বোন এলিজাবেথকে যেন কোন কথাই জানানো না হয়।]

রহস্যময় এই বিবরণ পড়া শেষ করে হোমসের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তুলে তাকালেন ডক্টর মার্টিমার। হোমস্ সিগারেটের টুকরোটা ছুঁয়ে ফেলে দিয়ে হাই তুলল।

- শুনলাম। তবে যারা রূপকথা সংগ্রহ করে বেড়ায় এ কাহিনী তাদের কাজে লাগবে বলে মনে হচ্ছে।

পকেট থেকে একটি ভাঁজ করা খবরের কাগজ বার করে বললেন ডক্টর মার্টিমার, এবারে আপনাকে সাম্প্রতিক একটা খবর শোনাই মি. হোমস্। কাগজটা ডেভন কাউন্টি ক্রনিকল। চোদ্দ জুন তারিখের।

কয়েকদিন আগে স্যার চার্লস বাস্কারভিলের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে এতে।

খবরের কাগজের বিবরণ থেকে জানা গেল -

সুপ্রাচীন বাস্কারভিল যখন দুর্দিনের কবলে সেই সময় স্যার চার্লস বাস্কারভিল বংশের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য উদ্যমী হয়েছিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই তিনি উদারতা ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। অল্প বয়সে দক্ষিণ আফ্রিকা গিয়ে ফাটকাবাজিতে প্রচুর টাকা আয় করেন। মাত্র বছর দুই আগে তিনি বাস্কারভিল হলে এসে বসবাস শুরু করেন।

বিরাট পরিকল্পনা নিয়ে তিনি সংস্কার কাজে হাত দেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সব কাজই বন্ধ হয়ে গেল।

স্যার চার্লস নিঃসন্তান, তাই চেয়েছিলেন নিজেই গোটা অঞ্চলের হারিয়ে যাওয়া সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু সে ইচ্ছে আর পূরণ হল না।

তাঁর মৃত্যু আপাতদৃষ্টিতে রহস্যময় মনে হলেও, তদন্তের ফলে প্রকাশ পেয়েছে, ঘটনার পেছনে কোন গোপন ষড়যন্ত্র ছিল না। এমন কি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল, তা নিতান্তই কুসংস্কারজনিত, তাও প্রমাণ হয়েছে। মৃত্যুর কারণ খুবই স্বাভাবিক।

বিপত্নীক স্যার চার্লস খুবই সাদাসিধা রুচির মানুষ ছিলেন। দান যেমন করতেন গোপনে-লোক জানাজানি না করে, তেমনি পছন্দ করতেন না আড়ম্বর বা বিলাসিতা।

বাড়িতে তাঁর সঙ্গে থাকত ব্যারিমুর দম্পতি। স্বামী খাস চাকর, স্ত্রী ঘরকন্নার পরিচালিকা।

কয়েক পুরুষ ধরে এই দম্পতি বাস্কারভিল পরিবারে কাজ করছে। ব্যারিমুর দম্পতি এবং স্যার চার্লসের কয়েকজন বন্ধুর জবানীতে জানা গেছে, কিছুদিন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছিল। বিশেষ করে তাঁর হার্টে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় তিনি অবসাদে ভুগছিলেন। প্রায়ই তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগতেন।

স্যার চার্লসের এক গৃহ চিকিৎসক ডক্টর জেমস মার্টিমারও তাঁর সাক্ষ্যে এই কথা বলেছেন।

রাতে শুতে যাবার আগে বাস্কারভিল হলের ইউ-বীথিতে বেড়ানোর নিয়মিত অভ্যাস ছিল স্যার চার্লসের।

পাঁচ জুন লন্ডন যাবার কথা ছিল। চার জুন যথারীতি বাগানে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর হাতে ছিল একটা চুরুট।

রাত বারটা নাগাদ হল ঘরের দরজা খোলা দেখতে পেয়ে ব্যারিমুর লণ্ঠন হাতে মনিবের সন্ধানে বেরোন। বৃষ্টিভেজা মাটিতে স্যার চার্লসের

পায়ের দাগ স্পষ্ট হয়ে পড়েছিল।

ইউ-বীথির বাগানের মাঝামাঝি জায়গায় পাশের জলাভূমির দিকে একটা ফটক আছে। ওই ফটকের সামনে স্যার চার্লস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন এমন চিহ্ন পাওয়া গেছে।

তারপর ইউ-বীথি ধরে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তাঁর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়।

ব্যারিমুর তার সাক্ষ্যতে বলেছেন, জলার দিকে গেট পেরিয়ে আসার পর থেকে স্যার চার্লস নাকি পথের শেষ পর্যন্ত আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটেছিলেন।

স্যার কেন এভাবে আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটেছিলেন, এই ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

মর্ফি নামে এক যাযাবর ঘোড়া ব্যবসায়ী ঘটনার সময় জলার ধারে ছিল। জবানবন্দীতে সে স্বীকার করেছে, মদ্যপানের ফলে সে সেই সময় প্রকৃতিস্থ ছিল না। তবে সেই অবস্থাতেই একটা আর্তচিৎকার সে শুনতে পায়-তবে সেটা কোন দিক থেকে এসেছিল বুঝতে পারেনি।

মৃতদেহের গায়ে ধস্তাধস্তির কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। যদিও মুখভাব ছিল অস্বাভাবিক রকমের বিকৃত।

ঐ অবস্থায় দেখে ডক্টর মার্টিমার প্রথমে বন্ধুর মৃতদেহ বলে চিনতে পারেন নি। পরে অবশ্য তিনি বলেছেন, দীর্ঘদিন অসুস্থ হৃদযন্ত্র নিয়ে বেঁচে ছিলেন স্যার চার্লস। হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে মৃত্যু হলে তীব্র শ্বাসকষ্টের দরুণ মুখভাব বিকৃত হতে পারে।

ময়নাতদন্তেও অবশ্য এই ব্যাখ্যার সমর্থন মিলেছে। চিকিৎসকের সাক্ষ্যর ভিত্তিতে রায় দিয়েছেন করোনারের জুরীগণ।

স্যার চার্লসের মৃত্যুকে ঘিরে যেসব অতিলৌকিক গুজব চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে এই সুপ্রাচীন ভবন হয়ত আতঙ্ক আর অভিশাপ বুকে করে শূন্যই পড়ে থাকত। বসবাস এবং সংস্কার কাজের জন্য উত্তরাধিকারীর সন্ধান পেতে কষ্ট হত। মৃত্যু সম্পর্কে জুরীদের রায় সেই দুঃখময় আশঙ্কা দূর করল। জানা গেছে, স্যার চার্লসের ছোট ভাই-এর ছেলে মি. হেনরী বাস্কারভিল বর্তমানে এই সম্পত্তির মালিক। যদিও তিনি জীবিত কি মৃত তা এখনো জানা সম্ভব হয়নি।

মি. হেনরী বাস্কারভিল আমেরিকায় ছিলেন। এখনো পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে এটুকু মাত্র জানা গেছে। গোটা বিবরণটা ধীর শান্তভাবে হোমস্ শুনল। তারপর বলল, ডক্টর মার্টিমার, কৌতূহল জাগানোর মত অনেক বিষয়ই কেসটায় আছে। মৃত্যু সম্পর্কে সবাই যা জেনেছে, এর বাইরে

আরও কিছু আছে বলে কি আপনি মনে করেন?

- মি. হোমস্, আমি একজন বিজ্ঞান সাধক। প্রচলিত কুসংস্কারে আমার বিশ্বাস নেই।

বাস্কারভিলকে ঘিরে গা ছমছমে কাহিনী লোকের মুখে ফিরছে। আমার কথায় তার সমর্থন কোনভাবে প্রচারিত হলে এ বাড়িতে আর কেউ থাকতে চাইবে না। এ কারণেই যা জানি তা কাউকে বলতে পারিনি।

জলাভূমিতে জনবসতি নেই বললেই চলে। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু পরিবারের বসবাস। প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হত বলে স্যার চার্লসের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল।

বেশ কয়েক মাইলের মধ্যে মেলামেশা করার মত ছিল প্রকৃতিবিদ মি. স্টেপলটন আর ল্যাফটার হিলের মি.ফ্রাঙ্কল্যান্ড।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বিজ্ঞানের অনেক খবর সংগ্রহ করে এনেছিলেন মি. চার্লস সে সব নিয়েই ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদের কেটে যেত।

যে কিংবদন্তীটা আপনাকে শোনালাম স্যার চার্লস সেটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। সন্ধ্যারাতে নিজের বাগানে পায়চারী করতেন ঠিকই, কিন্তু রাতে কখনোই জলায় যেতেন না।

তিনি বিশ্বাস করতেন, এই বংশ একটা ভয়াবহ অভিশাপ বহন করে চলেছে। বংশধরদের সকলকেই সেই অভিশাপের বলি হতে হবে।

গত কয়েক মাস ধরে লক্ষ্য করেছি - কথা প্রসঙ্গে ঘনঘন শোনাতেন পূর্বপুরুষদের দমবন্ধ হওয়ার মত সব ঘটনা। রাতে রোগী দেখতে বেরিয়ে অদ্ভুত কোন প্রাণী আমার চোখে পড়ে কি না প্রায়ই তা জিজ্ঞেস করতেন। তার মনে যেন চেপে বসেছিল একটা উদ্ভট কল্পনা-বিকট দর্শন একটা ভয়ঙ্কর প্রাণী সবসময় তাকে পেছনে অনুসরণ করছে। এসব উদ্ভট চিন্তার ফলে ক্রমশই স্নায়ুর ওপর অত্যাধিক চাপ পড়ছিল।

দুর্ঘটনা ঘটার হপ্তা তিনেক আগে এক সন্ধ্যায় গাড়ি নিয়ে গেলাম তার বাড়িতে। হলঘরের দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি।

আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, আমার কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন-যেন কোন বিভীষিকা দেখেছেন।

কৌতূহলী হয়ে পেছনে ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল - ছায়ার মত কি যেন একটা রাস্তার প্রান্তে সরে গেল। কালো একটা বাছুর বলেই মনে হল আমার। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আশেপাশে অনেক খুঁজলাম-কিন্তু কিছুই পেলাম না। ঘটনাটা স্যার চার্লসকে এত উত্তেজিত করে তুলল যে তিনি রীতিমত কাঁপছিলেন সেসময়।

সেদিন বেশ কয়েক ঘন্টা কাটালাম তাঁর সাথে। উত্তেজনার কারণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি এই পান্ডুলিপিটা আমার হাতে তুলে দেন।

আমার জিম্মায় রাখা সেই পান্ডুলিপি থেকেই আপনাকে বাস্কারভিল - কুকুরের অভিশপ্ত আবির্ভাবের বিবরণ পড়ে শোনালাম।

মি. হোমস্, এই তুচ্ছ ঘটনাটা সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত মতামত যাই থাক না কেন এখন যেন মনে হচ্ছে পরবর্তী দুঃখজনক ঘটনার সঙ্গে তার একটা যোগসূত্র থাকতে পারে। আপনাকে গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা দেবার জন্যই বললাম।

চার্লসের হার্টের অবস্থা ক্রমশই খুব খারাপ হয়ে পড়ছিল। ক্রমাগত ভয় আর উদ্বেগের মধ্যে থাকলে শরীরযন্ত্রে নানা রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

বাস্কারভিল হল থেকে কিছুদিন দূরে থাকলে অযথা উদ্বেগ থেকে মুক্তি পাবেন এবং ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠবেন-এই ভেবে আমিই তাঁকে লন্ডনে যেতে বলেছিলাম।

প্রকৃতিবিদ মি. স্টেপলটন আমাদের দুজনেরই বন্ধু। স্যার চার্লসের ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য তিনিও উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁকে লন্ডনে পাঠানোর ব্যাপারটা তাই তিনিও অনুমোদন করেছিলেন।

স্যারের মৃতদেহ আবিস্কার করার পরে সে- রাতেই আমাকে খবর দেয়া হয়। আমি আসার আগে মৃতদেহ কেউ স্পর্শ করেনি।

ঘটনার এক ঘন্টার মধ্যেই আমি বাস্কারভিল হলে উপস্থিত হই। খবরের কাগজের রিপোর্টে উল্লিখিত তদন্তের সব ঘটনাই আমি নিজে যাচাই করেছি।

বৃষ্টি হবার কারণে ভেজা মাটিতে পায়ের ছাপ বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। সেই ছাপ ইউ-বীথি দিয়ে জলার দিকে ফটকের যেখানে স্যার চার্লস কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন বলা হয়েছে, সে - জায়গা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছি।

সেখান থেকেই পায়ের ছাপের ধরন পাল্টেছে - মনে হয়েছে তিনি আঙুলে ভর দিয়ে হেঁটেছেন-তবে আশপাশে পরীক্ষা করে দেখেছি-নরম কাঁকর জমির ওপর অন্য কোন পায়ের ছাপ নজরে পড়েনি।

স্যার চার্লস মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েছিলেন। ছড়ানো দু'হাতের আঙুল দিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরা।

প্রচন্ড খিঁচুনির ফলে অস্বাভাবিক রকমের বিকৃত হয়ে গিয়েছিল চেহারা। দৈহিক আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না।

ব্যারিমুর জবানবন্দীতে বলেছিল, মৃতদেহের আশপাশের জমিতে কোন ছাপ পাওয়া যায়নি। ওর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল কিন্তু আমি একটু তফাতেই বেশ স্পষ্ট আরেকটা ছাপ দেখেছিলাম।

বলতে বলতে ডক্টর মার্টিমার দু সেকেন্ড থেমে আবার বললেন-একটা অতিকায় দানব-কুকুরের পায়ের ছাপ। মৃতদেহ থেকে অন্তত বিশ গজ দূরে পড়েছিল ছাপগুলো, তাই কেউ মাথা ঘামায়নি।

হোমস্ কৌতূহলী হয়ে উঠল। জিজ্ঞেস করল, কাউকে বলেননি একথা?

- বলে কোন লাভ নেই। কিংবদন্তীটার পায়ের ছাপ ছিল বলেই আমি মাথা ঘামাচ্ছি।

- জলাভূমিতে তো মেষপালকদের অনেক কুকুর থাকে, তাই না?

- তা থাকে। কিন্তু আমি যা দেখেছি, তা ভেড়াসামলানো কুকুরের ছাপ নয়।

- ইউ-বীথির এক জায়গায় একটা ফটক আছে বলছিলেন না?

- আছে। মাঝামাঝি জায়গায়, জলাভূমির দিকে।

- তার মানে ইউ-বীথিতে ঢুকতে হলে হয় বাড়ির দিক থেকে নয়তো জলার দিক থেকে আসতে হবে। আচ্ছা ডক্টর, ইউ-বীথির পথের ঘাসের ওপরে কোন ছাপ ছিল কি?

- ছাপগুলো ছিল জলার দিকের ফটকের রাস্তার ধার ঘেঁষে। ঘাসের ওপর কোন ছাপই পড়েনি।

- পুরো ব্যাপারটাই খুব ইন্টারেস্টিং। ছোট ফটকটা কি সেসময় খোলা ছিল?

- না, তালা বন্ধ ছিল।

- ফটকটা টপকে পার হবার মত কি?

- হ্যাঁ। ফটকের পাশেই স্যার চার্লস কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন। চুরুটের ছাই দেখে আমার মনে হয়েছে।

- চমৎকার। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল হোমস্। 'লোকজনের পা পড়ার আগে সন্ধান করলে কাঁকড়-মাটিতেও ইন্টারেস্টিং কিছু আপনি নিশ্চয় পেতেন ডক্টর মার্টিমার। আমাকে খবর দিলেন না কেন সেই সময়ে?

- মি. হোমস, আপনাকে আগেই বলেছি, আমাকে তাহলে বাধ্য হয়ে এমন অনেক কিছু প্রকাশ করতে হত যার নানান প্রতিক্রিয়া হত।

- কিন্তু ব্যাপারটাকে আপনি অলৌকিক বলে ভাবছেন কেন ঠিক বুঝতে পারছি না।

- পুরোপুরি ভাবছি তা ঠিক নয়। তবে মি. হোমস্‌, আমাদের চোখ-কানের আওতার বাইরে এমন একটা জগত রয়েছে যাকে অস্বীকার করার মত যথেষ্ট জোরালো যুক্তি সবসময় পাওয়া যায় না।

দুর্ঘটনা ঘটার পর এমন কিছু ঘটনা আমার কানে এসেছে, যা আমাদের প্রকৃতির পরিচিত নিয়মের মধ্যে পড়ে না।

চার জুনের ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটার আগে জলাভূমিতে অনেকেই একটা অদ্ভুত প্রাণী দেখেছে। প্রত্যেকেই স্বীকার করেছে জানোয়ারটার আকৃতি বিরাট এবং বিকট। যেন মূর্তিমান প্রেত।

প্রত্যক্ষদর্শী তিন জনকে আমি জেরা করেছিলাম। প্রত্যেকেই একবাক্যে বলেছে কিংবদন্তীর পিশাচ-কুকুরের চেহারার ভয়ঙ্কর প্রাণীটি প্রেত-ছায়ার মতই জলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গোটা তল্লাটে আতঙ্ক যেন জমাট বেঁধে রয়েছে।

- কিংবদন্তীর গল্প তাহলে সত্য বলে আপনি বিশ্বাস করেন? যদি তাই করেন তবে আমার কি করার আছে বলুন এ ব্যাপারে? আমার কাছে আসা নিষ্ফল নয় কি?

- আমি আমার কর্তব্য স্থির করে উঠতে পারছি না। সেই কারণেই আপনার পরামর্শের জন্য আসা।

এরপর ঘড়ির দিকে চোখ বুলিয়ে বললেন ডক্টর মার্টিমার, আর এক ঘন্টা পনের মিনিট পরে ওয়াটারলু স্টেশনে পৌঁছবেন স্যার হেনরী বাস্কারভিল। বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে আমার কর্তব্য কি কেবল তাই বলে আমাকে সাহায্য করুন।

- স্যার হেনরীই কি বাস্কারভিল হলের উত্তরাধিকারী হয়ে আসছেন?

- হ্যাঁ। তরুণ এই ভদ্রলোক চাষবাস নিয়ে কানাডায় বসবাস করছিলেন। তার সম্পর্কে খবর নিয়ে যদ্দুর জানতে পেরেছি তাতে তাঁকে স্যার চার্লসের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলেই আমার মনে হয়েছে।

স্যার চার্লসের ব্যক্তিগত চিকিৎসক বা বন্ধু হিসেবে নয়, তাঁর উইলের অছি আর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেই আমার এই মতামত। সেই কারণেই আপনার পরামর্শ চাওয়া।

- ডক্টর মার্টিমার, আপনার এই কেসে ক্রমশই আমার আগ্রহ বাড়ছে। আবিস্কার করার মত অনেক রহস্যেরই ইঙ্গিত পাচ্ছি আমি। আচ্ছা, সম্পত্তির দাবিদার কি আর কেউ নেই?

- না। তবে স্যার হেনরী ছাড়া আরেকজনের সন্ধান পেয়েছিলাম, স্যার চার্লসের কনিষ্ঠ ভাই রজার বাস্কারভিল। তিন ভাইয়ের মধ্যে চার্লস ছিলেন

জ্যেষ্ঠ। মেজভাই অল্পবয়সেই মারা যান। হেনরী তাঁরই ছেলে। রজার তৃতীয় এবং বলতে পারেন হিউগো বাস্কারভিলের মতই বংশের কুলাঙ্গার।

দুজনের জীবনধারা প্রায় একই রকম। ইংল্যান্ডে থাকাকালে যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরে মধ্য আমেরিকায় পালিয়ে যান এবং সেখানেই হলুদ জ্বরে মারা যান ১৮৭৬ সালে।

স্যার হেনরীই বাস্কারভিল বংশের শেষ বংশধর। টেলিগ্রামে জেনেছি আজ সকালেই তিনি সাদামটনে পৌঁছবেন-ওয়াটারলু পৌঁছবেন ঘন্টাখানেক পরেই। আমার সমস্যাটা এখন তাঁকে নিয়েই।

যারাই বাস্কারভিল হলে বসবাস করতে এসেছেন দুর্ভাগ্য তাদেরই গ্রাস করেছে। স্যার হেনরী যদি সব জেনে এখানে থাকতে রাজি না হন তাহলে এই পল্লী অঞ্চলের সমৃদ্ধির সম্ভাবনা হবে সুদূর পরাহত। স্যার চার্লসের সব সৎকাজ নিষ্ফল হয়ে যাবে। অথচ ডার্টমুরের পৈশাচিক এই পরিবেশ বাস্কারভিল বংশধরদের পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়।

- কিন্তু ডক্টর, আপনার বর্ণিত অশুভ শক্তি তো লন্ডনেও সক্রিয় হতে পারে? তাহলে আর ভয় পেয়ে কি লাভ? ওয়াটারলু ষ্টেশনে গিয়ে তাকে নিয়ে আসুন।

- তারপর।

- আগামী চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে পরবর্তী কর্মসূচি জানাতে পারব বলে আশা রাখি। তবে যদি একবার আগামীকাল দশটার মধ্যে স্যার হেনরীকে নিয়ে এঘরে আসেন তো বাধিত হব।

- বেশ তবে তাই হবে। ধন্যবাদ , এবার তাহলে উঠি।

ডক্টর মার্টিমার বেরুবার উদ্যোগ করছেন এমন সময় হোমস্ জিজ্ঞেস করল, স্যার চার্লসের মৃত্যুর পর শরীরী প্রেতকে আর কেউ জলার ধারে দেখতে পেয়েছে বলে কিছু শুনেছেন?

- না, তেমন কিছু কানে আসেনি।

ডক্টর মার্টিমার চলে যাবার পর হোমসকে খুব চিন্তামগ্ন দেখলাম। কেবল একবার বলল-এমন চমকপ্রদ কেস সচরাচর পাওয়া যায় না।

হোমসের স্বভাব আমার জানা। বুঝতে পারছি-এখন সে কল্পনার সুতো ছেড়ে বিভিন্ন অনুমান খাড়া করবে-যাচাই বাছাই করবে-সব ঘটনা একটা ছকে ফেলার চেষ্টা করবে।

এরকম সময় সে চায় একাকীত্ব। তাই আমি কথা না বাড়িয়ে ক্লাবে যাচ্ছি বলে বেরিয়ে পড়লাম।

রাত নটা নাগাদ ঘরে ঢুকেই দেখলাম, ঘর ধোঁয়াময়, তামাক পোড়ার গন্ধে ম ম করছে। বন্ধুবর চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর ঝুঁকে কি যেন

দেখছে।

আমার সাড়া পেয়ে বলে উঠল, তুমি যাওয়ার পর স্ট্যানফোর্ডের দোকান থেকে জলার ম্যাপ আনিয়েছি। যা দেখছি-বিশাল খাঁ খাঁ করা জলার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কয়েকটা মাত্র ঘরবাড়ি-সবই পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের বৃত্তের মধ্যে। আর চোদ্দ মাইল দূরে রয়েছে প্রিন্সটাউনের বিরাট কয়েদখানা। জনহীন আশ্চর্য এক বুনো অঞ্চল। শয়তানের খেলা জমাবার উপযুক্ত জায়গাই বটে।

- অতিপ্রাকৃত শয়তানকে নিয়ে তাহলে শেষ পর্যন্ত মাথা ঘামাতে শুরু করেছো?

- দেখ, শয়তান তো কাজ করে মানুষের ওপর ভর করেই। এখন সেটা খুঁজে বার করতে হবে-শয়তান যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে তবে সেটা কি এবং কিভাবে ঘটানো হয়েছে।

- কিন্তু কেসটা খুবই গোলমেলে মনে হচ্ছে আমার। অবশ্য যতটা আমি ভেবে উঠতে পেরেছি।

- ডক্টর মার্টিমারের একটা কথা থেকেই আমি শুরু করেছি-পায়ের ছাপের পরিবর্তন। তিনি যাই বলুন না কেন, আমি নিশ্চিত যে স্যার চার্লস ইউ-বীথির ছোট্ট ফটকের কাছ থেকে দৌড়চ্ছিলেন। প্রাণভয়ে দৌড়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন হলো তিনি ভয় পেয়েছিলেন কি দেখে? আর এমনই ভয় যে দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে বাড়ির দিকে না ছুটে উল্টো দিকে দৌড়েছিলেন।

তাছাড়া চুরুটের ছাই থেকে যা বোঝা যাচ্ছে-তিনি অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু ইউ-বীথির মধ্য দিয়ে কার পথ চেয়ে ছিলেন তিনি?

তাঁর মত অসুস্থ অশক্ত শরীরের মানুষ ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়া উপেক্ষা করে নিশ্চয় বিনা কারণে পাঁচ থেকে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকবার কথা নয়। ডক্টর মার্টিমারের অনুসন্ধানী দৃষ্টি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদ্ধার করেছে।

ডক্টর মার্টিমার বলেছেন, সন্ধ্যার পর স্যার চার্লস জলাভূমি এড়িয়ে চলতেন। অথচ তিনি জলার দিকের ফটকের কাছেই প্রতীক্ষায় ছিলেন রাতের বেলা। আবার পরদিনই তার লন্ডনে রওনা হবার কথা। ওয়াটসন, যথেষ্ট হয়েছে-আজ আর নয়-বাকিটা নিয়ে কাল সকালে ভাবা যাবে অতিথিরা এলে।

কথা শেষ করে হোমস্ অভ্যস্ত হাতে বেহালা টেনে নিয়ে বসল।

দুই

সকাল দশটাতেই হাজির হলেন ডক্টর মার্টিমার। তার পেছনে এলেন তরুণ ব্যারনেট।

ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। বলিষ্ঠ গড়ন, কালো চোখে সতর্ক দৃষ্টি। পরনে লালচে টুইডস্যুট, ধীর স্থির আচরণে স্পষ্ট আভিজাত্যের ছাপ।

প্রাথমিক পরিচয়ের পর্ব শেষে স্যার হেনরী লন্ডনে তাঁর প্রথম আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হিসেবে একটা চিঠি দেখালেন। আজ সকালেই পেয়েছেন।

আমরা সকলেই ঝুঁকে পড়লাম চিঠিটার ওপর। ধূসর রঙের খামের ওপর অসমান ছাঁদে লেখা-স্যার হেনরী বাস্কারভিল, নর্দামবারল্যান্ড হোটেল। দেখলাম শেরিংক্রস ডাকঘরে গতকাল সন্ধ্যায় পোস্ট করা হয়েছে চিঠিটা।

হোমস তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, আপনার এই হোটেলে ওঠার কথা জানাজানি হল কীভাবে?

- বুঝতে পারছি না। ডক্টর মার্টিমারের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই হোটেল ঠিক করি। তিনি আগেই উঠেছেন তাঁর বন্ধুর বাড়িতে।

চিঠির ওপরে চোখ নামিয়ে হোমস্ বলল, তাহলে বোঝা যাচ্ছে আপনার গতিবিধির ওপর কেউ নজর রাখছে।

চিঠির কথাগুলো সংক্ষিপ্ত। কতগুলো ছাপা শব্দ কাগজ থেকে কেটে আঠা দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের ওপর লাগানো হয়েছে। কথাগুলো হল- 'প্রাণের মায়া থাকলে জলার ত্রিসীমানা মাড়াবেন না।' একমাত্র জলার শব্দটা কালি দিয়ে হাতে লেখা হয়েছে।

লেখাগুলো খুঁটিয়ে দেখে হোমস্ বলল, ডক্টর মার্টিমার, জলার ভয়টা যে অতিলৌকিক কিছু নয়, এবার নিশ্চয় আপনি স্বীকার করবেন। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, গতকাল সন্ধ্যায় টাইমস কাগজ থেকে শব্দ কেটে এই চিঠি লেখা হয়েছে।

গতকালের টাইমস কাগজটা হাতের কাছেই ছিল। হোমস্ সেটার সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা খুলে আমাদের সামনে মেলে ধরল।

সবিস্ময়ে প্রত্যেকেই লক্ষ্য করলাম, প্রবন্ধের মধ্যে একমাত্র 'জলার' শব্দটা বাদে অন্য শব্দগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

হোমস্ বলল-ছোট কাঁচি দিয়ে কেটে আঠা দিয়ে সেঁটে বা্ক্য তৈরী করা হয়েছে। টাইমস কাগজের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বিশেষ ধরনের টাইপ ব্যবহার করা হয়-এই টাইপ অন্য কোন দৈনিকে ব্যবহৃত হয় না।

আর 'জলার' শব্দটা পাওয়া যায়নি বলে-ওটা পত্রলেখক হাতে লিখতে বাধ্য হয়েছেন। আরো কয়েকটা ব্যাপার এ চিঠি থেকে পরিস্কার হচ্ছে-প্রথমতঃ টাইমস কাগজটা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া তেমন কেউ বড় রাখে না। চিঠি যে লিখেছে সে লোপড়া জানা মানুষ নিঃসন্দেহে। দ্বিতীয়তঃ পত্রলেখকের হাতের লেখা যাতে কেউ চিনতে না পারে সে জন্য সমান ছাঁদে ঠিকানাটা লেখা হয়েছে। তৃতীয়তঃ দেখুন, শব্দগুলো আঁঠা দিয়ে লাগানোর সময়ে খুব তাড়াহুড়ো করা হয়েছে-ফলে কাটা শব্দগুলো মাপজোক ঠিক রেখে সমানভাবে লাগানো সম্ভব হয়নি।

আরো একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট-চিঠিটা সন্ধ্যায় ডাকে ফেলা হয়েছে। পরদিন সকালে বাইরে বেরুবার আগে স্যার হেনরীর হাতে পৌছানোর জন্য মাঝরাত পর্যন্ত যেকোন সময়েই ডাকে ফেলা যেত। অনুমান করছি-কেউ বাধা দিতে পারে এমন একটা আশঙ্কা ছিল তাড়াহুড়ো করে চিঠি ডাকে দেবার পেছনে।

হোমসের বিশ্লেষণ শুনে স্যার হেনরীর চোখ ক্রমশই বিস্ময়ে প্রসারিত হচ্ছিল। ডক্টর মার্টিমার বললেন-কিন্তু মি. হোমস্, সবই তো আপনার অনুমান-

হোমস্ হেসে বলল-অনুমান বা কল্পনা অবশ্যই, তবে তার ভিত্তি কিন্তু বাস্তবের বস্তুজগৎ। এরপর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে ঝাড়াই বাছাইয়ের পালা। এটাই হলো আমাদের অনুমানের বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগ পদ্ধতি।

এবারে আরো দেখুন-খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন, ঠিকানা লিখতে গিয়ে বেশ কয়েকবার কলমের কালি ফুরিয়েছে। নতুন করে কলমে কালি ভরতে হয়েছে। দোয়াতে কালি কম থাকলেই এমনটা হবার কথা।

বাড়ির দোয়াতেরও অবস্থা এমন থাকে কদাচিৎ। হোটেলের দোয়াতের দুরবস্থা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে পড়তে পারে। তাছাড়া শেরিংক্রসের আশপাশের হোটেলগুলোর কাগজের ঝুড়ি খুঁজলে শব্দ-কাটা টাইমস কাগজ পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সেই সূত্রে পত্রলেখককে ধরা

কষ্টকর হবে না।

স্যার হেনরী, আপনার এই চিঠি থেকে অনেক কিছুই জানা গেল। এবারে বলুন লন্ডনে পৌঁছে আর নতুন কি অভিজ্ঞতা আপনার হল।

স্যার হেনরী একটু চিন্তা করে বললেন , বলার মত তেমন কিছু ঘটেনি। তবে -

- তবে কী? বলুন -

- একপাটি বুট জুতো হারিয়েছে আমার। কাল রাতেই কিনেছিলাম স্ট্র্যান্ড থেকে। ব্যবহার করার সময় পাইনি। কাল রাতে দরজার সামনে দু'পাটি রেখেছিলাম, সকালে দেখি একপাটি উধাও।

- আপনি তাহলে গতকাল লন্ডনে পৌঁছেই জুতো কিনতে হোটেলের বাইরে গিয়েছিলেন?

- কিছু কেনাকাটা করতে হয়েছিল। ডক্টর মার্টিমার সঙ্গে ছিলেন।

- যাইহোক, মনে হচ্ছে নতুন বুটের পাটি কোন কাজেই লাগবে না। শিগগিরই ফেরত পেয়ে যাবেন।

- কিন্তু মি. হোমস্, আমাকে নিয়ে এত গোলমালটা কীসের দয়া করে বলবেন কি?

- স্যার হেনরীর কথায় হোমস্ হেসে ডক্টর মার্টিমারের দিকে তাকাল। বলল, আপনি দয়া করে ঐ পান্ডুলিপির বিষয়টা ওঁকে খুলে বলুন।

ডক্টর মার্টিমার ধীরে ধীরে সবই বললেন। স্যার হেনরী শুনলেন মনোযোগ দিয়ে। শোনা শেষ হলে বললেন, ছেলেবেলায় ধাইমার কাছে এই কুকুরের গল্প শুনেছি। চাচার মৃত্যুটাও পরিস্কার নয় আমার কাছে। এখন দেখছি-কেবল সম্পত্তি নয় উত্তরাধিকার সূত্রে অভিশাপ আর প্রতিহিংসাও লাভ হয়েছে আমার।

হোমস্ বলল, চিঠির ব্যাপারটাও মাথায় রাখুন-হয় হিতৈষী নয় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী-দুজনের একজন চিঠিটি পাঠিয়ে আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছে। এই অবস্থায় আপনি কি বাস্কারভিল হলে যাওয়া সমীচীন মনে করেন?

- কোন বাধা তো আমি দেখছি না, মি. হোমস্। পিতামহের ভিটেতে যাওয়া শয়তানই হোক আর মানুষই হোক কারুর সাধ্য নেই আমাকে ঠেকায়। তবে এ ব্যাপারে আরো একটু চিন্তাভাবনা আমি করতে চাই। আপনার বন্ধুকে নিয়ে আমার ওখানে বেলা দুটো নাগাদ একবার এলে খুশি হব। একসঙ্গে লাঞ্চ খাওয়া যাবে।

হোমস্ সানন্দে রাজি হলো।

ডক্টর মার্টিমার আর স্যার হেনরী বিদায় নিয়ে নিচে নেমে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে হোমস্ যেন স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠল। দ্রুত আমাকে নিয়ে নিচে নেমে এল। দেখলাম অতিথি দুজন গাড়ি নেননি, পায়ে হেঁটেই বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। কিছুটা দুরত্ব বজায় রেখে আমরা অনুসরণ করলাম তাঁদের।

অক্সফোর্ড স্ট্রীট পার হয়ে রিজেন্ট স্ট্রীটে ঢুকলেন দুজনে। এমন সময় চোখে পড়ল, রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড়ানো একটা দু'চাকার ঘোড়ার গাড়ি, ভেতরে একজন পুরুষ আরোহী।

আমার চোখে পড়তে না পড়তেই গাড়িটা চলতে শুরু করল। গাড়িটার দিকে হোমসও আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এবং দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল।

গাড়ির আরোহী-কালো দাড়িতে আচ্ছন্ন মুখ-সামান্য চেহারা বাড়িয়ে যেন আমাদের দেখল, পরক্ষণেই গাড়ির ঠেলে-তোলা দরজা উঠে গেল। গাড়িও রিজেন্ট স্ট্রীটের ওপর দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

হোমস্ গাড়িটাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। বলল, ওয়াটসন, আমার প্রথম অনুমান সত্য প্রমাণিত হল। স্যার হেনরী শহরে পা দেবার পর থেকে তার ওপর চোখ রেখে চলেছে কেউ। ঘরে বসে কথা বলবার সময়েই এই অনুসরণের ব্যাপারটা মাথায় এসেছিল। জানালা দিয়ে বাইরে চোখও রেখেছিলাম। এবারে নিঃসন্দেহ হলাম।

- গাড়ির নম্বরটা কিন্তু নেয়া হল না।-বললাম।

- ভুল হয়নি ভায়া। ২৭০৪-যদিও এ মুহূর্তে সেটা খুব কাজে আসবে না। আর আরোহীর দাড়িও নকল দাড়ি হওয়া অসম্ভব নয়।

কথা বলতে বলতে আমরা আঞ্চলিক বার্তা বাহকের অফিসে ঢুকলাম। অফিসের কর্তা উইলসন সানন্দ অভ্যর্থনা জানাল।

কার্টরাইট নামে চোদ্দ বছর বয়সের একটা ছোকরাকে খবর দিয়ে আনাল হোমস্। ছেলেটি এর আগে হোমসের দু'একটা ছোটখাট কাজ করে দিয়েছে। যথেষ্ট বুদ্ধিমান। কার্টরাইট এলে-হোমস্ হোটেল ডাইরেক্টরী খুলে দেখিয়ে ওকে বলল-শেরিংক্রসের ধারে কাছে তেইশটা হোটেল রয়েছে দেখেছো?

ছেলেটি স্মিত হাসি হেসে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লো।

- প্রত্যেকটা হোটেলে তুমি যাবে। হোটেলের বাইরের এবং হলরুমের দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলে গতকালের ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি দেখতে চাইবে। প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলার সময় হাতে একটা শিলিং গুঁজে দেবে। টাইমসের ভেতরের এই পৃষ্ঠাটা খুঁজে আনতে হবে তোমাকে। দেখবে কাঁচি দিয়ে কতগুলো ফুটো করা রয়েছে কাগজের মাঝখানে। পারবে তো? অবশ্য

কাগজটা পাওয়া যাবেই বলে আমি মনে করি না, তবু তুমি সবকটা হোটেলেই ভাল করে খুঁজে দেখবে।

হোমস কার্টরাইটকে প্রত্যেক হোটেলের দুই দারোয়ানের জন্য দুই শিলিং হিসেবে এবং তার সঙ্গে আরো বাড়তি দশ শিলিং গুণে দিয়ে দিল। সন্ধ্যার আগেই বেকার স্ট্রীটে টেলিগ্রাম করে জানাবার কথাও বলে দিল।

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে হাঁটতে হোমস বলল, এবারে বাকি একটা কাজ-২৭০৪ নম্বর ছ্যাকড়া গাড়ির কোচোয়ান-

যথা সময়ে দুইবন্ধু নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে পৌঁছে গেলাম।

স্যার হেনরীর ঘরে যাবার আগে হোমস্ ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে হোটেলের রেজিস্টারে একবার চোখ বুলিয়ে নিল।

স্যার হেনরীর হোটেলে ওঠার পর আরো দু'জন হোটেলে উঠেছে। স্বভাবসিদ্ধ কৌশলে দারোয়ানের কাছ থেকে বোর্ডার দুজনের সম্পর্কে জেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত হল। জানা গেল দুজনেই হোটেলে পুরানো বোর্ডার।

স্যার হেনরীর ঘরে ঢুকতেই নতুন ঘটনার মুখোমুখি হতে হল। উত্তেজিতভাবে তিনি শোনালেন তাঁর পুরানো বুট জুতোর একপাটি খুঁজে পাচ্ছেন না। কিন্তু সকালের হারানো নতুন বুটটি পেয়েছেন।

হোমস্ কপাল কুঁচকে জুতো চুরির বিবরণ শুনে বলল, স্যার হেনরী, ইতিপূর্বে আমরা প্রায় শ পাঁচেক কেসের ফয়সালা করেছি। কিন্তু আপনার চাচার মৃত্যুর পটভূমিকায় পর পর ঘটনা ঘটছে, যদি সত্যি বলে ধরতে হয়, তাহলে আপনার এই কেস সবচেয়ে জটিল বলেই আমার মনে হচ্ছে।

তবে এরমধ্যেই যেসব সূত্র আমার হাতে এসেছে তা ঝাড়াই বাছাই করে, হয়তো একটু বেশি সময় নষ্ট হবে, তবে সঠিক সূত্রের নাগাল পেয়ে যাবো।

এরপর হোমস্ আজ সকালের অভিজ্ঞতা তাঁকে জানাল। পরে ডক্টর মার্টিমারকে জিজ্ঞেস করল, ডার্টমুরে আপনার চেনা-জানা প্রতিবেশিদের মধ্যে দাড়িওয়ালা কেউ আছে?

কয়েক মিনিট চিন্তা করে তিনি বললেন, স্যার চার্লসের খাস চাকর ব্যারিমুরেরই তো মুখভর্তি চাপদাড়ি।

- ব্যারিমুর এখন কোথায়?

- বাস্কারভিল হল দেখাশুনা করছে -

একথা শোনার পর হোমস্ তখনি একটা টেলিগ্রাম ফর্ম চেয়ে নিয়ে ডার্টমুরের সবচে' কাছের টেলিগ্রাম অফিস গ্রিমপেনের পোস্ট মাস্টারকে

লিখল-মি. ব্যারিমুরের টেলিগ্রামটি তার হাতে দেবেন। বাড়িতে না পেলে নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে স্যার হেনরী বাস্কারভিলের কাছে ফেরত পাঠাবেন।

এরপর আর একটা টেলিগ্রাম পাঠানো হল ব্যারিমুরের নামে-স্যার হেনরীর ব্যবস্থা কতদূর?

স্যার হেনরী ব্যারিমুরের কথা জানতেন না। ডক্টর মার্টিমার বললেন, বাস্কারভিল হলের আগের কেয়ারটেকারের ছেলে। চার পুরুষ ধরে এই পরিবারে আছে এরা। এদের সম্পর্কে কোন অভিযোগ কখনো শুনিনি। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই সৎ।

স্যার হেনরী বললেন, তাহলে তো বাস্কারভিল হলে কেউ না গেলেই এদের সুবিধা...গোটা বাড়িটা দিব্যি ভোগ করতে পারবে।

হোমস্ একথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, ডক্টর মার্টিমার, উইলে ব্যারিমুর কিছু পেয়েছে?

- স্বামী স্ত্রী দুজনেই পাঁচশ পাউন্ড করে পেয়েছে। ওরাও জানে সেটা।

- আর কেউ?

- আমাকেও হাজার পাউন্ড দিয়ে গেছেন। তাছাড়া সামান্য অংকের টাকা অনেককেই দিয়ে গেছেন। কয়েকটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানেও কিছু দান করেছেন। বাদবাকি সবই পাবেন স্যার হেনরী –

- তার পরিমাণ কত?

- সাত লক্ষ চল্লিশ হাজার পাউন্ড। তাছাড়া জমিদারী-তারও মূল্য ধরুন প্রায় দশ লক্ষ পাউন্ড।

যুগপৎ দুজনেই বিস্মিত আমরা। হোমস্ বলল, এ যে দেখছি টাকার পাহাড় জড়িয়ে আছে এই কেসের সঙ্গে-এদিকটা তো আগে জানা ছিল না। আচ্ছা ডক্টর মার্টিমার, কিছু মনে করবেন না, প্রসঙ্গক্রমে জানা দরকার বলেই জিজ্ঞেস করছি, স্যার হেনরীর অবর্তমানে জমিদারি পাবে কে?

- স্যার চার্লসের ছোট ভাই রজার বাস্কারভিল অবিবাহিত অবস্থায় মারা গেছেন। সে কারণে দূর সম্পর্কের এক ভাই, জেমস ডেসমন্ড তার নাম তিনিই জমিদারির মালিক হবেন।

- তার সম্পর্কে –

- পুরুতগিরি করেন ওয়েস্ট মুরল্যান্ডে। স্যার চার্লসের সঙ্গে একবার দেখা করতে এসেছিলেন-তখন তাকে দেখি। সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী - স্যার চার্লসের অনেক পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও তিনি এক টাকাও নিতে রাজি হননি। স্যার চার্লসের উইল অনুযায়ী তিনি জমিদারির মালিক হবেন। আবার স্যার হেনরী অর্থাৎ বর্তমান উত্তরাধিকারী উইল না করলেও টাকা পাবেন তিনিই।

এরপর হোমস্ সরাসরি স্যার হেনরীর দিকে তাকিয়ে বলল, আমার মনে হচ্ছে আর সময় নষ্ট না করে আপনার ডেভনশেয়ারে পৌঁছানো দরকার। তবে, কখনোই একলা যাবেন না-এটা আমার বিশেষ অনুরোধ।

- মার্টিমার তো রয়েছেন সঙ্গে।

- আপনার সঙ্গে সবসময় থাকার মত কাউকে দরকার। মার্টিমারকে রোগী দেখতে বাইরে যেতে হয়-তাছাড়া তাঁর বাড়িও বেশ কয়েক মাইল দূরে। সেকারণেই একজন সঙ্গী দরকার।

স্যার হেনরী বললেন, আপনাকেই যদি আমি অনুরোধ জানাই মি. হোমস্।

হোমস্ হেসে বলল, এই মুহূর্তে কয়েকটা জরুরী কেসের ব্যাপারে আমার লন্ডনে থাকা খুবই জরুরী। তবে তেমন অবস্থা দেখা দিলে অবশ্যই হাজির হতে চেষ্টা করব। তবে-এই বলে হোমস্ আমাকেই সুপারিশ করল স্যার হেনরীর সঙ্গে যাবার জন্য।

অতঃপর সামনের শনিবার যাত্রার দিনক্ষণ স্থির হলো। পেডিংটন থেকে আমরা সাড়ে দশটার ট্রেনে ডার্টমুর রওনা হব।

স্যার হেনরীর ঘর থেকে বেরুবার মুখেই ঘটল আরেক নতুন ঘটনা। একটা ক্যাবিনেটের তলা থেকে স্যার হেনরী নিজেই টেনে বের করলেন একপাটি বাদামী বুট। বললেন, এই তো আমার হারানো বুট-কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও তো আমি তন্নতন্ন করে খুঁজে গেছি। আশ্চর্য!

তখুনি ওয়েটারকে ডাকা হল। কিন্তু সে বারবার বলল যে এ ব্যাপারে কিছু জানে না।

অনেক খোঁজ খবর নিয়েও রহস্য পরিস্কার হল না।

স্যার চার্লসের মৃত্যুর পর যেন চলেছে রহস্যের ঘনঘটা। ছাপা অক্ষর সাজানো অদ্ভুত চিঠি, কালো দাড়িওয়ালা রহস্যময় চর, নতুন বাদামি বুটের অন্তর্ধান, আবার এখন বাদামি বুটের বিস্ময়কর প্রত্যাবর্তন-একটার পর একটা-সব কিছুই রহস্যময়।

ঘটনাগুলোর পরস্পর সম্পর্ক অতল অন্ধকারে। এসব নিয়ে চিন্তা করতে করতেই ফিরে এলাম আমরা।

ডিনারে বসার আগেই দুটো টেলিগ্রাম এল।

স্যার হেনরী জানিয়েছেন ব্যারিমুর বাস্কারভিল হলেই আছে এইমাত্র খবর পেলাম।

দ্বিতীয়টা কার্টরাইটের তেইশটা হোটেলেই ঘুরেছি কিন্তু টাইমসের কাটা কাগজ পাইনি।

দুটো সূত্র নাকচ হতে না হতেই তৃতীয় সূত্রের সন্ধান এসে হাজির।

সরকারি রেজিষ্ট্রিতে ছ্যাকড়া গাড়ির কোচোয়ানের নাম ঠিকানা খুঁজে বের করার জন্য হোমস্ কর্তৃপক্ষকে আগেই টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছিল। টেলিগ্রাম পাবার খানিক পরেই স্বয়ং কোচোয়ান এসে হাজির।

হেড অফিস থেকে তাকে পাঠানো হয়েছে।

হোমসের প্রশ্নের উত্তরে কোচোয়ানের কাছ থেকে জানা গেল-বেলা সাড়ে নটার সময় ট্রাফালগার স্কোয়ারে দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক গাড়ি ভাড়া করেন।

প্রথমে সে গাড়ি নিয়ে আসে নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে। সেখান থেকে স্যার হেনরী এবং ডক্টর মার্টিমার এর গাড়ি অনুসরণ করে আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়।

ঘণ্টা দেড়েক পর আবার তাদের অনুসরণ করে রিজেন্ট ষ্ট্রীটে গিয়ে আচমকা ভদ্রলোক ঠেলা দরজা তুলে দিয়ে বললেন, তাড়াতাড়ি ওয়াটারলু ষ্টেশনে যেতে।

ভাড়া মিটিয়ে যাবার সময় ভদ্রলোক পরিচয় দিয়ে বললেন, তার নাম শার্লক হোমস, একজন ডিটেকটিভ, কোচোয়ান যেন তার কথা কাউকে না বলে।

কোচোয়ানের কাছ থেকে আরো জানা গেল, তথাকথিত এই ডিটেকটিভের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, উচ্চতা মাঝারী, ফ্যাকাশে মুখ, মুখে চৌকোণা কালো দাড়ি।

একটা আধগিনি বকশিস দিয়ে কোচোয়ানকে বিদায় করা হল। তারপর হাসতে হাসতে হোমস্ বলল, ওয়াটসন, লোকটা সাধারণ নয়, মহা ধড়িবাজ। ঠিক বুঝতে পেরেছিল, কোচোয়ানকে আমরা পাকড়াও করতে পারব। আর সেই বুঝেই তার মুখে এই উদ্ধত সংবাদটি পাঠিয়েছে। একটা চ্যালেঞ্জও বটে। দেখা যাক।

ডক্টর মার্টিমার এবং স্যার হেনরীর সহযাত্রী হয়ে ডেভনশেয়ার রওনা হবার আগে হোমস্ আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে দিল।

স্যার হেনরীর পরবর্তী ওয়ারিশ জেমস ডেসমন্ডকে সে তার তদন্তের আওতা থেকে বাদ দিয়েছে। ডক্টর মার্টিমারও সন্দেহমুক্ত ব্যক্তিদের একজন।

এছাড়া স্যার হেনরীর সকল প্রতিবেশী সম্পর্কেই খুঁটিয়ে বিচার করে আমাকে রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

স্যার চার্লসের মৃত্যু সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে জড়িত যে কোন খবর বা

ঘটনা যেন আমি বাদ না দেই ।

বাস্কারভিল হলের খাস চাকর ব্যারিমুর দম্পতি, প্রকৃতিবিদ স্টেপলটন এবং তার সুন্দরী বোন, এছাড়া শ্যাফটার হলের মি. ফ্রাঙ্কল্যান্ড এবং আরো দু'একজন প্রতিবেশীর যারা স্যার চার্লসের বিশেষ পরিচিতির গন্ডির মধ্যে ছিল তাদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই আমার দৃষ্টি সজাগ রাখার জন্য সতর্ক করে দিল ।

আর, আমি যেন স্যার হেনরীকে একা রেখে কোথাও না যাই ।

যাবার আগে ষ্টেশনে হোমস্ স্যার হেনরীকে বলল, ড.ওয়াটসনের চাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য সঙ্গী আপনার আর কেউ হতে পারত না ।

আশা করছি আপনাদের দিনগুলো ভালই কাটবে । তবে আমার একটা অনুরোধ, কখনো কোন অবস্থাতেই একলা রাস্তায় বেরুবেন না । তাহলে কিন্তু দুর্বিপাক ঠেকানো যাবে না । আর সন্ধ্যায় পর জলাভূমির দিকে কখনোই যাবেন না ।

তিন

যথাসময়ে আমাদের গাড়ি ছাড়ল।

ক্রমশঃই দুপাশের মাটির রঙ বাদামি থেকে লালচে হয়ে এল। আরো পরে ইটের রাজত্ব ছেড়ে গ্রানাইটের রাজ্যে প্রবেশ করলাম।

সবুজ ছাওয়া চৌকোণা মাঠ, গাছপালা-ধু-ধু প্রান্তর-মাঝে মাঝে পাহাড়ের পাথুরে চুড়া দেখতে দেখতে মুগ্ধ হলাম। ডেভনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যি অতুলনীয়।

ছোট্ট একটা ষ্টেশনে গাড়ি থেকে আমরা নামলাম। তারপর টাট্টু ঘোড়ায় টানা খোলা গাড়িতে চাপলাম। ষ্টেশনেই চোখে পড়ল সেপাইদের মত গাঢ় ইউনিফর্ম পরা দুজন বন্দুকধারী।

কোচোয়ান লম্বা সেলাম ঠুকে আমাদের গাড়িতে তুলে নিল। দেখলাম, স্যার হেনরী বাস্কারভিলের খবর এখানে সকলেই জেনে গেছে।

পাশে টানা লম্বা পশুচারণ তৃণভূমি। গাছপালার ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ছে বাড়ির তেকোণা ছাদ।

জনবসতির পেছনে বিভীষিকাময় জলাভূমির ঢেউ খেলানো আভাস-মাঝে মাঝে মাথা তুলে দাঁড়ানো পাহাড়।

চারপাশের দৃশ্য দেখছেন আর স্যার হেনরী থেকে থেকে হর্ষধ্বনি করছেন। একের পর এক প্রশ্ন করে যাচ্ছেন ডক্টর মার্টিমারকে।

আমার মত এ অঞ্চলে স্যার হেনরীও একেবারে নতুন। তাঁর মুখেই শুনলাম, বাবা মারা যাবার পর কিশোর বয়সেই বাস্কারভিল ছেড়ে আমেরিকায় এক বন্ধুর কাছে চলে যান তিনি। তারপর এই প্রথম এদিকে আসা।

রহস্যময় জলাভূমির দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা এগুচ্ছি ,গুল্মাচ্ছন্ন একটি পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ডক্টর মার্টিমার। দেখলাম, চূড়ার ওপর রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন অশ্বারোহী সৈন্য।

কোচোয়ানকে প্রশ্ন করে জানা গেল, প্রিন্সটাউনের জেলখানা থেকে

একজন কয়েদী আজ তিনদিন হল পালিয়েছে। তাকে ধরার জন্যই ষ্টেশন আর রাস্তায় পাহারা দিচ্ছে সেপাইরা। আসামী–খুনি সেলডন। তার খবর দিতে পারলেই পাঁচ পাউন্ড বকশিস।

চলতে চলতে ঢাল বেয়ে উঠে পড়ল আমাদের খোলা গাড়ি। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত জলাভূমি, এবড়োখেবড়ো প্রস্তর স্তূপ আর ছোট ছোট অদ্ভুত পাহাড়। ঠান্ডা কনকনে হাওয়া ছুটে আসছে জনশূন্য প্রান্তর থেকে।

আমাদের গাড়ি মাঝে মাঝে পাশ কাটিয়ে চলেছে জলাভূমির কুঁড়েঘরগুলো। দেয়াল আর ছাদ পাথর দিয়ে তৈরি। কর্কশ গায়ে লতার কোন আস্তরণ নেই।

দেখতে দেখতে গাড়ি মোড় ঘুরে উপস্থিত হল বাস্কারভিল হলের সামনে।

ঢালাই লোহার ওপর অদ্ভুত রকমের কারুকার্য করা ফটক। দু'পাশে রোদ জলে বিবর্ণ থাম, মাথায় বাস্কারভিল বংশের প্রতীক-শূকর মুন্ড।

ফটক পার হয়ে দীর্ঘ বীথি-পথ–পথের প্রান্তে ঘাস ছাওয়া প্রশস্ত চত্বর।

দিনের পড়ন্ত আলোয় প্রাচীন প্রাসাদের সামনেটা দেখা যাচ্ছে–আইভিলতায় ঢাকা। বাড়ির মাঝের অংশ থেকে টাওয়ার উঠে গেছে আকাশে।

খাঁজকাটা দেয়াল সংলগ্ন গ্রানাইট পাথরের আধুনিক বাড়িটা পরবর্তীকালে তৈরী দেখেই বোঝা যাচ্ছে। মোটা মোটা গরাদ ঢাকা জানালা। কালো ধোঁয়া উঠছে খাড়া ছাদের চিমনি থেকে।

এখান থেকেই বিদায় নিলেন ডক্টর মার্টিমার। একই গাড়িতে ফিরে গেলেন।

ব্যারিমুর দম্পতি আমাদের মালপত্র নামিয়ে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল।

ডিনার শেষে শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা যে যার ঘরে চলে এলাম।

আমার ঘরের দরজায় বাইরের ঘাসছাওয়া প্রশস্ত চত্বর। জানালা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। আকাশে মেঘের ফাঁকে চাঁদ- সেই আলোতে দূরের গাছের মাথা হাওয়ায় দুলছে। বৃক্ষসারির অনেক পেছনে এবড়োথেবড়ো শৈলশ্রেণি এবং লম্বা ঢেউখেলানো জলাভূমি।

শরীর ভীষণ ক্লান্ত। কিন্তু তবু বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে হচ্ছে। ঘুম আসছে না। নিঝুম নিস্তব্ধ চারপাশ।

হঠাৎ একটা কান্নার শব্দ কানে এল। নারী কণ্ঠের।

চমকে বিছানায় উঠে বসলাম। কানা খাড়া করে রইলাম। স্পষ্ট ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। মনে হল এই বাড়ির ভেতর থেকেই কান্নার শব্দটা আসছে।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে রাতের অভিজ্ঞতাটা জানালাম স্যার

হেনরীকে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যারিমুরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন গভীর রাতের কান্না সম্পর্কে সে কিছু জানে কিনা।

ব্যারিমুরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বলল, স্যার, বাড়িতে স্ত্রীলোক বলতে দুজন। রান্নাঘরের পেছনে একজন থাকে-বাসন ধোয়া মোছার কাজ করে-অন্যজন আমার স্ত্রী। কিন্তু গভীর রাতে ফুঁপিয়ে কাঁদার মত আমাদের মধ্যে ঘটেনি কিছু।

ব্যারিমুরের কথা শুনে বুঝতে পারলাম সে মিথ্যা বলছে। সকালেই মিসেস ব্যারিমুরকে আমি দেখেছি-দোহারা গড়নের মহিলা। লালাভ চোখের পাতা ফোলা স্পষ্ট লক্ষ্য করেছি।

কালরাতে মিসেস ব্যারিমুরই কেঁদেছেন-এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মিথ্যা বলার কী কারণ থাকতে পারে?

ব্যারিমুরকে ঘিরে আমার মনে সন্দেহ দানা বাঁধতে থাকে। স্যার চার্লসের মৃতদেহ সেই প্রথম আবিস্কার করে।

মৃত্যু সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাও তারই দেয়া। বিদ্যুৎ চমকের মতো আমার মনে উদয় হল, রিজেন্ট ষ্ট্রীটে ছ্যাকড়াগাড়িতে তারই মুখ আমরা দেখেনি তো?

গ্রিমপেন পোস্টমাস্টারের নামে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল ব্যারিমুরকে দেবার জন্য। সেখানে গিয়ে একবার খবর নিলেই ব্যাপারটা পরিস্কার হবে।

ব্রেকফাষ্টের পরেই দেখলাম একগাদা কাগজ-পত্র নিয়ে বসেছেন স্যার হেনরী। হাতের কাজ শেষ করে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে। সুযোগ বুঝে বেরিয়ে পড়লাম।

জলার ধার দিয়ে মাইল চারেক হাঁটতে হল। গ্রামের ছোট ছোট কুঁড়েঘরের পাশে বড় দুটো বাড়ি–তার মধ্যে একটা ডক্টর মার্টিমারের, পাশেই পোস্টমাস্টারের মুদিখানা। টেলিগ্রামের কথাটা তার বেশ মনে আছে দেখলাম।

তার কাছ থেকে জানা গেল, গত সপ্তাহে তার ছেলে জেমস বাস্কারভিল হলে গিয়ে ব্যারিমুরের স্ত্রীর হাতে সেটা দিয়ে এসেছে। সেই সময় ব্যারিমুর মাচায় উঠে কী যেন কাজ করছিল।

হতাশ হয়ে ফিরতে হল। ব্যারিমুর সে সময় লন্ডনে ছিল না বাড়িতে ছিল ব্যাপারটা পরিস্কার হল না। তবে সে কি লন্ডনেই ছিল?

মৃত বাস্কারভিলকে মৃত্যুর পুর্বে সর্বশেষ সে-ই দেখেছে–মৃতদেহও সেই আবিস্কার করেছে।

এই বংশের শেষ উত্তরাধিকারী লন্ডনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তবে কি

সে–ই পিছু নিয়েছে? অদ্ভুত চিঠি পাঠাবার পেছনেও কি তারই হাত অ।৮২?

কিন্তু উদ্দেশ্যটা কী? সে কি নিজেই কোন ষড়যন্ত্র করছে না পেছন থেকে কেউ তাকে দিয়ে এসব করাচ্ছে?

স্যার হেনরী বলেছিলেন, পরিবারের লোকজনকে বাড়ি থেকে দূরে রাখতে পারলে ব্যারিমুর দম্পতিই গোটা বাড়ি দখল করতে পারবে।

চিন্তা-ভাবনাগুলো ছকে ফেলার চেষ্টা করতে করতে হাঁটছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে কার ডাক শুনে চমকে উঠলাম। আমার নাম ধরে এখানে কে ডাকবে?

ডক্টর মার্টিমারের বাড়ি ছাড়িয়ে এসেছি। তিনি ডাকছেন কিনা ভেবে পেছন ফিরে তাকালাম, কিন্তু দেখলাম ছোটখাট আকারের ছিপছিপে এক ভদ্রলোক প্রায় ছুটে আসছেন আমার দিকে।

পরিস্কার কামানো মুখ, শনের মত একমাথা চুল, পাতলা চোয়াল। ত্রিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে বয়স। পরনে ধূসর স্যুট, মাথায় হ্যাট।

গাছ-গাছড়ার নমুনা সংগ্রহের একটা টিন কাঁধে ঝোলানো, হাতে সবুজ রঙের প্রজাপতি ধরার জাল।

ভদ্রলোক কাছে এসে বললেন, মাফ করবেন ড. ওয়াটসন, আপনাকে দেখেই ছুটে এলাম আলাপ করব বলে। আমি মেরিপিট হাউসের ষ্টেপলটন–ড. মার্টিমারের বন্ধু। তাঁর মুখে নিশ্চয় আপনি আমার নাম শুনেছেন।

বললাম-প্রকৃতিবিদ মি. স্টেপলটনের নাম আমার শোনা। কিন্তু আমাকে আপনি চিনলেন কী করে?

- ড. মার্টিমারের ওখানে গিয়েছিলাম , উনিই আপনাকে দেখিয়ে দিলেন। একই পথে আমাকেও যেতে হবে তাই দৌড়ে এসে আপনাকে ধরলাম। স্যার হেনরী এসেছেন জেনে খুবই খুশি হয়েছি। আশংকা ছিল তিনি শেষ পর্যন্ত এখানে আসতে চাইবেন কিনা। প্রেত-কুকুরের গল্প এখানে লোকের মুখে মুখে। অভিশাপে ভুগছে পরিবারটা।

- এখানকার গুজবটা শুনেছি আমিও।

- এ এক অদ্ভুত রহস্য। এখানকার চাষীরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে গল্পটা। ওরা অনেকে নাকি দেখেছে সেই বীভৎস প্রাণিটাকে এই জলায়।

স্যার চার্লসও বিশ্বাস করতেন, মৃত্যুটাও হল শোচনীয়ভাবে। হার্টের অবস্থা এমনিই ভাল ছিল না। তার ওপর উদ্ভট প্রাণিটার কল্পনা করতে করতে তিনি যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন।

আমার মনে হয় সেই রাতে সত্যিই কিছু একটা দেখে উনি হার্ট ফেল করেছিলেন। ড. মার্টিমারেরও তাই ধারণা, এই নির্জন জলাদেশে আমরা

সকলেই কাছের মানুষ ছিলাম।

- আপনার ধারণা প্রেত-কুকুরের তাড়া খেয়েই ভয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন স্যার চার্লস?

- তাছাড়া আর কী ভাবা যায় বলুন? মি. শার্লক হোমসও আপনাদের সঙ্গে এসেছেন?

প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলাম। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকালাম স্টেপলটনের মুখের দিকে। তিনি একইভাবে বলতে লাগলেন, কথাটা এভাবে জিজ্ঞেস করলাম বলে কিছু মনে করবেন না। আপনার ডিটেকটিভ কাহিনী আমার অজানা নয়। তাই আপনার আগমন থেকেই মনে হল, মি. হোমস্‌ও এ কেস সম্পর্কে আগ্রহী।

আমি শান্ত স্বরে বললাম, তিনি অন্য কেস নিয়ে খুবই ব্যস্ত, এ মুহূর্তে লন্ডন ছেড়ে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

- আমার বিশ্বাস, তিনি এলে সব রহস্যই পরিস্কার হয়ে যেত। যাই হোক, যদি কোন সাহায্য সহযোগীতার দরকার হয় বলতে দ্বিধা করবেন না।

আমি হেসে বললাম, তার প্রয়োজন হবে না। কেননা আমি আমার বন্ধু স্যার হেনরীর সঙ্গে দিন কয়েক কাটাতে এসেছি-তদন্ত করতে নয়।

কথা বলতে বলতে একসময় ঘাসছাওয়া রাস্তায় পৌঁছে গেলাম আমরা। রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে এগিয়ে ঢুকে গেছে জলার মধ্যে।

স্টেপলটন বললেন-জলার এই রাস্তা দিয়ে সামান্য এগুলেই মেরী পিট হাউস। আসুন না, আস্তানাটা দেখে যাবেন - আমার বোনের সঙ্গেও আলাপ হবে।

কথাটা শুনে মনে পড়ল, স্যার হেনরীকে অনেকক্ষণ একা রেখে এসেছি। হোমস্ তার কাছ ছাড়া হতে বারণ করেছিল। কিন্তু জলার প্রতিবেশীদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া আমার দরকার, তাই দ্বিধা না করে ষ্টেপলটনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম।

সামনেই দীর্ঘ সবুজ ঘাসের তরঙ্গ - মাঝেমাঝে গ্রানাইট পাথরের স্তুপ।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ষ্টেপলটন বলতে লাগলেন-এক আশ্চর্য জায়গা এই জলাভূমি। উত্তরের প্রান্তরটা দেখুন-বিক্ষিপ্তভাবে কতগুলো পাহড়ের মাথা দেখা যাচ্ছে তারই ফাঁকে ফাঁকে ঝকঝকে সবুজ জায়গাগুলো-ওই হল গ্রিমপেন কর্দমভূমি- জলার ফাঁদ। একটু অসতর্ক পা পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে তলায় টেনে নিয়ে যাবে। গতকালই আমার চোখের সামনে গেল একটা টাট্টু ঘোড়া। আমি কিন্তু এরই মধ্যে দিয়ে পথ করে ঠিক মাঝখান ধরে এগিয়ে যেতে পারি।

কথা বলতে বলতে এগুচ্ছি,মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর জলাটার দিকে তাকাচ্ছি। সহসা সামনের নল খাগড়ার মধ্যে বাদামি মত কি যেন একটা গড়াগড়ি দিচ্ছে মনে হল।

চমকে উঠে তাকালাম - ভয়াবহ আর্তনাদ উঠল সেখান থেকে। একটা লম্বা গলা দু-একবার ঠেলে উঠবার চেষ্টা করে স্তব্ধ হয়ে গেল। বীভৎস আর্তনাদে কেঁপে কেঁপে উঠল জলার ওপর দিয়ে বয়ে চলা হাওয়া।

- গেল-তলিয়ে গেল। গ্রিমপেন কাদা আরো একটা প্রাণী নিয়ে গেল। এটা এখানকার প্রতিদিনকার ঘটনা সাহেব। আমি কিন্তু খুঁজে খুঁজে পথ চিনে নিয়েছি এর মধ্য দিয়েই যেতে পারি।

- আপনি এখানে কতদিন এসেছেন?

- বেশিদিন নয়, বছর দুই। স্যার চার্লস আসবার কিছুদিন পরেই।

চলতে চলতে দূরের পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন-ওগুলো কাদার সমুদ্রে যেন দ্বীপ- যুগ যুগ ধরে একইভাবে রয়েছে- প্রজাপতি খুঁজতে আমাকে ওখানে যেতে হয়।

এই সময় গম্ভীর একটা গোঙানির মত শব্দ জলার ওপর দিয়ে ভেসে এল। শব্দটার উৎস বোঝা গেল না।

কান পেতে রইলাম-প্রথমে কেমন একটা গজরানি-এরপর গভীর গর্জন-তারপর গোঙানির শব্দ হয়ে ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে এল।

অদ্ভুত চোখে ষ্টেপলটন তাকালেন আমার মুখের দিকে। বললেন-এখানকার চাষীরা বলে- বাস্কারভিল-কুকুরের গর্জন। এর আগে আরো দু-একবার আমি এ ডাক শুনেছি।

ভয়ে উত্তেজনায় বুক ঢিবঢিব করছিল আমার। বললাম-এসব আজগুবি গল্প আপনি বিশ্বাস করেন? এতো জীবন্ত কোন প্রাণীর স্বর বলেই মনে হল।

- এখানকার রহস্য নিয়ে বুক ঠুকে কোন কথাই বলতে পারব না সাহেব। সবাই অদ্ভুত। এখানে সবই সম্ভব।

আমাদের ডান দিকে পাহাড়ের ঢালে বিস্তর প্রস্তর বলয় -মনে হল ভেড়ার খোঁয়াড়। ষ্টেপলটনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শোনালেন অদ্ভুত ইতিহাস।

বললেন, খোঁয়ার নয়-আমাদের পূর্ব পুরুষদের ঘরবাড়ি ওগুলো। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বসতি ছিল ওই জলায়। প্রস্তর যুগের সময়ে এখানকার আদিম বাসিন্দারা গরু-ভেড়া চরাতো, আরে ওইতো একটা সাইক্লোপাইডস -

বলতে বলতে প্রজাপতি-ধরা জালটা বাগিয়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্র বেগে ধাওয়া করলেন একটা মথ পোকার পেছনে।

পোকাটা সেই পাঁকের রাজত্বে উড়ে চলেছে আর আশ্চর্য কৌশলে লাফিয়ে ডিঙিয়ে-ছুটে চললেন সেটার পেছনে। সভয়ে বিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি একজন মহিলা। কেন জানি দেখেই মনে হল মিস ষ্টেপলটন। আশ্চর্য রূপসী মহিলা। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী। নিখুঁত মুখাবয়ব। চুল কালো-কালো চোখ জোড়াও।

প্রথম দর্শনেই মোহিত করার মত সৌন্দর্য। মহিলা ভাই-এর দিকে একপলক তাকিয়ে নিয়ে আচমকা বলে উঠলেন-লন্ডনে ফিরে যান । একমুর্হুতও থাকবেন না এখানে।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। বোবা বিস্ময়ে তাকালাম তার চোখের দিকে। বললাম-ফিরে যাব কেন?

- দোহাই আপনার। প্রশ্ন করবেন না । এক মুহূর্ত দেরী না করে লন্ডনে ফিরে যান। জীবনে কখনো আসবেন না এ জলায়। চুপ। ভাই আসছে। ওর সামনে কোন কথা তুলবেন না । কী সুন্দর-ওই অর্কিডটা-আমাকে এনে দেবেন?

হাঁপাতে হাঁপাতে ততক্ষণে ফিরে এসেছেন ষ্টেপলটন। এসেই বলে উঠলেন, বেরিল, এসে গেছ-

-জ্যাক, তোমার মুখে তেতে লাল হয়ে গেছে।

বিস্ময় কৌতূহল সব আমার মধ্যে। ভাই-বোনের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাতে লাগলাম আমি। কেন জানি মনে হল ভাই-বোনের মধ্যে কথাগুলো কেমন প্রাণহীন-

- বেরিল, বলতো ইনি কে?

- নিশ্চয় স্যার হেনরী।

- না, না, আমি বলে উঠলাম, নিতান্তই সাধারণ মানুষ আমি- আমার নাম ডক্টর ওয়াটসন।

মেয়েটির মুখে যেন অপ্রস্তুত ভাব ছায়া ফেলল। তারপর সামলে নিয়ে বলল, ডক্টর ওয়াটসন বেড়াতে এসেছেন বুঝিনি আমি। ভালই হল, মেরিপিট হাউসটা তাহলে দয়া করে ঘুরেই যান।

ততক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে আমরা ফল ফুলের বাগান ঘেরা বাড়িটার সামনে পৌছে গেলাম। দেখেই মনে হল কেমন একটা বিষন্নতার ছায়া যেন ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে।

একজন বয়স্ক পরিচারক এসে দরজা খুলে দিল।

বাড়ির ভেতরটা একেবারে অন্যরকম। রুচিসম্মত আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো। ভেবে পেলাম না, এই আদিম জলাভূমিতে উচ্চশিক্ষিত এই

ভদ্রলোক এবং পরমা সুন্দরী মহিলা কিসের আকর্ষণে রয়েছেন?

জলাভূমিতে একটা ঘোড়ার শোচনীয় মৃত্যু চোখের সামনেই ঘটেছে বাস্কারভিল-কুকুরের ভৌতিক গর্জনও নিজ কানে শুনেছি-ঘটনাগুলো মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল।

ওদিকে স্যার হেনরী বাড়িতে একা রয়েছেন। তারপর মিস ষ্টেপলটনের আকস্মিক হুঁশিয়ারি-সব মিলিয়ে ভেতরটা কেমন অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠল।

এই গোপন হুঁশিয়ারির কারণটা হাতড়ে ফিরছিলাম, তাই মন খুলে এদের সঙ্গে কথা বলার মুড পাচ্ছিলাম না।

এদিকে ষ্টেপলটন বলে চলেছেন-উত্তর অঞ্চলে একটা স্কুল করেছিলেন। আকস্মিক মড়কে তিনটে ছেলে মারা যাবার পর স্কুল তুলে দিয়ে উদ্ভিদতত্ত্ব আর প্রাণিবিদ্যার চর্চা নিয়ে এখানে নিরিবিলিতে বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছেন।

কথায় কথায় স্যার চার্লসের প্রসঙ্গে এসে গেলেন। আমিও একটু সজাগ হলাম। বললেন-আশ্চর্য উদার মনের মানুষ। যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল আমার সঙ্গে। তার মৃত্যু আমার বুক ভেঙ্গে দিয়েছে। এখানে বসবাসের একটা বড় বন্ধন আমার সরে গেল। স্যার হেনরীকে জানাবেন দয়া করে, আজ বিকেলে একবার যাব তার সঙ্গে দেখা করতে।

বললাম-আসুন খুবই খুশি হবেন তিনি।

মিস ষ্টেপলটন লাঞ্চের অনুরোধ জানালেন। ক্ষমা প্রার্থনা করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

সরু পথ অতিক্রম করে মূল রাস্তায় পৌঁছে অবাক হয়ে দেখলাম মোড়ের মাথায় আমার আগেই এসে দাঁড়িয়ে আছেন মিস ষ্টেপলটন।

কাছে যেতে বললেন, আপনাকে ধরব বলেই দৌড়ে অন্য পথ দিয়ে এলাম। ফিরতে হবে এখুনি-নইলে ভাই ধরে ফেলবে। আপনাকে স্যার হেনরী ভেবে যা বলেছি, তার জন্য ক্ষমা করবেন। ওই কথার সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই।

- স্যার হেনরী আমার বন্ধু- তাঁর ভাল-মন্দ নিয়ে আমি খুবই উদ্বিগ্ন। আপনি চান তিনি লন্ডনে ফিরে যান- কিন্তু কেন?

- ওটা খেয়ালের বশে বলা ডক্টর ওয়াটসন।

- আমার কিন্তু নিছক খেয়াল বলে মনে হয়নি। চোখে পড়বার মত আবেগ আপনার মধ্যে আমি দেখেছি তখন। নিশ্চয়ই আপনার কিছু বক্তব্য আছে। যা জানেন নির্দ্বিধায় বলুন। আপনার প্রতিটি কথা স্যার হেনরীকে পৌঁছে দেব।

- দেখুন, স্যার চার্লসের মৃত্যুতে আমরা দুই ভাই-বোন খুবই আঘাত

পেয়েছি। বংশের মাথায় একটা অভিশাপ ঝুলছে- উনি এই অভিশপ্ত বাড়িতে থাকলে আবার কি ঘটে যায়- এমন একটা আশঙ্কা থেকেই কথাটা বলা-

- ওসব পিশাচ-হাউন্ডের গালগল্প আপনি বিশ্বাস করেন?

- আমি করি। যদি আপনার পক্ষে সম্ভব হয়, তাহলে ওঁকে সরিয়ে নিয়ে যান। এমন বিপদের জায়গায় কেন উনি থাকবেন?

- কেবল কি পিশাচ-হাউন্ডের জন্যই আপনি এ প্রাচীন ভবনকে বিপদের জায়গা মনে করছেন-না অন্য কিছু?

- কেবল সেই কারণেই।

- মিস, একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন? আপনার ভাইকে গোপন করে এভাবে কথাটা আমাকে জানালেন কেন?

- আমার ভাই অন্তর দিয়ে চান, বাস্কারভিল হলে কেউ এসে বসবাস করুন। তাহলে অঞ্চলের মানুষ উপকৃত হবে নানাভাবে। যদি শোনেন আমি স্যার হেনরীকে চলে যাওয়ার মত প্ররোচনা দিয়ে কথা বলছি তাহলে দুঃখ যেমন পাবেন-আমার ওপর অসন্তুষ্টও হবেন। থাক, আর দাঁড়াব না।

বলতে বলতে সামনের প্রস্তররাশির আড়ালে বেগে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু আমার মনে মহিলা গেঁথে নিয়ে গেলেন রহস্যময় জিজ্ঞাসা আর অজানা এক আতঙ্ক।

আর অপেক্ষা না করে দ্রুত চালালাম বাস্কারভিল হলের দিকে।

হোমস্ বলেছিল, এখানকার সব রকম খবরা-খবর আমি যা দেখছি-উপলব্ধি করছি-যা শুনছি নিয়মিত এখান থেকে জানাতে। আমিও সেভাবেই তাকে জানিয়েছি সব। চিঠিতে, কখনো টেলিগ্রাম করে।

তেরো অক্টোবরের চিঠিতে যা জানিয়েছিলাম, তার অনুলিপি হুবহু তুলে ধরছি-

প্রিয় হোমস্,

আমার আগের পাঠানো চিঠি এবং টেলিগ্রাম নিশ্চয়ই তোমার হাতে পৌঁছেছে।

গত কদিন, পাঠাবার মত গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর ছিল না বলে লিখিনি।

এখানে এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে আমার দিন কাটছে। বসবাস অভিশপ্ত এক প্রাচীন ভিটেতে। সে আবার এমন এক জায়গায় যার চারিদিকে ন্যাড়া গ্রানাইট পাথরের পাহাড়, ঝোপ জঙ্গল আর ভয়াবহ জলাভূমি।

তুমি শুনে অবাক হবে জলার বুকে অসংখ্য পাথরের স্তূপের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক মানবের বসবাস আর কাজকর্মের নিদর্শন।

প্রকান্ড পাথরের ছাদহীন কুটিরগুলো দেখলে মনে হয়-এই বুঝি পাথরের কুঠার হাতে ভেতর থেকে কেউ বেরিয়ে আসবে। এই ঊষর ভূমিতে এত ঘন বসতি কি করে হল তা প্রত্নতত্ত্ববিদদের গবেষণার বিষয় হতে পারে।

জেলখানার পলাতক কয়েদির কথা তোমাকে জানিয়েছিলাম। গত পনের দিনে একবারও তার আভাস এখানে মেলেনি। সকলেই ভেবেছিল পাহাড়ে পাথরের ঘরের মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। এখন বোঝা যাচ্ছে সে এখানে এসেও পরে অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। এখানে পালিয়ে থাকা হয়তো যায় কিন্তু খিদে মেটাবার কোন উপায় নেই।

একটা মজার সংবাদ হল এই যে, স্যার হেনরী তার সুন্দরী প্রতিবেশীনির প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন বুঝতে পারছি।

প্রকৃতিবিদ ষ্টেপলটনের বোনের কথা বলছি। মহিলা যথার্থ সুন্দরী বলতে যা বোঝায় তাই। তবে ভাইকে যে মহিলা খুবই ভয় পান সেটাও বোঝা যায়।

প্রথমদিনেই বোনকে নিয়ে এ বাড়িতে এসেছিলেন ষ্টেপলটন। আর প্রথম দিনেই দুজন দুজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। এখন প্রায় প্রতিদিনই ভাই-বোনের কারোর না কারোর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়ে যাচ্ছে।

আজ রাত্রে এখানে খাবেন ওঁরা। সামনের সপ্তাহে আমাদের যাবার কথা আছে।

ষ্টেপলটন কিন্তু লক্ষ্য করেছে বোনের মনোভাব। তাই একটু ঘনিষ্ঠ কথাবার্তা হতে দেখলেই তার চোখ মুখের ভাবে অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করি।

প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বোনটি কাছছাড়া হয়ে গেলে তিনি একা হয়ে পড়বেন, হয়তো সে কারণেই বোনকে আড়াল করে রাখতে চান। দু-চারবার সাক্ষাতকারও বানচাল করে দিয়েছেন।

দুষ্ট হিউগোর কিংবদন্তীর উৎস যেখানে ষ্টেপলটন সে জায়গাটা আমাদেরকে দেখিয়ে এনেছেন।

জলার ভেতরে মাইল কয়েক ভেতরে জায়গাটা। এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এসে খা-খা ঘাস-ছাওয়া প্রান্তর। পরিবেশটাই কেমন ভয় ধরানো।

স্যার হেনরী কৌতূহলী হয়ে ষ্টেপলটনের কাছে অনেক কথাই জানতে চাইছিলেন। ষ্টেপলটন বিজ্ঞানী হলেও দেখলাম, গুজবে যথেষ্ট বিশ্বাসী।

অশুভশক্তির প্রকোপে সর্বনাশ হয়েছে এমন অনেক ঘটনা তিনি আমাদের শোনালেন।

গত বৃহস্পতিবারে ডক্টর মার্টিমার লাঞ্চ খেয়ে গেলেন আমাদের সঙ্গে। সম্প্রতি লঙডাউনে তিনি একটা কবর খুঁড়ে প্রাগৈতিহাসিক করোটি উদ্ধার করেছেন। এখন একরকম মেতে আছেন সেটা নিয়ে।

সেদিন কিছু পরে ষ্টেপলটনরা এসেছিলেন। সকলে একত্র হলে স্যার হেনরীর অনুরোধে ডাক্তার আমাদেরকে নিয়ে সেই অভিশপ্ত ইউ-বীথিতে গেলেন যেখানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল - খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখালেন।

গোটা জায়গাটাতে কেমন গা ছমছাম ভাব। বীথির মাঝামাঝি জায়গায় জলার দিকে হুড়কো লাগানো সাদা কাঠের ছোট ফটক। তার ওপাশেই বিশাল জলা।

স্যার চার্লস এখানে দাঁড়িয়ে চুরুটের ছাই ঝেড়েছিলেন। তোমার থিওরী মনে পড়ল। বৃদ্ধ কারোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন- এমন সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউ-বীথি ধরে প্রাণভয়ে দৌড়েছেন। কিন্তু কিসের ভয়ে?

ভেড়া তাড়ানো কুকুর দেখে এমন ভয় পাওয়া কি স্বাভাবিক?

তাহলে কি সত্যিই কোন প্রেত-কুকুর তাকে তাড়া করেছিল?

শরীরী প্রেতের সেই ভয়াল ভয়ংকর রূপ দেখেই কি আতঙ্কিত হয়েছিলেন স্যার চার্লস?

ব্যারিমুর বা ঐ জাতীয় কোন দুষ্ট মানুষের হাত নেই তো এই ঘটনার পেছনে?

ব্যারিমুরের প্রতি সন্দেহটা ক্রমেই যেন ঘনীভূত হচ্ছে। ওর সব কিছুই যেন মনে হচ্ছে রহস্যময়। লাফটার হিলের মি. ফ্রাঙ্কল্যান্ডের সঙ্গে আলাপ হলো। এ এক মজার প্রতিবেশী। হল থেকে মাইল চারেক দক্ষিণে ভদ্রলোকের বাড়ি। মাঝামাঝি বয়সের মানুষ-চুল ধব্‌ধবে সাদা, মুখের রঙ লাল, অল্পেতেই রেগে যান।

মামলাবাজ বলতে যা বোঝায় ভদ্রলোক তাই। মামলা করার জন্যই লড়েন। এই করে সম্পত্তির অর্ধেক ফুঁক দিয়েছেন। কারণে অকারণে চ্যালেঞ্জ করে বসেন।

সাধারণের চলাচলের ন্যায়সঙ্গত পথ বন্ধ করে দিয়ে মিথ্যা মামলা জুড়ে দেন। এই মুহূর্তে ভদ্রলোকের হাতে সাত সাতটি মামলা ঝুলছে।

এমনিতে কিন্তু ভদ্রলোক অমায়িক, আলাপি। মনটাও ভাল। ইনি আবার সখের জ্যোতির্বিজ্ঞানীও বটে। বাড়ির ছাদে একটা টেলিস্কোপ বসিয়েছেন।

টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে কদিন পলাতক কয়েদীর সন্ধানে জলাভূমি এক রকম চষে ফেলেছেন।

শোনা যাচ্ছে লঙডাউনে কবর খোঁড়ার আগে প্রতিবেশীর সম্মতি নেননি বলে ইনি ডক্টর মার্টিমারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন।

এবারে কালরাতের একটা বিস্ময়কর ঘটনার বিবরণ তোমাকে দিচ্ছি। খবরটা ব্যারিমুর দম্পতিকে কেন্দ্র করে। ইতিমধ্যে লন্ডন থেকে জামাকাপড় এসে যাওয়ায়-পুরানো পরিচ্ছদগুলো স্যার হেনরী বাতিল করেছেন। দান করে দিয়েছেন ব্যারিমুরকে।

মিসেস ব্যারিমুরের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে চলেছি। এবাড়িতে এসে প্রথম রাতেই বুকফাটা কান্নার শব্দ শুনেছিলাম। তারপরেও একাধিকবার ভদ্রমহিলার চোখে অশ্রুর দাগ লক্ষ্য করেছি।

বুঝতে পারছি না কি ব্যাপার। ব্যারিমুর বউকে কষ্ট দেয় কিনা জানিনা। লোকটা খুবই সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে আমার।

কাল রাতের ঘটনার পর লোকটার সম্পর্কে আমি আরো সতর্ক হয়েছি।

রাত প্রায় দুটোর সময়ে আচমকা আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। শুনতে পেলাম আমার দরজার বাইরে করিডোরে পা টিপে চলার শব্দ। সন্তর্পণে দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখলাম, একটা লোক আলতো হাতে মোমবাতি নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

উচ্চতা দেখে চিনতে পারলাম-ব্যারিমুর। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হাঁটছে। পায়ে জুতো বা চটি কিছুই নেই। নিঃশব্দে পিছু নিলাম।

বারান্দা ঘুরে একটা ঘরে গিয়ে সে ঢুকল। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগলাম।

ঘরে ঢুকে কাচের সার্সির গায়ে মোমবাতি ধরে জানালার ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে রইল। বাইরের জমাট অন্ধকারের বুকে কিছু লক্ষ্য করছে বলে মনে হয়।

তারপর কেমন গুডিয়ে উঠে মোমবাতি নিভিয়ে দিল। পা টিপে টিপে নিঃশব্দে ফিরে এলাম ঘরে।

কিছুক্ষণ পরে পায়ের শব্দে টের পেলাম-ফিরে যাচ্ছে ব্যারিমুর।

ব্যাপারটা মাথায় রেখেই বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম।

তন্দ্রামত এসেছিল তলার ফোকরে চাবি ঘোরানোর ক্লিক আওয়াজ কানে যেতে তন্দ্রা ভেঙে গেল। শব্দটা কোন্ দিক থেকে এল বুঝতে পারলাম না।

বিষাদঘেরা এই প্রাচীন প্রাসাদপুরীতে কিসের যেন একটা ষড়যন্ত্র চলেছে-সঙ্গোপনে-তার আভাস পাচ্ছি।

ঘটনা যেমন ঘটছে তাই হুবহু জানালাম-এ থেকে বাড়ির রহস্য উন্মোচনের সন্ধান তুমি করবে। আজ সকালে স্যার হেনরীর সঙ্গে বসে খোলাখুলি আলোচনা করে একটা নৈশ অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ফলাফল পরবর্তী চিঠিতে তোমাকে জানাতে পারব।

চার

প্রিয় হোমস্,

ঘটনার ঘনঘটা চলছে আমার চারপাশে। তোমাকে রাতে জানালায় ব্যারিমুরের রহস্যজনকভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কথা জানিয়েছিলাম। এবার তার পরবর্তী পর্যায় শোন।

যে ঘরে ব্যারিমুর ঢুকেছিল, পরদিন সকালে সে ঘরে ঢুকেছিলাম। পশ্চিমের যে জানালা দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ছিল ব্যারিমুর, লক্ষ্য করলাম এখান থেকে জলার খুব কাছের চেহারা দেখা যায়।

অন্য যে কোন জানালায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে জলার দূরের দৃশ্য।

এ জানালায় দাঁড়িয়ে দুটো গাছের ফাঁক দিয়ে জলার ভেতর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা যায়। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে। নিশ্চয় জলার বুকে কিছু দেখবার আশায় সে দাঁড়িয়েছিল। পরে পেয়েছিলাম তালায় চাবি ঘোরানোর আওয়াজ।

স্যার হেনরী বলেছিলেন, ব্যারিমুর রাতে বাড়ি টহল দেয়-এর আগেও দু'দিন উনি টের পেয়েছেন।

তুমি থাকলে নিশ্চয় গোপনে পিছু নিয়ে জানবার চেষ্টা করতে রোজ রাতে ঐ বিশেষ জানালায় গিয়ে আলো হাতে দাঁড়ায় কিনা।

আমরাও স্থির করলাম, এবারে পায়ের আওয়াজ পেলেই পিছু নেব।

ব্যারিমুর সম্পর্কে আলোচনার পরেই স্যার হেনরী জলার দিকে যাবেন বলে উঠে দাঁড়ালেন। তাকে একা যেতে দিতে পারি না আমি শুনে তিনি যা বললেন তাতে বুঝলাম, গোপন অভিসারের ব্যাপার। এক্ষেত্রে আমার উপিস্থিতিটা না ঘটলেই তিনি খুশি হন।

আমি এ অবস্থায় কি করব ভেবে স্থির করতেই তিনি টুপি তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এভাবে তাঁকে জলার মধ্যে যেতে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না- আমার কর্তব্যে অবহেলার জন্য পরে অনুশোচনা হতে পারে মনে হতেই

দৌড়ে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়।

কিন্তু স্যার হেনরীকে চোখে পড়লো না। তখন ওপর থেকে দেখতে একটা পাহাড়ের ওপরে উঠলাম।

দেখলাম প্রায় সিকি মাইল দূরে জলার রাস্তায় হাঁটছেন-পাশে একটি নারীমূর্তি। বুঝলাম মিস ষ্টেপলটন- সাক্ষাতকারের দিনক্ষণ নিশ্চয় স্থির করা ছিল আগে থেকে।

কি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল হোমস্। দুজনের চলা, কথা বলার ভঙ্গী, ঘনিষ্ঠতা দূরের পাহাড়ের ওপর থেকে যা চোখে পড়ল তাতে বুঝতে কষ্ট হলো না দুজন মনের দিক থেকে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন ইতিমধ্যেই।

হাত নাড়া এবং কথা বলার ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারলাম মিস ষ্টেপলটন কি একটা বিষয় ব্যাকুল ভাবে বোঝাতে চাইছেন স্যার হেনরীকে।

তন্ময় হয়ে শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে যেন মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাচ্ছেন ব্যারনেট।

দুজনে এভাবে গভীর আলোচনায় তন্ময় হয়ে রয়েছেন - এমন সময় প্রজাপতি-ধরা জাল নিয়ে সেখানে কোত্থেকে এসে হাজির হলেন মি. ষ্টেপলটন। তাকে দেখতে পেয়েই দুজন দুদিকে ছিটকে সরে গেলেন।

দুজনকে এই জায়গায় এভাবে দেখতে পাবেন আশা করেননি বোধহয় ভদ্রলোক। পাগলের মত লাফাতে লাগলেন আর উত্তেজিত ভাবে কি বলতে লাগলেন।

স্যার হেনরী বারবার বোঝাতে চেষ্টা করছেন কিন্তু ষ্টেপলটন কিছুই বুঝতে চাইছেন না। খেপে উঠেছেন। শেষে অভিভাবকের গম্ভীর চেহারায় বোনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন ষ্টেপলটন।

আর মাথা নিচু করে মূর্তিমান বিষাদের মত ফেরার পথ ধরলেন মি. হেনরী।

দৌড়ে পাহাড় থেকে নেমে এলাম। আমাকে দেখে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন ব্যারনেট। তাকে এভাবে একা ছেড়ে দিয়ে আমার পক্ষে যে নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব নয় তা বোঝালাম এবং এও বললাম ওর পেছনে পেছনে এসে পাড়াড়ের ওপর থেকে কি দেখেছি।

প্রথমে ক্রোধ দপ করে জ্বলে উঠল তার চোখে। কিন্তু আমার সরল স্বীকারোক্তিতে পরক্ষণেই জল হয়ে গেলেন। তখন সব কথাই খুলে বললেন।

বোনের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে খুবই আপত্তি প্রকাশ করেছেন ষ্টেপলটন। আজই নিরিবিলি মন খুলে কথা বলার সুযোগ এসেছিল।

স্যার হেনরী বললেন, একটা ব্যাপার তার কাছে রহস্যময় ঠেকেছে- প্রেম বা আবেগের কথা এড়িয়ে সুযোগ পেলেই মহিলা একটা কথাই তাকে শুনিয়েছেন, এ জায়গা অতি ভয়ঙ্কর-এখান থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাবেন না।

খেতাব, সম্পত্তি, বয়স, চরিত্র, আকৃতি কোনদিক থেকেই ব্যারনেট মিস ষ্টেপলটনের অযোগ্য নন-তথাপি তার সঙ্গে বোনের মেলামেশায় ভদ্রলোকের এত আপত্তি কেন বুঝতে পারছি না। বংশের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে তিনি বোনের ভাগ্যকে জড়াতে দিতে চান না, না অন্য কোন কারণ বুঝে উঠতে পারলাম না আমরা দুজনের কেউই।

সারা দিন খুবই বিমর্ষ হয়ে রইলেন স্যার হেনরী।

সেদিন বিকেলেই কিন্তু আকাশের মেঘ কাটল। ষ্টেপলটন এলেন এবং স্যার হেনরীর সঙ্গে একান্তে বসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলে সামনের সপ্তাহে রাতের আহারের নিমন্ত্রণ জানিয়ে চলে গেলেন।

স্যার হেনরীর কাছে জানলাম, ভদ্রলোক সকালের ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন।

ভাই-বোন মিলে থাকেন-বিয়ে হলে বোন চলে যাবে-তিনি সংসারে একা হয়ে পড়বেন- সেই নিঃসঙ্গ স্নেহ মমতাহীন জীবনের কথা মনে পড়লে নাকি তার মাথায় সব গোলমাল হয়ে যায়।

তবে বোনকে সারাজীবনের জন্য তো আর কাছে কাছে রেখে দেওয়া ঠিক হবে না। সেটা হবে চরম স্বার্থপরতা। তাই তাকে যদি পাত্রস্থ করতে হয় তবে স্যার হেনরীর মত সজ্জন প্রতিবেশীর জন্যই করবেন।

কিন্তু ভবিষ্যৎ একাকীত্বের এই আঘাত সামলে ওঠার প্রস্তুতির জন্য ভদ্রলোক কিছুদিন সময় চেয়েছেন। স্যার চার্লসকে কথা দিতে হল-মাস তিনেক তিনি মিস ষ্টেপলটনের সঙ্গে মিশবেন কেবলই বন্ধুর মত, এর চাইতে বেশি এগুবেন না।

ষ্টেপলটনের ব্যবহার নিয়ে আমাদের মনে যে একটা রহস্য উঁকি মেরেছিল তার নিরসন হল এভাবে।

হোমস্, এবারে তোমাকে জটপাকানো কিছু ব্যাপার পরিস্কার করছি।

নিশীথ রাতে ফোঁপানো কান্না, মিসেস ব্যারিমুরের কান্নাফোলা মুখ, গভীর রাতে পশ্চিমের জানালায় খাস চাকরের গোপন অভিযানের রহস্য একে একে বিবৃত করছি।

এই রহস্য উদঘাটনের জন্য আমাদের দুটো রাত ব্যয় করতে হয়েছে। প্রথম রাতে স্যার হেনরীর ঘরে তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে থেকেও

বারান্দায় পায়ের শব্দ শুনতে পাইনি।

হতাশ না হয়ে পরদিন আবার শিকারের জন্য ওঁৎ পেতে বসলাম।

রাত দুটো বেজে যাবার পরে কানে এলো বারান্দা পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাচ্ছে।

দুজনেই নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরলাম-দেখলাম মোম হাতে দাড়িওয়ালা ব্যারিমুর এগিয়ে যাচ্ছে।

আগের দেখা সেই বিশেষ ঘরটিতে গিয়ে ঢুকল। অন্তরালে থেকে আমরা উঁকি মেরে রইলাম।

দেখলাম, আজও সে একই ভাবে জানালার সামনে জ্বলন্ত মোমবাতি ধরে সার্সির ওপরে মুখ চেপে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে অপলকে।

স্যার হেনরী আর দেরী না করে সরাসরি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। জানালার সামনে থেকে ছিটকে সরে গিয়ে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল ব্যারিমুর। মুখ ফ্যাকাশে।

স্যার হেনরী জিজ্ঞেস করলেন, কি করছ তুমি এখানে?

ব্যারিমুর উত্তেজনা চেপে শান্তভাবে বলবার চেষ্টা করল-জানালাটা দেখছিলাম স্যার। সব জানালা বন্ধ আছে কিনা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম।

কড়া গলায় এবার বললেন স্যার হেনরী, মিথ্যা বাদ দিয়ে সত্যি কথাটা বলে ফেল কি করছিলে জানালায়-

ব্যারিমুর একই কথার পুনরাবৃত্তি করল।

জানালার গোবরাটে মোমটা রেখেছিল ব্যারিমুর। আমি সেটা তুলে নিয়ে ও যেভাবে ধরেছিল ঠিক সেভাবে ধরলাম।

চোখ তুলে ধরলাম সামনে-গাছের আবছা কালো রেখা আর দিগন্ত বিস্তৃত জলার রেখা, অস্পষ্ট নজরে এল।

সহসা সেই নিঃসীম অন্ধকারের বুকে জেগে উঠল একটা হলুদ আলোর বিন্দু।

স্যার হেনরীকে ডেকে দেখালাম-স্পষ্ট সংকেতের লক্ষন। হাতের আলোটা নাড়ালাম, সঙ্গে সঙ্গেই দুরের হলুদ বিন্দুও নড়ল। সংকেত ছাড়া এ কিছু নয় নিঃসন্দেহ হলাম।

সে রাতে অনেক পীড়াপীড়িতেও ব্যারিমুর একটা কথাই বারবার বলল-সে নিজ মুখে কিছু বলতে পারবে না। গোপন এই রহস্যটা তার নয়। কাজেই সে কিছু ফাঁস করতে পারবে না।

স্যার হেনরী অবশেষে ছাঁটাইয়ের ভয় দেখালেন। এমন সময় মিসেস ব্যারিমুর উপস্থিত হল।

একটা নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হল এবং যে কাহিনী শুনলাম তা শুনব বলে স্বপ্নেও ভাবিনি।

জেল পলাতক কয়েদী সেলডন মিসেস ব্যারিমুরের ছোট ভাই। ছেলেবেলা থেকেই আদরে আদরে উচ্ছন্নে গেছে। বড় হয়ে কুসঙ্গে পড়ে কুকর্মে লিপ্ত হয়ে জেল খাটছিল।

বাইরে যতই সে কুখ্যাত হোক না কেন মিস ব্যারিমুরের কাছে ছিল সেই ছোট আদরের ভাইটি। জেল পালিয়ে সে জলায় গা ঢাকা দিয়েছিল।

একদিন রাতে অনাহারে ক্লান্তিতে ধুঁকতে ধুঁকতে এখানে আশ্রয় নিতে আসে। স্নেহকাতর বড়বোন তাকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি। আহার ও আশ্রয় দিয়ে কয়েকদিন তার শুশ্রূষা করল।

এই সময়েই উপস্থিত হলেন স্যার হেনরী। তখন সেলডন গিয়ে আশ্রয় নিল পাহাড়ী গুহায়। এক রাত অন্তর জানালায় আলো জ্বেলে দেখা হয় সেখানে আছে কিনা।

যদি জবাব আসে, মি. ব্যারিমুর কিছু রুটি আর মাংস দিয়ে আসে।

সেলডন দূরে কোথাও চলেও যাবে সে কথাই বলেছিল-যদি না যায়, খাবার না দিয়ে বোনের মন শান্তি পায় কি করে?

মিসেস ব্যারিমুর ধর্মভীরু খ্রিষ্টান। তার প্রত্যেকটা কথা ছিল সুগভীর আন্তরিকতা মেশানো। অবিশ্বাস করার সাধ্য আমাদের হল না।

স্বামী-স্ত্রী দুজনকে শান্ত করে ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

জানালা দিয়ে আমরা তাকালাম বাইরে। জলার কনকনে ঠান্ডা হাওয়া নাকে-মুখে যেন ঝাপটা মারছে। দেখা গেল, অনেক দূরে-টিমটিম করে জ্বলছে হলদে আলোর ক্ষুদ্র চ্ছটা। মনে হল দু-এক মাইলের মধ্যেই রয়েছে আলোটা।

সেদিকে তাকিয়ে স্যার হেনরী বললেন, ওয়াটসন, সেলডন জেল পলাতক খুনী আসামী-সমাজের শত্রু। একে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। যে কোন সময় যে কোন প্রতিবেশীর ওপর হামলা করতে পারে। ষ্টেপলটন ভাই-বোনও বিপদে পড়তে পারে। ওকে ধরা দরকার।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমরা।

জলায় নেমেই শুনতে পেলাম-জলার বুকে সেই ভয়াল ভয়ঙ্কর গজরানি। এর আগে দিনের বেলায় শুনেছি। এখন এই গভীর রাতে বিস্তীর্ণ গ্রিমপেন কর্দমভূমির ওপর দাঁড়িয়ে রক্ত হিম-করা সেই গর্জন শুনে মনে হল যেন নরকের দ্বারপ্রান্তে হাজির হয়েছি।

স্যার হেনরীও কৌতূহল, বিস্ময় ও ভয় নিয়ে শুনতে লাগলেন। নিশীথ

রাতের কনকনে হাওয়ায় ভর করে যেন জলার গভীর থেকে ভেসে আসতে লাগল সেই পৈশাচিক শব্দ-একটানা গভীর গজরানি-তারপর হিংস্র গর্জন।

ধাপে ধাপে বেড়ে গিয়ে ক্রমে গোঙানির শব্দের মত হয়ে মিলিয়ে গেল।

একবার নয়-

বারবার একইভাবে নিশীথ রাতের নিথর বুক ফালাফালা করে দিতে লাগল সেই অপার্থিব চিৎকার।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম তীব্র ভয়ে আতঙ্কে মুখ সাদা হয়ে গেছে স্যার হেনরীর।

এক সময় একেবারেই থেমে গেল সেই ভৌতিক গর্জন। স্যার হেনরী, অন্ধকারের দিকে মুখ রেখে বললেন-এতো স্পষ্ট হাউন্ডের ডাক। এই কি সেই বাস্কারভিল-কুকুরের ডাক? মনে হয় বহু মাইল দূর থেকে ভেসে এল।

আমারও মনে হল গ্রিমপেন জলায় বিপজ্জনক কাদার সমুদ্র যেদিকে, ডাকটা ভেসে এল সেদিক থেকেই।

কিন্তু রাতের অজানা আতঙ্ক আমাদের বাধা হয়ে উঠতে পারল না। সোৎসাহে এগিয়ে চললেন স্যার হেনরী জলার পাঁক ভেঙে।

দূরের আলোটা অন্ধকারের বুকে এখনো জেগে রয়েছে। চলতে চলতে কখনো মনে হচ্ছে দূরে, কখনো কাছে। অনেকটা পথ পার হয়ে আসবার পর আলোটা কোথায় জ্বলছে স্পষ্ট চোখে পড়ল।

আমাদের সামনেই পাহাড়ের খাঁজে বসানো একটা মোমবাতি। দু'পাশে পাথরের আড়াল। ফলে আলোটা হাওয়ায় নিভছে না-আর বাস্কারভিল হলের দিক থেকে ছাড়া অন্য দিক থেকে দেখার সম্ভাবনাও নেই।

গোলাকার একটা গ্রানাইট পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সংকেত-বাতিটার দিকে তাকিয়ে রইলাম আমরা।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। যাকে দেখব বলে ছুটে এসেছি-সহসা সেই খাঁজের ওপর আবির্ভূত হল তার ভয়ঙ্কর মুখটা।

জট পাকানো চুল,খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর মুখময় নোংরা পাঁকের দাগ। যেন প্রস্তর যুগের কোন বর্বর মানুষের অবয়ব।

অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে ডাইনে বায়ে চোখ ঘুরিয়ে কি যেন দেখছে লোকটা। হয়তো কোন কারণে সন্দেহের উদ্রেক ঘটেছে। মনে হল, যে কোন মুহুর্তে লোকটা পালিয়ে অন্ধকারে মিশে যেতে পারে।

সময় নষ্ট না করে সবেগে ধেয়ে গেলাম সামনে। স্যার হেনরীও আসতে লাগলে পেছনে। সেইমুহূর্তে তীক্ষ্ণগলায় গালাগাল দিয়ে সে একটা পাথর ছুঁড়ে মারল-চকিতের জন্য দেখলাম বেঁটেখাটো গাট্টাগোট্টা একটা

মূর্তি লাফ দিয়ে পড়ে দুর্দান্ত বেগে নেমে যেতে লাগল।

পাথরে পাথরে পা দিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রগতিতে লাফাতে লাফাতে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রাণপণ দৌড়েও তার নাগাল পেলাম না। ক্লান্ত হয়ে দুজনে দুটো পাথরের ওপরে বসে হাঁপাতে লাগলাম।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠতে যাব ঠিক সেই সময়েই চোখে পড়ল অপ্রত্যাশিত এক দৃশ্য। চাঁদের আলোর উজ্জ্বল পটভূমিকায় মিশমিশে কালো একটা মূর্তি-দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের ওপর। মূর্তিটা পুরুষ মানুষের-দীর্ঘকায়, ছিপছিপে। বুকের ওপর দুহাত ভাঁজ করে মাথা হেঁট অবস্থায় দাড়ানো। যেন শরীরী মূর্তিতে কোন অশরীরী আত্মা।

পলাতক কয়েদীটি সে নয় - সে যেখানে অদৃশ্য হয়েছে তারও অনেক দূরে এই মূর্তি। স্যার হেনরীকে আঙুল তুলে দেখালাম। কিন্তু তিনি ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতেই চোখের নিমেষে অদৃশ্য হল মূর্তি। বললেন, কোন ওয়াচারকে হয়তো আমি দেখেছি। জেল পলাতক আসামীকে ধরবার জন্য জলায় প্রহরা বসিয়েছে পুলিশ।

হয়তো তিনি ঠিকই বলেছেন। আমি আর এ নিয়ে বিশেষ ভাবিনি।

হোমস, দরকারি অদরকারি সব কথাই খুঁটিয়ে লিখলাম। এবারে তুমি যাচাই বাছাই করে তোমার সিদ্ধান্ত প্রস্তুত কর।

এখানে আসার পর প্রতিদিনই ডায়েরী লিখতে শুরু করি। সেই ডায়েরির কটা পাতা এবারে তুলে দিচ্ছি। কয়েদী সেলডনকে তাড়া করার ঘটনার পরের সকাল থেকেই শুরু করছি।

পাঁচ

অক্টোবর ১৬

আজ সকালে ব্রেকফাস্টের পর ব্যারিমুর এসে জানাল সে স্যার হেনরীর সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলতে চায়।

স্যার হেনরী তাকে নিয়ে পড়ার ঘরে চলে আসেন। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর স্যার হেনরী আমাকে ডেকে বললেন, ব্যারিমুরের ধারণা তার আত্মীয়কে তাড়া করে আমরা আঘাত করেছি।

ব্যারিমুর বলল, এমনিতেই বেচারী সেলডনকে ধকল সইতে হচ্ছে। আমার দ্বারা তার দুর্ভোগ আরো বাড়ল-এ কথাটা ভাবতে খুব খারাপ লাগছে।

স্যার হেনরী বললেন, এটা তো সত্যি কথা, লোকটা তোমার আত্মীয় হলেও এখন সমাজের শত্রু। সাধারণের কাছে বিপদজ্জনক। জলার যে কোন বাড়িতে যে কোন সময় সে হামলা করতে পারে।

- কারো বাড়িতে ও ঢুকবে না বিশ্বাস করুন স্যার হেনরী। কদিনের মধ্যেই সে দক্ষিণ আমেরিকা রওনা হবে। দয়া করে আপনারা সে যে জলায় আছে এ কথাটা পুলিশকে জানাবেন না। তা হলে জাহাজ না আসা পর্যন্ত কটা দিন সে নিশ্চিন্তে জলায় কাটাতে পারবে। পুলিশকে জানালে, আমি আর আমার স্ত্রীও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারি।

এই সময় স্যার হেনরী আমার মতামত জানতে চাইলে বললাম, দেশ ছেড়ে গেলে অবশ্য আর কোন কথা থাকে না।

- কিন্তু ইতিমধ্যে যদি কারো কোন ক্ষতি করে বসে?

- স্যার, আমি শপথ করে বলতে পারি, নতুন করে আর কোন অপরাধ সে করবে না। তা হলেই পুলিশ তার অবস্থান জেনে যাবে।

- ঠিক আছে ব্যারিমুর, তুমি নিশ্চিন্ত হও।

ব্যারিমুর কৃতজ্ঞতায় বারবার ঈশ্বরের কাছে তার মনিবের কল্যান প্রার্থনা করে বিদায় নিল।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরে এসে কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়াল। বলল, স্যার, আপনার দয়ার কথা আমাদের মনে থাকবে। প্রতিদানে আমারও কিছু করা উচিত। একটা ব্যাপার আমি জানি - তদন্ত শেষ হয়ে যাবার পরে আমি জেনেছি, তাই আগে জানতে পারিনি। ব্যাপারটা স্যার চার্লসের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে।

কথাটা শুনেই আমি আর ব্যারনেট লাফিয়ে উঠলাম।

- কিভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তুমি জান?

- তা জানি না, ঐরকম একটা সময়ে কেন গেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তা জানি। তিনি একজন মহিলার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

এরপর ব্যারিমুরের কাছে থেকে যা জানা গেল তা খুবই চমকপ্রদ।

মহিলাটির নাম সে বলতে পারেনি। নামের প্রথম অক্ষর L.L.- এটুকুই কেবল জানাল।

প্রতিদিনই অনেক চিঠি আসত স্যার চার্লসের নামে। দুঃখ-দুর্দশায় সাহায্য সহযোগিতা চেয়ে মানুষ চিঠি লিখত। সে দিন এসেছিল একটিই মাত্র চিঠি। তাই খামটা নজরে এসেছিল।

কুমবেহট্রিসি থেকে একজন মহিলা লিখেছেন। মনে করে রাখবার মত এমন কিছু ঘটনা নয়। কিন্তু স্যার চার্লসের মৃত্যুর পর এই চিঠির ব্যাপারটা একটু অন্য রকম ঠেকল তার কাছে।

সপ্তাহখানেক আগে পড়ার ঘর সাফ করতে গিয়েছিল মিসেস ব্যারিমুর। আগুনের চুল্লির পেছনে একটা পোড়া চিঠির ছাই তার নজরে পড়ে। সেটা সরাতে গিয়ে দেখা গেল খানিকটা অংশ কালো হয়ে রয়েছে - ভালভাবে পোড়েনি।

লেখার খানিকটা অংশ দেখে মনে হল - পুনশ্চঃ অংশের লেখা। পড়তে অসুবিধা হল না। 'দয়া করে এই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলবেন। ঠিক দশটার সময় গেটে উপস্থিত থাকবেন।'

তলার সইতে রয়েছে নামের দুটো আদ্যাক্ষর - L.L. লেখা অংশটা রক্ষা করা যায়নি - গুঁড়িয়ে গেছে।

ব্যারিমুর ওই অক্ষর দিয়ে কোন নাম মনে করতে পারল না।

এমন একটি গুরুত্বপূর্ন তথ্য উল্লসিত হবার মত হলেও গোটা ব্যাপারটা এতে আরো ঘোলাটে হল। এ সময় হোমস্ উপস্থিত থাকলে নিশ্চয় কোন সূত্র বের করতে পারত।

L.L. নামধারী মহিলাটি খুঁজে বের করতে হবে-অনেক ঘটনাই মহিলাটির কাছে জানা সম্ভব। তখুনি ঘরে এসে হোমসকে পাঠাবার জন্য রিপোর্ট তৈরী করলাম।

অক্টোবর ১

আজ সারাদিনই বৃষ্টি হচ্ছে। খোলা জলাভূমির বুকে দামাল হাওয়ার মাতম চলছে।

নানান চিন্তা মাথায় খেলা করছে। দুজনের পরিচয় এখনো অজ্ঞাত।

ছ্যাকড়া গাড়ির সেই দাড়িওয়ালা লোকটা। আর জলার পাড়ের ওপরে ষ্ট্যাচুর মত সেই মূর্তি। পলাতক কয়েদীর সন্ধানেই এই মূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে?

ক্রমে সন্ধ্যা হল। গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে জলার দিকে বেরিয়ে পড়লাম।

পায়ে চলার সরু রাস্তা কাদা প্যাচপেঁচে। খোলা জলাভূমির উন্মত্ত হাওয়ায় বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়তে লাগল মুখে

সাবধানে পা চালিয়ে হাজির হলাম নিরেট কালো পাহাড়টার তলায়। তার ওপরেই গভীর রাতের সেই অজানা প্রহরীকে দেখেছিলাম।

বৃষ্টির জলে পিচ্ছিল পাহাড়ের গা, সতর্ক পা ফেলে বহু কষ্টে শীর্ষদেশে গিয়ে উঠলাম।

সামনে ধূ ধূ বৃষ্টিধোয়া জলাভূমি-বহুদূর বিস্তৃত। অনেক দূরে ঝাপসা ভাবে চোখে পড়ছে বাস্কারভিল হলের জোড়া টাওয়ার।

যথাসম্ভব খুঁটিয়ে নজর করলাম - কিন্তু দুরাত আগের দেখা সেই অজানা প্রহরীর চিহ্ন কোনদিকে নজরে পড়ল না।

ফেরার পথে ডক্টর মার্টিমারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ফাউল-মায়ারের এক চাষী বাড়ি থেকে ফিরছিলেন। গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে বাড়ির দিকে চললেন।

ভদ্রলোক নিয়মিত প্রতিদিনই আমাদের খোঁজ-খবর নেন। কথায় কথায় খুব বিচলিত আর বিষণ্নভাবে জানালেন তার প্রিয় স্প্যানিয়েল কুকুরটা খুঁজে পাচ্ছেন না। বাদায় গিয়েছিল আর ফেরেনি।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রিমপেন কাদার বুকে তলিয়ে যাওয়া টাট্টুর কথা মনে পড়ল। বুঝলাম, জলার রাক্ষুসে পাঁকই কুকুরটাকে গ্রাস করেছে- কখনো আর ফিরে আসবে না।

ডক্টর মার্টিমারকে জিজ্ঞেস করলাম- এদিককার অনেক জায়গাতেই তো রোগী দেখতে যেতে হয় আপনাকে। আচ্ছা নামের আদ্যক্ষর L.L. কোন মহিলাকে জানেন?

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে চিন্তা করলেন ডক্টর মার্টিমার। পরে সহাস্যে বললেন - পেয়েছি - লরা লায়ন্সের নামের অদ্যাক্ষর - থাকে কুমবেট্রেসি। ফ্রাঙ্কল্যান্ডের মেয়ে।

- সেই মামলাবাজ ফ্রাঙ্কল্যান্ড?

- মামলাবাজ এবং ছিটিয়াল। লায়ন্স নামের এক আর্টিষ্টকে বিয়ে করেছিল মেয়েটি। কিন্তু বেশিদিন ঘর করতে পারেনি। লোকটা ছিল আর্টিষ্ট আর অসাধু প্রকৃতির। হঠাৎ একদিন বউকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। আগে থেকেই কি কারণে মেয়ের ওপর চটে ছিল ফ্রাঙ্কল্যান্ড। স্বামী পরিত্যক্তা দুর্ভাগা মেয়ের প্রতিও কোন দয়া দেখাল না। বাপ মেয়েতে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

- মহিলার তাহলে চলে কি করে?

ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড কিছু সাহায্য করে কিনা সঠিক বলতে পারব না। মেয়েটা এভাবে কষ্টে পড়ায় অনেকেই সাহায্য সহযোগিতা করে - ষ্টেপলটন, স্যার চালর্স এবং আমিও সহযোগিদের মধ্যে রয়েছি। মেয়েটি হালে টাইপ রাইটিং-এর কাজ করছে।

ডক্টর মার্টিমারকে কিছু বললাম না তিনিও L.L.নামের মানুষটি সম্পর্কে আমার কৌতূহলের কারণ আর জিজ্ঞেস করেননি। কাল সকালেই কুমবেট্রেসি খুঁজতে বেরুব। লরা লায়ন্স-এর সঙ্গে কথা বলা জরুরি।

বর্ষন ক্লান্ত আজকের দিনে আর একটা ঘটনা ঘটল।

ডিনার খেয়ে গেলেন ডক্টর মার্টিমার। খাওয়া-দাওয়ার পর স্যার হেনরীর সঙ্গে তাস খেলতে বসেছিলেন। আমি গিয়ে লাইব্রেরিতে বসেছিলাম। এমন সময় কফি নিয়ে ঘরে ঢোকে ব্যারিমুর।

জিজ্ঞেস করলাম তার আত্নীয়টি জলা থেকে বিদায় নিয়েছে কিনা।

ব্যারিমুর বলল, বলতে পারছি না স্যার। তিন দিন আগে খাবার রেখে এসেছিলাম, তারপর থেকে আর খবর পাইনি। তবে একদিন গিয়ে দেখেছি খাবার নেই। অন্য একটা লোকও রয়েছে সেখানে। সে নিয়ে গেল কিনা বুঝতে পারলাম না।

থমকে গেলাম কথাটা শুনে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, অন্য লোক বলতে কার কথা বলছ?

- বাদায় আরো একটা লোক থাকে-বেশ কয়েকদিন আগে সেলডনও বলেছিল। লোকটা লুকিয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু কয়েদী নয়। এসব যে কি হচ্ছে-আমার কিছুই ভাল লাগছে না ডক্টর ওয়াটসন। আমার খালি মনে হচ্ছে কোথাও একটা ষড়যন্ত্র চলছে-স্যার হেনরী লন্ডনে গিয়ে থাকলে একটু নিশ্চিত থাকতাম।

- যড়যন্ত্রের কথা মনে হচ্ছে কেন তোমার?

- পুলিশের তদন্তে যাই থাকুক-স্যার চার্লস যেভাবে মারা গেলেন-তার ওপর জলাভূমির বুকে গভীর রাতে কিরকম ভয়াবহ শব্দ ওঠে নিশ্চয় শুনেছেন। তারপর এই লোকটা, ঘাপটি মেরে সব দিকে যেন নজর

রাখছে। সব মিলিয়ে-একটা অশুভ খেলা যেন চলছে।

- শয়তান খেলায় নেমেছে ডক্টর ওয়াটসন-বাস্কারভিল বংশের কারুর নিস্তার নেই। স্যার হেনরীকে নিয়ে নতুন করে দুর্ভাবনায় ভুগছি।

- সেলডনের মুখে আর কিছু শুনেছ-লোকটা কোথায় থাকে-কি করে?

- দু একবার লোকটাকে চোখে পড়েছে তার। লুকিয়ে বেড়াচ্ছে দেখেই বুঝতে পেরেছে পুলিশের লোক নয়। সেলডন বলল-ভদ্দরলোক-কিন্তু কি করছে বুঝতে পারেনি। পাহাড়ের গায়ে যেখানে পাথরের কুটিরগুলো, সেখানেই লুকিয়ে থাকে।

- তারপর? খাওয়া দাওয়া?

- সেলডন দেখেছে-এক ছোকরা লোকটার জিনিসপত্র এনে দেয়-

আর বিশেষ কিছু জানবার ছিল না। কিন্তু ধাঁধাঁ আরো ঘোরালো হল। ব্যারিমুর চলে গেলে উঠে গিয়ে জানালার সামনে দাঁড়ালাম।

বাইরে ঝড় আর বৃষ্টির মাতম। দূর্যোগ চলছে-এরই মধ্যে নিশ্চয়ই পাথরের কুটিরে রয়েছে লোকটা। কিন্তু এত কষ্ট সহ্য করছে কি উদ্দেশ্যে?

নিতান্ত সাধারণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেউ এভাবে কষ্ট স্বীকার করে না। বিষয়টার একটা নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। স্থির করলাম আগামীকালের মধ্যে এই রহস্যের একটা কিনারা করব।

১৮ অক্টোবরের পরের থেকে ঘটনা পরপর যেভাবে ঘটে গেছে-তার বিবরণ দিতে আর ডায়েরির শরণ নেবার দরকার হবে না। স্মৃতিতেই সব তাজা হয়ে রয়েছে।

রহস্যের তলা থেকে যে কটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মাথা উঁচিয়েছে তা হলঃ

(১) স্যার চার্লস যে জায়গায় যে সময়ে মারা গেছেন, ঠিক সেই জায়গায় সেই সময়ে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন কুমবেট্রেসির মিসেস লরা লায়ন্স।

(২) বাদার পাহাড়ের গায়ে প্রস্তর কুটিরে ওঁৎ পেতে থাকা অজ্ঞাত পরিচয় ভদ্দরলোক আততায়ী।

আমার বিশ্বাস রহস্যাচ্ছন্ন এই দুই ঘটনার আলোকপাত করতে পারলে অনেক প্রশ্নেরই জট খুলে যাবে।

লরা লায়ন্স সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেবার জন্য কুমবেট্রেসিতে যাওয়া দরকার। স্যার হেনরীকে জানাতাম সব কিছু খুলে। যুক্তিটা তিনিই দিলেন-আমাকে একা যেতে বললেন। তাহলে নানাভাবে চেষ্টা করে লরার কাছ থেকে কিছু খবর সংগ্রহ করা যাবে।

৩

ছয়

কুমবেট্টেসি পৌঁছে মিসেস লরা লায়ন্সের আস্তানা খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। বসবার ঘরে রেমিংটন টাইপরাইটারের সামনে বসেছিলেন মহিলা।

ঘরে ঢুকতে প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করল মহিলার সৌন্দর্য। চুল আর চোখ দুই-ই উজ্জল পিঙ্গলবর্ণ। দেহবর্ণে গোলাপের আভা। তবে শিথিল ঠোঁটে যেন কিছুটা রুক্ষতা বিরাজ করছে-খুঁতের মধ্যে এটুকুই যা নজরে পড়ল।

কোন রকম ভূমিকা না করেই বললাম-আমি আপনার বাবার বিশেষ পরিচিত।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা দৃঢ় স্বরে বলে উঠলেন-বাবার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। বাবার বন্ধুদেরও আমি বন্ধু বলে মনে করি না। সদাশয় স্যার চার্লস বাস্কারভিল এবং আরো কয়েকজন সহৃদয় ব্যাক্তি সাহায্য্য না করলে আমাকে অনাহারে মরতে হত।

- স্যার চার্লসের ব্যাপারেই আপনার কাছে আমার আসা।

মনে হল যেন কথাটা শুনে কেঁপে উঠলেন মহিলা।

সঙ্গে সঙ্গে বললাম-বুঝতেই পারছি বিশেষ ভাবেই চিনতেন আপনি তাঁকে-নিজেই স্বীকার করলেন। আপনি নিশ্চয় চিঠিও লিখতেন তাঁকে?

ক্রুদ্ধ দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে-এসব প্রশ্নের মানে কি?

- মানে, বিষয়টা দশ কান হয়ে আর কেলেঙ্কারীর পর্যায়ে পৌঁছবে না।

ভদ্রমহিলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। খানিক চুপ করে থেকে বললেন, বলুন কি জানতে চান-ওঁর বদান্যতা আমাকে নতুনভাবে বাঁচতে সাহায্য করেছে-কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সৌজন্যমূলক চিঠি দু-একবার লিখেছি।

- দেখা সাক্ষাৎ কখনো হয়েছে?

- কুমবেট্টসিতে যখন এসেছিলেন সেই সময় দু-একবার হয়েছে।

- চিঠিতে যোগাযোগ এবং দেখাসাক্ষাৎ এত কম বলছেন-তাহলে আপনার এত উপকার করার মত খবরাখবর উনি পেলেন কি করে?

একটুও দমে না গিয়ে মিসেস লরা লায়ন্স বললেন, আমার দুরবস্থার কথা স্যার চার্লসের ঘনিষ্ঠদের দু-একজন রাখতেন। মি. স্পেলটন আমার প্রতিবেশী এবং স্যার চার্লসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আমার দুঃখের কাহিনী এঁর মুখেই উনি শুনেছিলেন।

- তা সম্ভব। আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য স্যার চার্লসকে কখনো লিখেছিলেন কি? দপ করে জ্বলে উঠে ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন- কখনোই না।

- স্যার চার্লস যেদিন মারা যান সেদিনও না? মনে হয় দিনক্ষণ আপনার ভুল হয়ে যাচ্ছে একট চেষ্টা করলেই মনে করতে পারবেন- আপনার লেখা চিঠির পুনশ্চ অংশের একটা লাইন আমি শুনিয়ে দিচ্ছি- অনুগ্রহ করে এই চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলবেন এবং ঠিক দশটার সময়ে গেটে থাকবেন-দেখা হবে।

শুস্ক ফ্যাকাশে ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন মহিলা। পরে অস্ফুটে বললেন্ তিনি কি আমার অনুরোধ রক্ষা করেন নি?

- অভিযোগ করার মত কাজ করেন নি স্যার চার্লস। চিঠিটা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবে অনেক সময় পোড়া চিঠিও পড়া যায়। তাহলে চিঠি লিখেছিলেন স্বীকার করছেন?

ভদ্রমহিলা যেন মরিয়া হয়ে উঠলেন। অস্বাভাবিক দ্রুততায় বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ লিখেছিলেন স্বীকার করছি। এতে লজ্জার কি আছে? অসুবিধার কথা সাক্ষাতে তাঁকে বুঝিয়ে বলব ভেবেছিলাম।

- কিন্তু ঐ রকম সময়ে বাড়ির বাইরে কেন?

- পরের দিন সকালেই তাঁর লন্ডনে রওনা হবার কথা। আগে দেখা করে উঠতে পারিনি। ওই সময়ে একজন ব্যাচেলারের কোয়ার্টারে যাওয়া সঙ্গত মনে হয়নি আমার তাছাড়া - সেদিন আমি যাই-ইনি।

ভদ্রমহিলার চোখে চোখ রেখে দৃঢ়স্বরে বলে উঠলাম - মিসেস লায়ন্স - অযথা জটিলতা সৃষ্টি করে কোন লাভ হবে না।

- আমি মিথ্যা বলছি না - ব্যক্তিগত কারণে যাওয়া হয়নি। যদিও এই সময়ে যাব বলে লিখেছিলাম ঠিকই।

- মিসেস লায়ন্স, ব্যাপারটা পুলিশের হাতে চলে যায় এমন কোন ঝুঁকি নেবেন না দয়া করে। আমার কথার যথাযথ উত্তর দিয়ে সহযোগিতা

করুন। চিঠির ব্যাপারটা প্রথমে অস্বীকার করলেন কেন?

- পাছে কোন কেলেঙ্কারীতে জড়িয়ে পড়ি সেই ভয়ে।

- পুড়িয়ে ফেলার জন্য এভাবে অনুরোধ করেছিলেন কেন? কি এমন লেখা ছিল চিঠিতে?

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত স্বরে বললেন, শুনেছেন কিনা জানি না, বাবার অমতে হুট করে বিয়ে করে ফেলে পরে ঘোর বিপাকে পড়ে যাই।

স্বামীর কাছ থেকে নিগ্রহ আর নির্যাতন ছাড়া আর কিছু পাইনি। নিজেকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখলেও ভয় ছিল আইনের আশ্রয় নিয়ে তার সঙ্গে সংসার করতে বাধ্য করতে পারে।

জানতে পেরেছিলাম, কিছু টাকা পয়সা খরচ করলে তার খপ্পর থেকে উদ্ধার পেতে পারি আত্মসম্মান নিয়ে স্বাধীনভাবে বাস করার বাধা থাকবে না।

নিজের মুখে আমার এই সংকটের কথা স্যার চার্লসকে জানাতে চেয়েছিলাম। সেকারণেই চিঠিটা লিখে পুড়িয়ে ফেলতে বলেছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অন্য জায়গা থেকে সাহায্য পেয়ে গেলাম বলে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ভদ্রমহিলার কাছ থেকে সেই মুহূর্তে বিশেষ কিছুই আর জানবার ছিল না। চিঠিটা লিখবার পর পরেই যদি সাহায্য পেয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে খোঁজ নেওয়া দরকার-বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করা হয়েছে কিনা।

যেভাবে শক্ত যুক্তির গাঁথুনিতে পোক্ত গল্প শোনালেন, তার সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের একটাই পথ খোলা রয়েছে।

ফেরার পথে ভদ্রমহিলার কথাগুলো নিয়েই চিন্তা করতে করতে ফিরলাম। জোর করে স্বীকারোক্তি বার করতে হয়েছে। গোছানো কথাগুলো যেন মনে হচ্ছে আগে থেকেই তৈরী করে রাখা। কিন্তু কী গোপন করছেন মহিলা?

বিশেষ কিছু উদ্ধার করা গেল না যা মূল রহস্যে আলোকপাত করতে পারে। এবারে রইল-প্রস্তরকুটিরের রহস্যময় সেই মূর্তি।

প্রস্তরকুটির অসংখ্য। তার যে কোন একটায় তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। রিজেন্ট স্ট্রীটে ঘোড়ার গাড়িতে পলকের জন্য দেখা সেই লোকই নিশ্চয় বাদায় আত্মগোপন করে নজর রেখে চলেছে স্যার হেনরীর ওপর।

এবার রিভলভার ধরে তার উদ্দেশ্যে জেনে নেবার সুযোগ প্রশস্ত। তার

আস্তানার সন্ধানটা একবার করতে পারলেই হয়।

গাড়ির কোণে বসে ভাবতে ভাবতে আসছি। মিঃ ফ্রাঙ্কল্যান্ডের বাড়ির পাশ দিয়েই গাড়ি আসছে। দরজার সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন - আমাকে দেখতে পেয়েই খুশি হয়ে যেন টেনে নামিয়ে নিয়ে গেলেন।

গাড়ি ছেড়ে দিলাম। হেঁটেই ফিরব স্থির করলাম। ডিনারের আগে বাড়ি পৌঁছলেই হবে।

মেয়ের প্রতি নির্দয় ব্যবহারের কথা জানবার পর থেকে ফ্রাঙ্কল্যান্ডের ওপর খিঁচড়ে ছিল। এর মধ্যে ঘরে ঢুকতেই শুরু করল ক্ষ্যাপামী।

কোন মামলায় কাকে কিভাবে জব্দ করেছেন-আরো কি সব প্ল্যান করছেন-সেই গল্প।

পিকনিক করতে লোকে যেত একটা বনে। মামলাতে লড়ে সেখানে পিকনিক করা বন্ধ করে দিয়েছেন। স্যার জন মরল্যান্ড বলে এক ভদ্রলোক নিজের জমিতেই খরগোশ মারতেন-গুলি করে, ইনি অপরের জমিতে অবৈধ প্রবেশের মামলা তার বিরুদ্ধে ঠুকে দিয়েছেন।

বেশ গর্বের সঙ্গেই বললেন-নিজের স্বার্থে কিছুই করছেন না। সবই করছেন জনসাধারণের জন্য-জনসাধারণের প্রতি স্বাভাবিক কর্তব্যবোধ থেকে।

একঘেয়ে বিষয়ের টানা বিবরণ কত শোনা যায়। কেটে পড়বার সুযোগ খুঁজতে লাগলাম।

এমন সময় এমন একটা কথা তার মুখ থেকে বেরুলো-যা না শুনে পারলাম না।

প্রচণ্ড বিরক্তি প্রকাশ করে ফ্রাঙ্কল্যান্ড একসময় বলে উঠলেন-এলাকায় চাষীগুলো আমার ওপর মাঝে মাঝে ক্ষেপে যায়-কুশপুত্তলিকা দাহ করে। কতবার পুলিশকে বলেছি-এসব দমন করতে। সব ঘুঘু-আমার প্রাপ্য স্বাভাবিক সহযোগিতা আমি পাই না। এবারে ফাঁদে পড়েছে-মাথার ঘাম পায়ে পড়ছে-আামি স্বচ্ছন্দেই হেনস্থা কমাতে পারি-কিন্তু করব না।

পাছে কথার তোড়ে পড়ে যাই সেই আশঙ্কায় কেবল চোখে মুখে প্রবল কৌতূহলের ভাব প্রকাশ করে তাকালাম তার দিকে। ওতেই কাজ হল।

বললেন, বাদায় পালিয়ে যাওয়া সেই কয়েদীর কথা মনে আছে তো-ইচ্ছা করলেই তাকে ধরিয়ে দিতে পারি।

- কোথায় থাকে, জানেন নাকি আপনি?

- হুঁ হুঁ ভায়া-ছাদে কি টেলিসকোপটা এমনি এমনি বসিয়ে রেখেছি

নাকি। একটা ছোকরা প্রতিদিন তার জন্য খাবার নিয়ে যায়-নিজের চোখে দেখেছি। এই রাস্তা দিয়ে একই সময় যায় রোজ।

ব্যারিমুরও বলেছিল একটা ছোকরা জলার আগন্তুককে খাবার সরবরাহ করে। চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। কিন্তু মুখভাব নির্বিকার রেখে বললাম-কোন মেষপালকের ছেলে হয়তো বাবার জন্য খাবার নিয়ে যায়।

ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠে বললেন-পাগল নাকি ভাই-তাকিয়ে দেখুন দূর জলার প্রায় মাঝ বরাবর কালো পাহাড়টা-তার পাশে যে নিচু পাহাড়-নিরেট পাথুরে জায়গা-মেষপালক ওখানে যাবে কি জন্যে?

রোজ দেখি ছোকরাকে-কোন কোন দিন দুবার যেতে দেখেছি-দাঁড়ান দাঁড়ান-কি যেন নড়ছে ওখানটায়-

বলতে বলতে ঝড়ের বেগে ছাদে গিয়ে উঠলেন। আমিও চললাম পেছন পেছন।

তিন পায়ার ওপর বসানো টেলিস্কোপটা। হাতের তেলো ও আঙুল দিয়ে চোখের ওপর ঠুলি করে যন্ত্রে চোখ রেখেই বলে উঠলেন-চটপট আসুন ডক্টর ওয়াটসন-আড়ালে চলে গেলে আর দেখতে পাবেন না।

এগিয়ে গিয়ে চোখ লাগালাম। দেখলাম, যথার্থই-রোগা চেহারার ছেঁড়া পোশাক পরা এক ছোকরা কাঁধের ওপর একটা বান্ডিল নিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠছে।

বললাম-সত্যিই তো-অমন চুপিসারে কোথায় যাচ্ছে?

- কোথায় যাচ্ছে-তা বুঝবার জন্য এক মুহূর্তও ভাববার দরকার হয় না। পুলিশ শত প্রলোভন দেখালেও আমি বলব না-ডক্টর ওয়াটসন, আপনিও কিন্তু মুখ খুলবেন না।

হেসে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালাম।

ভেতরে ভেতরে তখন প্রচন্ড অস্থিরতা বোধ করছি। দু একটা কথায় পাশ কাটিয়ে অনেক কষ্টে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম ফ্র্যাঙ্কল্যান্ডের বাড়ি থেকে।

সোজা রাস্তায় খানিকটা হাঁটলাম, তারপরই নেমে পড়লাম জলায়।

ছোড়াটাকে যে পাহাড়ের ওপর অদৃশ্য হতে দেখেছি পা চালালাম সে দিকে। দৈবক্রমে পেয়ে যাওয়া এই সুযোগের সদ্ব্যবহার আমাকে করতে হবে।

ধীরে ধীরে খাঁজ বেয়ে চুড়ায় পৌছলাম।

দূরে বহুদূরে আকাশ এসে মিশেছে মাটিতে।

চারপাশে ধূ ধূ নিস্তব্ধ জলাভূমি। আকাশের সূর্য ডুবুডুবু ।

সতর্ক চোখে চারদিকে তাকাচ্ছি। ছেলেটিকে চোখে পড়ল না কোথাও।

আমার পায়ের নিচে পাহাড়ের খাঁজে বৃত্তাকারে সাজানো অনেকগুলো পাথরের কুটির। মাঝখানে একটি কুটিরের মাথায় ছাদ অটুট রয়েছে।

এই কুটিরকেই লক্ষ্য করলাম, জল হাওয়া থেকে মাথা বাঁচানোর পক্ষে উপযুক্ত জায়গা। রহস্যময় সেই আগন্তুককে এখানেই পাওয়া যেতে পারে।

আমি গুটিগুটি পায়ে চারদিক দেখতে দেখতে এগুতে লাগলাম। গোলাকার বিরাট বিরাট চাঁইয়ের মধ্যে দিয়ে পায়ে-চলা একটা সরু রাস্তা এগিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে কুটিরের হাঁ-করা ভাঙ্গাচোরা প্রবেশপথে। অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে আমার সারা শরীরে।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রিভলভারটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলাম। তারপর এক ঝটকায় ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

আশ্চর্য! ভেতরটা শূন্য। কিন্তু আগন্তুকের বসবাসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। কুটিরের কোণের দিকে পাথরের ওপর কয়েকটা কম্বল একটা বর্ষাতি মুড়ে পাকিয়ে রাখা।

একটা চুল্লীমত জায়গা, ছাইভর্তি। পাশেই রান্নার বাসন আর আধবালতি জল। আরো চোখে পড়ল কোণে কোণে জড় করা বেশ কিছু খালি টিন।

মানুষ বসবাসের স্পষ্ট প্রমাণ। চ্যাটালো একটা পাথরের ওপরে কাপড়ে বাঁধা একটা পুঁটলিই টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে দেখেছিলাম।

এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, পুটলির ভেতরে একটা পাঁউরুটি, একটিন মাংস, আর দুটি পীচফলের মোরব্বা।

পুটলিটা সরাতেই সহসা চোখে পড়ল একটুকরো কাগজ। পুঁটলির তলায় চাপা দেওয়া ছিল। কাগজটা তুলে দেখলাম মোটা হরফে লেখা রয়েছে-ডক্টর ওয়াটসন কুমবেট্রেসি গেছেন।

চুলের ডগা পর্যন্ত শিউরে উঠল লেখাটা পড়ে।

এই রহস্যময় আগন্তুক তাহলে স্যার হেনরী নয়-লেগেছে আমার পেছেনে। কোথায় যাচ্ছি কি করছি-সব খবর সংগ্রহ করছে পাথরের এই নিভৃত কুঠুরিতে বসে।

আশ্চর্য! ক্ষণিকের জন্যেও মনে উদয় হয়নি আমার পেছনে চর ঘুরছে। ওই ছোকরাই তাহলে নজরে রাখছে আমাকে। অনুভব করলাম একটা অতি

সূক্ষ্ম জাল সুকৌশলে পাতা হয়েছে আমার চারপাশ ঘিরে।

আরো কিছু এধরনের সূত্রের সন্ধানে আশেপাশে খুঁজলাম। কিছুই পেলাম না। তাছাড়া লোকটার মতিগতি হাব ভাবের আভাস পাওয়া যেতে পারে এমন কিছুও পেলাম না।

গ্রীস্মদেশের স্পার্টানদের মত কষ্ট সহ্য করে আমার পেছনে লেগে আছে-লোকটা কে? বন্ধু নিশ্চয়ই নয়। এসে যখন পড়েছি ডেরায় আজ একটা বোঝাপড়া করে তারপর উঠব।

ততক্ষণে অন্ধকার নেমেছে জলার বুকে।

সূর্য ডুবছে। বাইরে দূরের দৃশ্য সবই ঝাপসা।

দুরুদুরু করছে বুক। কি জানি এখুনি হয়তো জলার বুকে শুরু হবে ভয়াল ভয়ঙ্কর শয়তানের খেলা।

রিভলভার মুঠিতে চেপে অন্ধকার কোণে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম।

অশুভ প্রতীক্ষায় কাটল কয়েক মিনিট। সহসা সজাগ হয়ে উঠল কান। এসেছে-সে আসছে-পদশব্দ পাচ্ছি তার। দূরে বুটজুতোর ঠকাৎ ঠকাৎ শব্দ উঠল।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে শব্দ। উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকার কোণে পাথরের দেয়াল সেঁটে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

পদশব্দ থেমে গেল হঠাৎ খানিক বিরতির পর আবার এগিয়ে আসতে লাগল। স্পষ্ট উপলব্ধি করলাম-কুটিরের দরজায় একটা ছায়ার আভাস।

সমস্ত শরীর টান টান করে উন্মুখ হয়ে রয়েছি।

সহসা কানে এল অতি পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর-ভায়া ওয়াটসন, বাইরে এসো-

কেবল চমকে উঠলাম না-যেন আগাপাশতলা কেঁপে উঠলাম।

তবু দম বন্ধ করে অপেক্ষা করে রইলাম কয়েক সেকেন্ড। তারপরই যেন সম্বিত ফিরল। তীক্ষ্ণ নিরুত্তাপ ওই কণ্ঠস্বর পৃথিবীতে একজনেরই হয়। আশ্চর্য একটা স্বস্তি যেন সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল। উল্লাসে চিৎকার করে উঠলাম-কে, হোমস?

- দয়া করে রিভলভারটা সামলে বাইরে এসো।

এবড়ো খেবড়ো পাথরের ফোকর গলে বাইরে এলাম্। একটা পাথরের ওপর বসে আছে হোমস্-চোখের দৃষ্টিতে খেলা করছে তরল কৌতুক। টুইড স্যুট পরনে, মাথায় কাপড়ের ক্যাপ।

নির্ভেজাল টুরিষ্টের পোশাক দাড়িগোঁফ কামানো। বেকার ষ্ট্রীটে যেমন

থাকে, তেমনই ফিটফাট।

হাসতে হাসতে বলল, আমার আস্তানার হদিস পেয়ে গেছ জানতাম। কিন্তু একেবারে যে ঘরে ঢুকে ঘাপটি মেরে থাকবে তা ভাবিনি। পোড়া সিগারেটটা নজরে পড়েছিল-

ব্রাডলী অক্সফোর্ড স্ট্রীট ছাপা রয়েছে গায়ে-সেই দেখে বুঝলাম শুভাগমনটা তোমারই। আমাকে ক্রিমিন্যাল ঠাউরে নিশ্চয় হাতিয়ার বাগিয়ে ভেতরে বসেছিলে?

- আজ প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম সাক্ষাৎকারটা শেষ করব।

- সেদিন একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল, বোকার মত রাতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তখনই বোধহয় আস্তানার সন্ধান পেয়েছ-সেই কয়েদীর পেছনে ধাওয়া করার সময়ে-

- আস্তানার সন্ধান পেলাম তোমার ছোকরা বয়টাকে দেখে -

- ওই বুড়োর টেলিস্কোপের মধ্যে দিয়ে নিশ্চয়? লেন্সের ঝিলিক চোখে পড়েছিল, কিন্তু কোন দিক থেকে এল বুঝতে পারিনি।

বলতে বলতে হোমস্ কুটিরে ঢুকে পুঁটলি ছাপা কাগজটা নিয়ে বাইরে এল-কুমবেট্রসি- মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে কথা হল?

- কথা হয়েছে কিছু। এবারে তুমি এসেছ-আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু এখানে এসে উঠেছ কিভাবে? আমি তো ভেবেছি লন্ডনেই কাজের চাপে রয়েছ।

- ভায়া ওয়াটসন, সামান্য একটু চালাকি তোমার সঙ্গে করতে হয়েছে, ক্ষমা করে দিও। তোমাকে সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে শান্ত হয়ে ঘরে বসে থাকতে পারিনি। এসে আত্মগোপন করেছিলাম। তা নইলে আমাদের দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে যেত।

আর বাস্কারভিল হলে তোমাদের সঙ্গে থাকলে প্রয়োজন মত বেরুতে পারতাম না। এখানে সে অসুবিধা নেই। অথচ সব খবরই রাখতে পারছি- অপেক্ষায় আছি সুযোগ মত ঝাঁপিয়ে পড়ব।

- এখানে এভাবে এত কষ্ট করে রয়েছ-ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি-

- ভায়া, ভুল বুঝো না-যে কাজে নেমেছি তার জন্যই গোপনীয়তার দরকার ছিল। তুমি জানলে উদ্বিগ্ন না হয়ে পারতে না-তাতে নানান ঝুঁকি নিতে হত। কার্টরাইট এখানে কোন অসুবিধায় রাখেনি আমাকে।

এক্সপ্রেস অফিসের সেই কার্টরাইট। ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলাম- নিয়মিত খাবার আর জামাকাপড় এনে দিত। তাছাড়া ছোকরার চোখও ধারাল-খুব কাজে লাগছে।

এমনভাবে হোমস্ তার উপস্থিতি আমার কাছে গোপন করল-কথাটা ভেবে একটা সূক্ষ্ম অভিমান ভেতরে খচ খচ করছিল। বললাম-আমার পাঠানো রিপোর্টগুলো তাহলে মাঠে মারা গেল?

- তোমার সব রিপোর্টই সঙ্গে আছে। প্রতিটা লাইন খুঁটিয়ে পড়েছি। এখানে যাতে ঠিকমত হাতে পাই সেই ব্যবস্থা করেই এসেছিলাম। বড়জোর একদিন যা দেরী হত।

মিসেস লায়ন্সের কাছে অনেক খবরই পাওয়া যাবে জানতাম, আজই যে তুমি যাবে সেটাও অনুমান করেছিলাম। অসাধারণ জটিল এই কেসে তুমি আশ্চর্য রকমের উদ্যম আর চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছ। ভায়া, এবারে শুনি তোমার অভিযান-কাহিনী।

সামনের প্রান্তর ততক্ষণে অন্ধকারে ঢেকে গেছে। কনকনে বাতাস ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে। দুজনে কুটিরের ভেতরে গিয়ে বসলাম। তারপর শোনালাম মিসেস লরা লায়ন্সের বিবরণ।

শুনে খুশি হয়ে হোমস বলল, এবারে একটা জট খুলল। এই ভদ্রমহিলা আর ষ্টেপলটনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আছে স্পষ্টই বুঝতে পারছি।

- কিন্তু সেরকম তো কিছু মনে হল না।

- আমি কিন্তু প্রমাণের অভাবে এখানটাতেই থমকে ছিলাম। তোমার বিবরণ থেকে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম ওদের দুজনের দেখা সাক্ষাৎ চিঠি আদান-প্রদান সবই হয়। দুজনের মধ্যে একটা বোঝাবুঝি রয়েছে। এবারে ওর কাছ থেকে স্ত্রীকে সরিয়ে নিতে খুব একটা বেগ পেতে হবে না।

চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। অবাক হয়ে বললাম-কে ওর স্ত্রী?

- ভায়া, এবারে তাহলে একটা চমকপ্রদ খবর তোমাকে দিচ্ছি। মিস ষ্টেপলটন-যাকে সকলে উদ্ভিদবিদের বোন বলে জানে, আসলে তিনি তার স্ত্রী।

- একী অদ্ভুত কথা! কিন্তু তাই যদি হয় তবে স্যার হেনরীকে বউয়ের প্রেমে পড়তে দেখেও প্রশ্রয় দিলেন কেন?

- ওতে স্যার হেনরী ছাড়া ক্ষতি আর কারো হবে না। তোমার সন্দেহ দূর কর ভায়া; তুমি তো নিজেও দেখেছ, প্রেমের ঘনিষ্ঠতা যাতে শরীর পর্যন্ত গিয়ে না পৌঁছায় সেদিকে তার সতর্ক নজর ছিল।

- এতো রীতিমত প্রতারনার খেলা। উদ্দেশ্য কি এর?

বলতে বলতে প্রকৃতিবিদ ষ্টেপলটনের উদাস চেহারাটা ভেসে উঠল চোখের ওপর। মুখে হাসি আর মনে ষড়যন্ত্র নিয়ে লোকটা সাদাসিদাভাবে

প্রজাপ্রতির জাল কাঁধে ছুটে বেড়াচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। এ যে দেখছি এক মহাভয়ংকর শয়তান। হোমস্‌কে বললাম-স্ত্রীকে বোন সাজিয়ে সহজেই অনেক কাজ হাসিল করছিল লোকটা-তাহলে কি এই-ই আমাদের আসল শত্রু?

- ঠিক-ঠিক জায়গায় এসে পৌছেছ। ফেউ-এর মত গোড়া থেকেই আমাদের পেছনে লেগে আছে। আর হুঁশিয়ারিটাও তারই লেখা।

- ভদ্রমহিলা যে তার স্ত্রী এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত হলে কি করে?

- তোমার রিপোর্টে ষ্টেপলটনের হঠাৎ বলে ফেলা আত্মজীবনীর কয়েকটা টুকরো ছিল। প্রথম আলাপের দিনে তার বাড়িতে তোমাকে শুনিয়েছিলেন-ইংল্যান্ডে এককালে স্কুলমাষ্টার ছিলেন ভদ্রলোক। ওটুকুকেই কাজে লাগিয়েছি।

শিক্ষাবিদদের একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তাদের দ্বারস্থ হলে যে কোন শিক্ষাব্রতী সম্পর্কে খোঁজখবর পাওয়া যায়। আমিও সামান্য চেষ্টাতেই জানতে পারলাম-ছাত্রদের প্রতি বর্বরোচিত ব্যবহারের জন্য একটা স্কুলের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়ে। ফলে স্কুলের মালিক সস্ত্রীক উধাও হয়ে যান।

সেই সময় তার নাম অন্য ছিল। কিন্তু চেহারার বিবরণে মিল পেয়ে গিয়েছিলাম। তবে ভদ্রলোকের কীটবিদ্যার অসাধারণ প্রতিভার সংবাদটুকুই আমার সনাক্তকরন সম্পূর্ণ করেছে।

- কিন্তু এর সঙ্গে মিসেস লরা লায়ন্সের সম্পর্কটা কোথায়?

- ভদ্রমহিলার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎকারের রিপোর্টই এই প্রশ্নের জবাব। স্বামীর সঙ্গে ভদ্রমহিলার বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা চলছে-এই অবস্থায় ষ্টেপলটনকে অবিবাহিত মনে করে তার স্ত্রী হওয়ার একটা স্বপ্ন মনে থাকা খুবই স্বাভাবিক।

তার এই স্বপ্নভঙ্গ করেই তাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে ভায়া। কাল আমরা দুজনেই তার সঙ্গে দেখা করব। ওয়াটসন, কথায় কথায় কিন্তু তুমি তোমার দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে আছ। স্যার হেনরীকে একা রেখে বাইরে রয়েছ অনেকক্ষণ।

সত্যিই তাই। উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু লোকটার এত সব কারসাজির মূল উদ্দেশ্যটা কি? কি চায় সে?

- একটাই উদ্দেশ্য। সে হল নরহত্যা। সুস্থ মাথায় পরিকল্পনামাফিক সুকৌশলে মানুষ খুন করার উদ্দেশ্যেই স্যার হেনরীর চারপাশে জাল বিস্তার করেছেন তিনি। আমার জাল গুটানোর কাজ আগেই শুরু হয়েছিল, তোমার

সহযোগিতায় তাকে এবারে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম।

আর দিন দুই তুমি স্যার হেনরীকে দুহাতে আগলে রাখ। এর মধ্যে যেন ষ্টেপলটন নতুন কোন আঘাত হানতে না পারে। তুমি অনেকক্ষন তাঁর কাছ ছাড়া-ও কি-

বীভৎস একটা আর্তচিৎকারে সহসা কেঁপে উঠল বাদার বাতাস।

লাফিয়ে উঠে দুজনেই গিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম।

নিঃসীম আতঙ্কের কলজে-ছেঁড়া ভয়াল আর্তনাদ এবারে যেন ফেটে পড়ল কানের গোড়ায়। ব্যাকুল ভাবে যেন একদিক থেকে আর একদিকে ছুটোছুটি করছে। নিস্তব্ধ রাতের বুক বিদীর্ন করা আর্তনাদের সঙ্গে এবারে কানে এল-অনুচ্চ গভীর গর গর শব্দ।

অন্ধকারে চোখ রেখে আর্তস্বরে বলে উঠল হোমস্-ওয়াটসন, হাউন্ড-শিগগির চলো। আর দেরি নয়-সর্বনাশ হতে চলেছে বোধহয়-

বলতে বলতে তীরবেগে জলার ওপর দিয়ে ছুটতে লাগল হোমস্। বুদ্ধশ্বাসে ছুটলাম আমিও।

সহসা আমাদের সামনেই এবড়োথেবড়ো পাথুরে জমির ওপরে আর্ত চিৎকারের শেষ করুণ রেশটুকু শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে ঝপাস করে একটা শব্দ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কান খাড়া করে রইলাম দুজনে।

না, বাতাস আবার শান্ত হয়ে গেছে-কোন সাড়াশব্দ পেলাম না।

-ওয়াটসন, সামান্যর জন্য হেরে গেলাম আমরা। হাত গুটিয়ে কয়েকটা ঘন্টা বসে থাকার কী করুণ পরিণতি ঘটল কে জানে, চল।

অনেকক্ষণ স্যার হেনরীকে ছেড়ে আছি-অনুতাপে অনুশোচনায় বুকের ভেতরটা দগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। অন্ধভাবে ছুটলাম আমরা।

কখনো গোলাকার পাথরের ওপর দিয়ে, কখনো পাশ কাটিয়ে-কাঁটাঝোপ মাড়িয়ে-দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছি।

উঁচু জায়গায় উঠে জলা থেকে কালো একটা চাপা গোঙানি ভেসে এল কানে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

বাঁদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নজরে পড়ল এবড়োথেবড়ো খোঁচা খোঁচা পাথুরে শিরার ওপর কালো একটা কি পড়ে রয়েছে। সেইদিকে লক্ষ্য করে বেগে নিচে নামতে লাগলাম।

কাছে গিয়ে যা দেখলাম তাতে শরীর যেন অবশ হয়ে এল।

হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা লোক। ঘাড়টা ভেঙ্গে গেছে-

মাথাটা দেহের নিচে-গোটা শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে দুমড়ে মুচড়ে রয়েছে।

বুঝতে পারলাম গোঙানির শব্দটা আর কিছুই নয়-মুমূর্ষুর কাতরানি। যতক্ষণ দেহে প্রাণ ছিল, শব্দটা ছিল।

এগিয়ে এসে নিথর দেহটার গায়ে হাত রেখেই ভীত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল হোমস্। ত্বরিৎ গতিতে দেশলাই জ্বালাল।

চাপ চাপ রক্ত লেগেছে হোমসের আঙ্গুলে। কঠিন পাথরের বুকে থক থক করছে রক্ত-আর দলা দলা মগজ।

পাথরের মুর্তির মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে দেশলাইর আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, হতভাগ্য স্যার হেনরী বাস্কারভিলের দেহ নিথর হয়ে আছে।

লালচে রঙের টুইড স্যুটটা পরনে। বেকার স্ট্রীটে এই স্যুট পরেই প্রথম দিন গিয়েছিলেন-তাই পরিস্কার মনে আছে। দেশলাইর আলোয় ক্ষনিকের জন্য হলেও পরিস্কার দেখতে পেলাম সেই বেশ।

অন্ধকারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে অব্যক্ত বেদনায় বলে উঠলাম, হোমস্ আমার জন্যই আজ প্রাণ হারাতে হ'ল স্যার চার্লসকে।

- তোমার চাইতে বড় অপরাধ আমার ওয়াটসন। কেসটাকে দ্রুত সমাধান করতে গিয়ে মক্কেলের দিকে অমনোযোগী হয়ে পড়েছিলাম। আমার কর্মজীবনের সবচাইতে বড় আঘাত। কিন্তু আমার সমস্ত বারন অগ্রাহ্য করে তিনি এভাবে জলায় বেরিয়ে পড়বেন ভাবতেই পারিনি।

- আর্তনাদ শুনে ছুটে এসেও কিছু করতে পারলাম না-এত দ্রুত ঘটনাটা ঘটে গেল। কিন্তু হাউন্ড পালাল কোথায়? ষ্টেপলটনও নিশ্চয় আশপাশে ঘাপটি মেরে রয়েছে।

দাঁতে দাঁত চেপে বলল হোমস্- যেখানেই থাকুক-আমি রেহাই দেব না তাকে। একজন খুন হলেন বীভৎস জানোয়ারটাকে দেখে-আর একজন তাড়া খেয়ে প্রাণ ভয়ে পালাতে গিয়ে ঘাড় ভেঙে মরলেন।

হাউন্ড তাড়া করে এনেছে প্রমাণ করতে হলে মানুষ আর জানোয়ারটার মধ্যে সম্পর্ক-সূত্রটা প্রমাণ করতে হবে। আমরা কেবল শুনেছি হাউন্ডের আওয়াজ, কিন্তু তা প্রমাণ করব কি করে? লোকটাকে এখুনি গেপ্তার করছি না কেন?

- সম্ভব নয়। অপরিসীম ধূর্ত লোকটা। নিজেকে ধরা ছোঁয়ার বাইরে রেখে চলেছে। যা জেনেছি তা দিয়ে কিছুই প্রমাণ করতে পারব না, ওয়াটসন। তবে দেরি করলে চলবে না, আগামী কালের মধ্যেই জাল

গুটোতে হবে।

বন্ধুর লাশের দিকে তাকিয়ে বুকের ভেতরটা কুঁকড়ে উঠছিল। বললাম, চল-লোকজন ডেকে আনা যাক।

হোমস্ মৃতদেহের ওপরে ঝুঁকে ছিল। ওঠাৎ পাগলের মত সোল্লাসে চিৎকার করে উঠে বাচ্চা ছেলের মত লাফাতে লাগল। লাফাতে আমার হাত মুচড়ে দিয়ে বলতে লাগল-দাড়ি-লোকটার দাড়ি আছে।

- দাড়ি?

- ওয়াটসন, ইনি আমাদের বন্ধু স্যার হেনরী নন। আমার প্রতিবেশী সেই পলাতক আসামী।

ক্ষিপ্তের মত ছুটে গিয়ে চিৎ করে দিলাম দেহটা। চাঁদের আলোয় পরিস্কার দেখা গেল রক্ত-চোয়ানো দাড়ির গুচ্ছ উঁচু হয়ে আছে-এই তো-কাল রাতে দেখা সেই চেহারা-কোটরপ্রবিষ্ট চোখ-ঠেলে বেরুনো কপাল, পলাতক সেলডন।

মূহুর্তের মধ্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মনে পড়ল, লন্ডন থেকে নতুন বেশভূষা আসায় স্যার হেনরী পুরনো পরিচ্ছদ দিয়ে দিয়েছিলেন ব্যারিমুরকে। পালানোর সুবিধার জন্য সে সেই পোশাক দিয়েছিল সেলডনকে, বুট, ক্যাপ-

বিধির বিধানে পাপের শাস্তি শেষ পর্যন্ত এভাবেই নেমে এল। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল।

হোমস্‌কে খুলে বললাম সব। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, তাহলে রহস্যটা এই। স্যার হেনরীর ব্যবহার করা কোন জিনিসের গন্ধ শুঁকিয়ে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল হাউন্ডটাকে।

এবারে পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা-হোটেল থেকে হারিয়ে যাওয়া পুরনো বুট জুতো দিয়েই ঘটানো হয়েছে ঘটনা। হাউন্ড সেই গন্ধ পেয়ে তাড়া করেছিল সেলডনকে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে বুঝল কি করে যে হাউন্ড তাড়া করেছে?

- কেন ডাক শুনে।

- ওর মত এমন দুর্দান্ত খুনী জলার বুকে একটা হাউন্ডের ডাক শুনে আর্তনাদ করে দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটবে-এ বিশ্বাস করা কঠিন।

আর্তনাদ শুনেই বুঝতে পেরেছে লোকটা, অনেক দূর থেকেই তাড়া খেয়ে এদিকে ছুটে এসেছিল। রহস্যটা খুবই গভীর ওয়াটসন।

- তাই যদি হয়, তাহলে কেবল রাতেই হাউন্ডটাকে ছেড়ে দেওয়া হয়

কেন? দিনের বেলা সেটা থাকে কোথায়? আমার তো মনে হচ্ছে-সকলেই যা বলে-

- যা বলে তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। আপাততঃ ওসব চিন্তা থাক-বডিটা কি করা যায় বল।

দুজনে পরামর্শ করে পাথরের কুটিরের মধ্যে মৃতদেহটা রেখে দেওয়াই স্থির করলাম। কিন্তু কাজটা করার আগেই আমাদের দুজনের দৃষ্টি আটকে গেল দূরে জলার বুকে।

- দেখ ওয়াটসন, লোকটার স্পর্ধা। চুরুটের ধোঁয়া উড়িয়ে এ দিকেই আসছে। ওয়াটসন, সাবধান, একদম যেন সন্দেহ করতে না পারে।

চাঁদের আলোয় প্রকৃতিবিদের আকৃতিটা পরিস্কার দেখা গেল। জ্বলন্ত চুরুটের লাল আভাও নজরে পড়ছে। দ্রুত হেঁটে এগিয়ে আসছেন। আমাদেরকে দেখতে পেয়েছেন মনে হল-কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। পরক্ষণেই এগিয়ে এলেন।

- ডক্টর ওয়াটসন যে, এত রাতে এই নির্জন বাদায়? একি-কি সর্বনাশ-কে জখ-ম-স্যার হেনরী মনে হচ্ছে?

আমাদের পাশ দিয়ে বেগে বেরিয়ে গিয়ে মৃতদেহের ওপর পড়লেন ষ্টেপলটন। চুরুট খসে পড়ল আঙুলের ফাঁক থেকে। তেমনি উপুর হয়ে থেকেই জড়িত স্বরে বললেন-এ-একে?

- প্রিন্সটাউন জেলের পলাতক আসামী সেলডন।

মুখভাব পরিস্কার দেখতে পেলাম না-কিন্তু কয়েক মুহূর্তে থমকে রইলেন স্টেপলটন। মনের আকস্মিক প্রতিক্রিয়া সামাল দিলেন অনেক কষ্টে বুঝতে পারলাম। ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন-কি সর্বনাশ-মারা গেল কিভাবে?

- এদিকেই তো আত্মগোপন করে ছিল,পা ফসকে পাহাড় থেকে পড়ে গেছে। বাদায় বেড়াচ্ছিলাম দুই বন্ধু-চিৎকার শুনে এসে দেখি-

- আমিও শুনতে পেয়েছিলাম চিৎকারটা। স্যার হেনরীর কথা ভেবে ছুটে না এসে পারলাম না।

- চিৎকার শুনেই স্যার হেনরীর কথা বিশেষভাবে মনে পড়ল আপনার? অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

- আপনার ওখানে যাবার কথা ছিল। বাদার বুকে বিকট আর্তনাদ শুনে ভয় হল উনিই কোন বিপদে পড়লেন কি না।

বলতে বলতে হোমস্‌ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আবার বললেন,-চাষীরা

বলাবলি করে প্রেত-কুকুর নাকি জলায় টহল দেয় রাত্রে। গভীর রাতে গর্জন শোনা যায়-তেমন কিছু কি শুনেছেন?

- সেরকম কিছু তো শুনতে পাইনি। বলল হোমস্ ।

- দুর্বল শরীরে পাহাড়ে পা ফসকে পড়েই তাহলে মারা গেল লোকটা, মি. হোমস্ বলেন?

- আমাকে চিনতে ভুল করেননি দেখছি।

- ডক্টর ওয়াটসন আসবার পর থেকেই আমরা প্রায় প্রতিদিনই আপনাকে আশা করছিলাম যে। এসেই এমন একটা মর্মন্তুদ ঘটনার সাক্ষী হতে হল?

- তাই তো দেখছি, আবার এই বিষন্ন করুণ স্মৃতি নিয়েই কাল ফিরে যেতে হবে।

- কালই ফিরবেন? স্যার চার্লসের মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন সূত্রের সন্ধান-

- কিছু না-তদন্ত করব তেমন ঘটনা কোথায়? কল্পকাহিনী আর কিংবদন্তীর তদন্ত কি করব?

হোমস্রে নির্লিপ্ত স্বর শুনে আমার দিকে ফিরলেন ষ্টেপলটন। বললেন, বোনটা অমন দৃশ্য দেখলে সহ্য করতে পারবে না। নইলে আমার বাড়িতেই লাশটা নিয়ে যেতাম। অবশ্য এই পাহাড়ে লাশের কোন ক্ষতি হবে না।

কথা না বাড়িয়ে তখনই ধরাধরি করে মৃতদেহটা পাথরের চাঙড়ের পাশে সরিয়ে রাখা হল।

মি. ষ্টেপলটন অনুরোধ জানালেন তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য। সবিনয়ে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে দুই বন্ধুতে বাস্কারভিল হলের দিকে রওনা হলাম।

সাত

নিস্তব্ধ রাতের বুকে হাওয়ার শনশন আর ঘাসের ওপর আমাদের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। চাঁদের অস্বচ্ছ আলোয় ঝাপসা চারদিক। দূরে আলোর রেখা। তার একটা নিশ্চয়ই মি. ষ্টিপলটনের বাড়ি। তার বাড়িতে এখনো আলো থাকাই স্বাভাবিক। গৃহস্বামী বাইরে।

- লড়াইটা এবারে মুখোমুখেই শুরু হল। যাকে মৃত দেখবে আশা করে এসেছিল-অন্য একজনকে দেখে কী আশ্চর্য দ্রুততায় সামলে নিল। লোকটা জাত ক্রিমিন্যাল। আমাকেও ঠিক চিনে ফেলেছে।

- এবার ষড়যন্ত্র কোন্ দিকে মোড় নেবে কে জানে?

- হয় আমাদের বোকা বানিয়েছে ভেবে অত্যধিক আত্মবিশ্বাসে কিছু একটা দুম করে বসবে, না হয় সতর্ক হবে।

- আজ রাতে গ্রেফতার করলেই তো হয়।

- সে উপায় কোথায়? তার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার মত কোন প্রমানই তো আমাদের হাতে নেই। স্যার চার্লসের মৃতদেহে কোন আঘাতের চিহ্ন ছিল না। হাউন্ডের ভয়ে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন প্রমাণ করবে কি করে?

আজকের ঘটনাও তাই। লোকটার মৃত্যুর সঙ্গে হাউন্ডের সরাসরি কোন সম্পর্ক প্রমাণ করা যাবে না। আমরাও ডাক শুনেছি-চোখে দেখিনি। লোকটাকে হাউন্ড তাড়া করেছিল-তেমন প্রমাণ কোথায়? এখনো পর্যন্ত মি. ষ্টেপলটন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ওয়াটসন, এমন শক্ত পাল্লায় আগে কখনো পড়িনি।

- তাহলে কি করবে ভেবেছো?

- উপায় নেই, কেস পাকা করার জন্য যে কোন ঝুঁকি নিয়ে আরো একটু অপেক্ষা করতে হবে। তবে মিসেস লরা লায়ন্স অনেকটাই সাহায্য করতে পারেন আমাদের। তাছাড়া দেখি আর একটু চিন্তা-ভাবনা করে কি

করা যায়।

আর কিছু বলল না হোমস্। ততক্ষনে আমরা বাস্কারভিল হলের কাছাকাছি এসে গেছি।

হোমস্ বলল, বাইরে থেকে আর কাজ নেই, ভেতরেই যাব চল। তবে হাউন্ড সম্পর্কে কোন কথা স্যার হেনরীকে বলবে না।

ষ্টেপলটন যে ভাবে আমাদের বিশ্বাস করাতে চেয়েছেন-সে ভাবেই বক্তব্য থাকবে আমাদের। আর একটা কথা ওয়াটসন, তোমার রিপোর্টে লিখেছিলে মনে আছে নিশ্চয়ই আগামীকাল বাড়িতে স্যার হেনরী এবং তোমাদের ডিনারের নিমন্ত্রন রয়েছে। কোন একটা অছিলায় তোমার যাওয়া হবে না নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে স্যার হেনরী একাই যাবেন।

হোমসকে দেখে খুবই খুশি হলেন স্যার হেনরী। ওঁকে যতটা জানানো দরকার খুলে বললাম।

ব্যারিমুরকে ডেকেও দুঃসংবাদটা জানাতে হল। ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে খুবই কান্নাকাটি করল মিসেস ব্যারিমুর।

স্যার হেনরী নিজেই জানালেন, ষ্টেপলটন খবর পাঠিয়েছিলেন বিকেলে ওদের ওখানে যাবার জন্য। কিন্তু একলা কোথাও বেরুবেন না বলে আমাদের কথা দিয়েছিলেন তাই আর যান নি। তবে ওর ধারণা, ষ্টেপলটনদের ওখানে গেলে সন্ধ্যাটা ভালই কাটত।

হোমস্ বলল, পরিস্থিতি খুবই জটিল। এমন জটপাকানো কঠিন কেস আগে আমার হাতে আসেনি।

- মি. হোমস্, ডক্টর ওয়াটসন নিশ্চয়ই আপনাকে বলেছেন, আমরা দুজনেই একদিন হাউন্ডের ডাক শূনেছি জলায়। কিংবদন্তীর ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়।

-কুকুরের ডাক চিনতে পারি-স্পষ্ট হাউন্ডের ডাক। একে কি করে কব্জা করবেন বুঝতে পারছি না।

- আপনার একটু সহযোগিতা পেলে ওই হাউন্ডের গলায় চেন পরানো খুব কষ্টকর হবে না।

- কি করতে হবে বলুন?

- বিশেষ কিছুই না, যা করতে বলব, প্রশ্ন না করে অনুসরণ করবেন।

বলতে বলতে থেমে গেল হোমস্। তাকিয়ে দেখি আমার কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনের দেওয়ালে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে তার দৃষ্টি। মুখে কোন রা নেই। মুহূর্তের মধ্যে যেন অন্য জগতে চলে গেছে, যেন প্রস্তরমূর্তি।

আমাদের দুজনের মুখ দিয়েই বিস্মিত জিজ্ঞাসা ধ্বনিত হল।

চোখ নামিয়ে সংযত কণ্ঠে হোমস্ বলল, দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখেছিলাম। চমৎকার-সত্যিই প্রশংসা করার মত।

পেছনের দেয়ালে সারি সারি প্রতিকৃতি ঝোলানো। সেদিকে তাকিয়ে হেনরী বললেন, ভাল লাগল আপনার প্রশংসা। সবই আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি।

হোমস্ বলল-অনেকগুলোই তো পরিচিত। নীল সিল্ক পরা ভদ্রমহিলা নেলার-পাশে মোটাসোটা ভদ্রলোক রেনল্ডস বলেই মনে হচ্ছে-নাম জানেন সকলের?

- ব্যারিমুরের কাছ থেকে জেনে নিয়েছি।

- মুখোমুখি ওই যে অশ্বরোহী সৈনিক-গায়ে কালো মখমল আর লেস-ইনি কে?

স্যার হেনরী স্মিত হেসে বললেন-বাস্কারভিল-হাউন্ডের অভিশাপ বংশধরদের কাঁধে চাপিয়ে গেছেন ইনিই-হউগো বাস্কারভিল।

ধীর শান্ত চোখে প্রতিকৃতি রেখে হোমস্ বলল, আশ্চর্য ভদ্রলোকের চেহারা, আপাতদৃষ্টিতে খুবই শান্ত বলে মনে হয়-কিন্তু চোখ দুটো ভয়ানক। মনে হয় শয়তান ওঁৎ পেতে রয়েছে।

রাতের আহার শেষ করতে করতে লক্ষ্য করলাম, বংশের প্রাচীন প্রতিকৃতিগুলো সম্পর্কে খুবই আগ্রহ নিয়ে কথা বলল হোমস্।

এক সময় বিদায় নিয়ে ঘরে চলে গেলেন স্যার হেনরী। আমরাও শোবার ঘরে ফিরে এলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঘরের মোমবাতি হাতে নিয়ে হোমস্ খাবার ঘরে এসে হাজির হল। হিউগো বাস্কারভিলে ছবিটার সামনে আলো তুলে ধরে বলল, খেয়াল করে দেখ ওয়াটসন- এরকম চেহারার কাউকে চেনা চেনা লাগছে কি?

পালক গোঁজা চওড়া-কিনারা টুপি পরা মুখটার দিকে তাকালাম, কানের পাশে কোঁকরানো চুল, সাদা লেসের কলার দিয়ে ঘেরা কঠিন একটি মুখ। দৃঢ় সংবদ্ধ কঠিন ঠোঁট-দুচোখের দৃষ্টি শীতল। ওরকম চেহারার দেখতে কাবুর কথা মনে পড়ল না। বললাম-চোয়ালটা যেন স্যার হেনরীর মত।

এবারে চেয়ার টেনে উঠে দাঁড়াল হোমস্। তারপর বাঁহাতে আলো ধরে হাত দিয়ে চাপা দিল টুপি আর কোঁকড়া চুল।

- একি-আশ্চর্য! এ যে ষ্টেপলটনের মুখ হুবহু -

হেসে হোমস্ বলল, তাহলে এবারে চিনতে পেরেছ! ছদ্মবেশের ভেতর থেকে আসল চেহারা বার করার জন্য ট্রেনিং দরকার ভায়া-অপরাধ

তদন্তকারীর এই গুণটি থাকতেই হবে।

- ষ্টেপলটনের ছবি বলে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে দেওয়া যায়।

- ভায়া, আত্মিক শারীরিক দোষগুণ নিয়ে পূর্ব পুরুষের ধারায় এভাবেই বংশধরদের জন্মাতে দেখা যায়। এসব জন্মান্তরবাদীদের বিশেষ গবেষণার বিষয়। এই প্রতিকৃতি থেকে আমি নিশ্চিত হতে পেরেছি-এই ষ্টেপলটন ভদ্রলোক বাস্কারভিল বংশেরই একজন কেউ।

- সেই কারণেই কি সম্পত্তি দখলের চক্রান্ত করছেন? কিন্তু তাহলে এভাবে কেন?

- সব রহস্যই আগামীকালের মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যাবে। ভদ্রলোক এখন আমার হাতের মুঠোয়। জাল গুটানোর অপেক্ষা মাত্র।

সকালে আমার ঘুম না ভাঙতেই হোমস্ উঠে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেলডনের মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে যাতে ব্যারিমুর দম্পতি বা স্যার হেনরীকে কোন ঝামেলা পোহাতে না হয় সে জন্য গ্রিমপেন থেকে প্রিন্সটাউনে টেলিগ্রাফ পাঠায়। তারপর তার পরম বিশ্বাসী বয় কার্টারাইটকে খবর পাঠাল। তা না হলে বেচারা তার প্রতীক্ষাতেই পাথরের কুটির আগলে বসে থাকত।

বন্ধুবর ফিরে এলে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে তিনজন একসঙ্গে বসলাম।

হোমস্ স্যার হেনরীকে বলল, আজ রাতে তো ষ্টেপলটনের বাড়িতে আপনার ডিনারের দাওয়াত। আমি এবং ওয়াটসন যেতে পারলে খুশিই হতাম। ওঁদের বুঝিয়ে বলবেন, বিশেষ কাজে আজই লণ্ডনে ফিরে যাওয়া বিশেষ জরুরী।

স্যার হেনরী খুবই হতাশ হলেন শুনে। বিমর্ষভাবে বললেন, বিষয়টি শেষ পর্যন্ত দেখে গেলে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম। আমার পক্ষে বাস্কারভিল হলে থাকাটা-

- দুর্ভাবনার কিছু নেই স্যার হেনরী। আমি নিজেই আপনাকে রেখে যাচ্ছি। তাছাড়া শিগ্‌গিরই আবার ফিরে আসব। তবে একটা কথা- আপনাকে যে ভাবে যা করতে বলে যাচ্ছি দয়া করে তার নড়চড় করবেন না। কখন যাবেন ঠিক করেছেন?

- ব্রেকফাস্টের পরেই রওনা হব।

আপনি ষ্টেপলটনদের বাড়িতে যাবার সময় গাড়ি নিয়ে যাবেন। পৌঁছেই গাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। হেঁটে বাড়ি ফিরবেন-এবং আপনার এই ইচ্ছেটা ওঁদের জানিয়ে দেবেন।

- কিন্তু মি. হোমস্, বাদার ওপর দিয়ে আসবার ব্যাপারে আপনি

আমাকে বহুবার নিষেধ করেছেন।

- হ্যাঁ, কিন্তু এখন আপনি নিরাপদে আসতে পারবেন। তবে সোজা রাস্তা ছেড়ে বাদার রাস্তায় ভুলেও পা বাড়াবেন না। মেরিপিট হাউস থেকে গ্রিমপেন রোড ধরে সোজা পথে বাড়ি ফিরবেন।

যথাসময়ে স্যার হেনরীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কুমবেট্রেসি ষ্টেশনে পৌঁছালাম। কার্টরাইট ষ্টেশনেই অপেক্ষা করছিল।

হোমস্ তাকে বলল, এই ট্রেনেই লন্ডন চলে যাও। পৌঁছেই আমার নামে স্যার হেনরীকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবে। বলবে, ভুল করে পকেট বইটা ফেলে এসেছি। উনি যেন রেজিষ্ট্রি ডাকে বইটি বেকার ষ্ট্রীটে পাঠিয়ে দেন। আর ফেরার পথে ষ্টেশন অফিসে খোঁজ নিয়ে আমার নামে কোন চিঠি এসেছে কিনা।

হোমসে্র কার্যকলাপের গতিবিধি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। যে সংকটপূর্ণ সময়ে আমাদের এখানে থাকা একান্ত দরকার-সে সময়েই আমাকে শুদ্ধ টেনে নিয়ে চলল লন্ডনে। তবে মাথায় যে কোন প্ল্যান ওর কাজ করছে সেটা পরিস্কার বুঝতে পারছি।

কার্টরাইট ষ্টেশন অফিস থেকে একটা টেলিগ্রাম নিয়ে ফিরে এল। হোমস্ পড়ে আমার হাতে দিল। টেলিগ্রামটা এরকমঃ টেলিগ্রাফ পেয়েছি-গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে পাঁচটা চল্লিশে পৌঁছব। - লেসট্রেড।

টেলিগ্রামটা পড়ে ওর পরিকল্পনাটা জলের মত পরিস্কার হয়ে গেল। সকালেই সরকারী গোয়েন্দা লেসট্রেডকে টেলিগ্রামে এখানে চলে আসাবার কথা জানিয়েছিল। এদিকে আবার আমরা যে সত্যিই লন্ডন ফিরে গেছি তা ব্যারনেটকে পাঠানো টেলিগ্রাম দিয়ে ষ্টেপলটনদের বিশ্বাস করাচ্ছে।

আসলে আমরা থেকেই যাচ্ছি। এবং যথাসময়ে যথাস্থানে সরকারী গোয়েন্দা সঙ্গে করে হাজির হব। চমৎকার। মনটা হাল্কা হয়ে গেল মুহূর্তে।

হোমস্ বলল-এবারে চল মিসেস লরা লায়ন্সের সঙ্গে সাক্ষাৎটা সেরে আসি।

আট

অফিসেই পাওয়া গেল মিসেস লায়ন্সকে। হোমস্ সোজাসুজিই কথা শুরু করল তার সঙ্গে।

বলল, ম্যাডাম, স্যার চার্লসের মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি। এ ব্যাপারে আমার বন্ধু ডক্টর ওয়াটসনকে আপনি যা বলেছেন তা আমি জানি-তবে বুঝতে পারছি আপনি কিছু চেপেও গেছেন।

- কোন কথা চেপে রাখিনি আমি। ঝিলিক খেলে গেল ভদ্রমহিলার চোখে।

- রেখেছেন। রাত দশটায় স্যার চার্লসকে গেটে আসতে বলেছিলেন, ঠিক সেই সময় সেই জায়গাতেই মারা গেছেন তিনি। এই দুটো ঘটনার মধ্যেকার যোগসূত্রটা চেপে গেছেন।

- যোগসূত্রটা নিতান্তই কাতালীয়।

- আমার বিশ্বাস কিন্তু অন্যরকম। আপনি না বললেও সেটা আমরা খুঁজে বার করবই। এবং এও আপনাকে খোলাখুলি জানিয়ে রাখছি-এটা একটা খুনের কেস। এখন পর্যন্ত সাক্ষ্য প্রমান যা পাওয়া গেছে তাতে আপনার বন্ধু ষ্টেপলটন এবং তার স্ত্রী নিঃসন্দেহে অপরাধী প্রতিপন্ন হবেন।

কথাটা শুনেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

- তার স্ত্রী? তিনি তো বিবাহিত নন!

- বোন বলে যাকে পরিচয় দিচ্ছেন, তিনি তাঁর স্ত্রী। এই দেখুন। পকেট থেকে একগাদা কাগজ টেনে বার করল হোমস্।

- চার বছর আগে ইয়র্কে তোলা হয়েছিল এই ফটো, স্বামী স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে- অবশ্য নাম লেখা রয়েছে মি. এবং মিসেস ভ্যানডেলর। দুজনকেই আপনি চিনতে পারবেন।

বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষীর লেখা তিনটি বিবরণও আমার কাছে রয়েছে। তখন ওঁরা সেন্ট অলিভার্স নামে একটা প্রাইভেট স্কুলে ছিলেন। এগুলো পড়ে দেখুন-ভদ্রলোককে সনাক্ত করতে অসুবিধা হয় কিনা।

ছবি দেখলেন মিসেস লায়ন্স। দ্রুত বিবরনগুলোতেও চোখ বোলালেন। উত্তেজনায় কাঁপছেন। আড়ষ্ট মুখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন-ভন্ড শয়তান! স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করলে আমাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিল। লোকটা যে জালিয়াত আগেই আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল।

স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমাকে হাতের যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করতে চেয়েছিল। ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ-শয়তান লোকটা তার কুকর্মের ফল ভোগ করুক। বলুন আমাকে কি করতে হবে, কিছু গোপন করব না আমি। স্যার চার্লসকে চিঠিটা লেখার সময়ে আমি কল্পনাও করতে পারিনি আমার সবচেয়ে উপকারী বন্ধুর সর্বনাশ করতে যাচ্ছি।

- ম্যাডাম, আমি বিশ্বাস করলাম আপনার কথা। ষড়যন্ত্রটা খুবই নিখুঁত ছিল সন্দেহ নেই।

- চিঠিটা ও বলে গিয়েছিল, আমি লিখে নিয়েছিলাম। বলেছিল, বিবাহ-বিচ্ছেদের মোকদ্দমার যা খরচ-চিঠি লিখলে সেটা স্যার চার্লসের কাছ থেকে পাওয়া যাবে।

- চিঠিটা পাঠানোর পরে উনিই তো আবার আপনাকে যেতে নিরস্ত করেছিলেন?

- হ্যাঁ, বলেছিল, আমাদের বিয়ের জন্য অন্য লোকের কাছে টাকা চাইতে তার সম্মানে বাঁধছে। আর বলেছিল-স্যার চার্লসের সঙ্গে এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যাপারে কেউ যেন জানতে না পারে।

- খবরের কাগজে মৃত্যু সংবাদটা আপনি দেখেছিলেন?

- না, ও-ই জানিয়েছিল। আমাকে ভয় দেখিয়ে বলেছিল, অত্যন্ত রহস্যজনক মৃত্যু, কোনভাবে চিঠির কথা জানতে পারলে পুলিশ আমাকেই সন্দেহ করবে। এখন বুঝতে পারছি, আমাকে সামনে রেখেই হত্যাকান্ডটা ঘটিয়েছে।

- আপনিও রক্ষা পেয়ে গেছেন ভাগ্যের জোরে। তার কুকর্মের একমাত্র সাক্ষী আপনিই, এটা তিনি জানতেন, তারপরেও. যে কোন কারণেই হোক মনোযোগটা সাময়িক আপনার দিক থেকে সরে গিয়েছিল বলে প্রাণে বেঁচে গেছেন। যাই হোক অনেক ধন্যবাদ, আজ উঠি, আবার দেখা হবে।

সোজা চলে এলাম আমরা ষ্টেশনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝমঝম শব্দে

এসে পৌঁছল লন্ডন এক্সপ্রেস।

প্রথম শ্রেণির একটা কামরা থেকে নেমে এসে আমাদের সঙ্গে সহাস্যে করমর্দন করলেন লেসট্রেড।

- এ দিককার খবর কি?

- খবর শুভ। বছরের সবচেয়ে বড় খবর আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। ঘণ্টা দুই পরেই কাজে নেমে পড়তে হবে। চলুন এই ফাঁকে ডিনারটা সেরে নেওয়া যাক।

একটার পর একটা কাজ করে যাচ্ছে হোমস্। সবই তার পরিকল্পনা মাফিক। কিন্তু পাশাপাশি থেকেও কিছু জানতে পারছি না আগে থেকে। অন্ধের মত কেবল তাকে অনুসরণ করে যেতে হচ্ছে।

এক অদ্ভুত স্বভাব শার্লক হোমস্‌ের। পরিকল্পনা সম্পূর্ণ সফল না হওয়া পর্যন্ত বিন্দুমাত্র আভাস তার কাছ থেকে পাবার উপায় নেই।

ভেতরটা উৎকণ্ঠায় ছটফট করতে থাকলেও ওর স্বভাবের কথা ভেবে চুপ করে থাকতে হয়।

হোটেল থেকে বেরিয়ে দু-চাকার খোলা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া হল। বাস্কারভিল হলের ইউ-বীথির গেটে গাড়ি ছেড়ে দেওয়া হল। তারপর আমরা চললাম মেরিপিট হাউসের দিকে।

গ্রীমপেন মায়ারের ওপর কুয়াশা ক্রমশঃ ঘন হতে শুরু করেছে। দূরের পাহাড়ের আভাস এখনো অদৃশ্য হয়ে যায়নি। তার মধ্যেই মেরিপিট হাউসের আলোটা চোখে পড়ল।

চলতে চলতে হোমস্ বলল-ওখানেই আমাদের যাত্রার শেষ। এবারে প্রস্তুতি নিন। সশস্ত্র হয়ে এসেছেন কিনা, মি. লেসট্রেড, নিশ্চয়ই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না। এখন থেকে যথাসম্ভব পা টিপে হাঁটতে হবে আমাদের-কথা একদম জোরে নয়।

মেরিপিট হাউসের শ দুই গজ আগেই হোমস্ দাড় করিয়ে দিল আমাদের।

গোলাকৃতি কয়েকটি পাথরের আড়ালে দাঁড়ালাম আমরা। সামনের বাড়িটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে।

হোমস্ সেদিকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, ওয়াটসন, তুমি তো আগে বাড়ির ভেতর ঢুকেছিল-জানালায় আলো ঝলমল করছে-ওটা কিসের ঘর?

চিনতে পারলাম খাবার ঘরে আলো জ্বলছে। খড়খড়ি তোলা। হোমস্‌ের

নির্দেশে ঘরের ভেতরের দৃশ্যটা দেখবার জন্য পা টিপে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম।

পাঁচিল ঘেরা পুরো বাড়িটা। নিঃশব্দে এগিয়ে এসে পাঁচিলের পাশ দিয়ে একটা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। এখানে থেকে পর্দাহীন জানালার মধ্য দিয়ে সোজাসুজি ভেতরের দৃশ্য দেখা যায়।

গোল টেবিলের পাশে বসে ষ্টেপলটন আর স্যার হেনরী। টেবিলে রয়েছে কফি আর মদের বোতল। ষ্টেপলটন উৎসাহের সঙ্গে বকবক করে চলেছেন।

হঠাৎ কথা বন্ধ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। স্যার হেনরী চেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট টানতে লাগলেন।

আমি যে পাঁচিলের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছি তার অন্য পাশে কাঁকরের ওপরে বুট জুতোর আওয়াজ উঠল। সন্তর্পণে মুখ তুলে দেখলাম, বাগানের কোণে একটা আউট হাউসের দরজার সামনে থমকে দাঁড়ালেন ষ্টেপলটন।

চাবি দিয়ে তালা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা খড়মড় আওয়াজ শোনা গেল ঘরের ভেতরে।

মিনিট খানিক পরে ভেতরে থেকে বেরিয়ে এসে তালা বন্ধ করলেন ষ্টেপলটন। তারপর আমার সামনে দিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। চেয়ারে বসে আবার আগের মত কথা জুড়ে দিলেন অতিথির সঙ্গে।

এতক্ষণের মধ্যে মিসেস ষ্টেপলটনকে কোথাও দেখতে পেলাম না। অতিথির সামনে তার অনুপস্থিত থাকবার কোন কারণ বোঝা গেল না।

ফিরে এসে সঙ্গীদের সব জানালাম। ভদ্রমহিলা ঘরে নেই শুনে হোমস্‌ের মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল।

ইতিমধ্যে আকাশে জমে থাকা কুয়াশার স্তর ক্রমশ নিচে নেমে আসছিল। আচ্ছাদিত হচ্ছে গ্রিমপেন জলাভূমি। সেদিকে তাকিয়ে শঙ্কিত গলায় হোমস্ বলল-সর্বনাশ, ওয়াটসন দেখ, স্যার হেনরীর বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে-এদিকে কুয়াশা রাস্তা ঢেকে ফেলছে। এখনই না বেরুলে, ওঁর প্রাণ বাঁচাতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।

আমরা উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছি সামনের মেরিপিট হাউসের দিকে। আলোর চওড়া রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে জানালা থেকে।

কুয়াশাপ্রাচীর ক্রমশই এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। কিছুক্ষনের মধ্যেই ঢাকা পড়ে যাবে সামনের দৃশ্য। বাদার অর্ধেক চাপা পড়ে গেছে পশমের

মত কুয়াশার প্রাচীরে।

অস্থির হয়ে উঠল হোমস্। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল-আর মিনিট পনেরোর মধ্যে না বেরুলে রাস্তা ঢেকে যাবে-কিছুই দেখা যাবে না চোখে। চল আমরা পেছিয়ে গিয়ে একটা উঁচু জমিতে দাঁড়াই

হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুটা দূরে চলে এলাম আমরা। গাঢ় কুয়াশার কিনারা চাঁদের আলোয় রূপোর মত ঝকঝকে করছে। ক্রমশই এগিয়ে আসছে যেন শ্বেত সমুদ্র।

আধমাইল মত দূরে এসে থামলাম আমরা। হোমস্ বলল, আর নয় আমাদের কাছে আসার আগেই স্যার হেনরীর নাগাল ধরে ফেলুক এটা হতে দেয়া যায় না। এখানেই অপেক্ষা করব আমরা।

বলতে বলতে হোমস্ হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল। তারপর জমিতে কান পেতে বলে উঠল-তৈরী হও, উনি আসছেন।

পাথরের আড়ালে গুঁড়ি মেরে বসে পড়লাম আমরা। কিছুক্ষণ পরেই দ্রুত পায়ে চলার শব্দ পাওয়া গেল।

নিস্তব্ধ বাদার বুকে কাঁপন জাগিয়ে পদশব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল। একটু পরেই স্যার হেনরীর পরিচিত মূর্তি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

চারপাশে দেখলেন একবার ঘাড় ঘুরিয়ে। দ্রুত এগিয়ে এসে আমাদের খুব কাছে দিয়ে পেছনের দীর্ঘ ঢাল বেয়ে উঠতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে থেকে থেকে পেছনে ফিরে দেখছেন।

- সামনে তাকাও-পেছনে সে আসছে।

বলতে বলতে পিস্তলের ঘোড়া তুলল হোমস্।

কানে ভেসে এল একটা একটানা মচমচ খসখস শব্দ।

ঘন কুয়াশার স্তর এসে গেছে খুব কাছাকাছি, আতঙ্কবিস্ফোরিত চোখে সেদিকে তাকিয়ে আছি তিনজনে।

আচম্বিতে যেন কুয়াশা ভেদ করে বেরিয়ে এল এক শরীরী বিভীষিকা-জ্বলন্ত আগুন ঠিকরনো দুটি চোখ-

বিস্ফোরিত বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। বিকট গলায় ভয়ার্ত চিৎকার ছেড়ে লেসট্রেড মাটিতে উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল।

ঘন কুয়াশার পটভুমিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সামনে কয়লাকালো অতিকায় এক হাউন্ডের চেহারা। নিঃসন্দেহে হাউন্ড-কিন্তু আমাদের পরিচিত জগতের হাউন্ড এ নয়।

গলগল করে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে খোলা মুখবিবর থেকে, লকলকে অগ্নিশিখায় নাক মুখ ঘাড় প্রকট হয়ে উঠেছে, সে এক নারকীয় মূর্তি।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঢাল বেয়ে আসছে-স্যার হেনরী খানিক আগে যে পথে গেছেন, পদক্ষেপ অনুসরণ করে চলতে লাগল সেই পথে।

ক্ষনিকের জন্য যেন আমাদেরকে অসাড় করে দিয়েছিল এই প্রেতমূর্তি।

সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাওযার পর সম্বিৎ ফিরল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার আর হোমস্রে পিস্তল গর্জে উঠল-যুগপৎ।

বিকট প্রাণ কাঁপানো শব্দে গর্জে উঠল প্রাণীটা। দীর্ঘ টানা আর্তনাদে কঁকিয়ে উঠল জলার শব্দহীন বাতাস।

গুলি খেয়েও থামল না সেই জ্যান্ত বিভীষিকা। চোখের পলকে লাফ মেরে এগিয়ে গেল সামনে।

লাফ দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছি আমরাও। চাঁদের আলোয় নজরে পড়ল দূরে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন স্যার হেনরী। ভয়ার্ত মুখাবয়ব-দুহাত তুলে অসহায় ভাবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

উর্ধশ্বাসে ছুটলাম দুজনে। কিন্তু ছুটতে ছুটতেই কানে এল স্যার হেনরীর প্রানান্তকর আর্তনাদ আর হাউন্ডের গুরুগম্ভীর গলার ক্রুদ্ধ গর্জন।

চোখে পড়ল, শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাউন্ড মাটিতে আছড়ে ফেলেছে-

মুহূর্তের মধ্যে গর্জে উঠল হোমস্রে হাতের পিস্তল। পরপর পাঁচটা গুলি জানোয়ারটার দেহে বিদ্ধ হল।

যন্ত্রণাবিকৃত আর্তনাদে আকাশ কাঁপিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল দানব-কুকুর। সেই অবস্থাতেই প্রচন্ড আক্রোশে কটাস কটাস শব্দে শূন্যে কামড় বসিয়ে দিল।

পরক্ষণেই মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে নিথর হয়ে গেল দেহ।

কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে-মাথায় চেপে ধরলাম পিস্তল। কিন্তু গুলি করার দরকার হল না। ততক্ষনে প্রাণ ছেড়ে গেছে দানব-হাউন্ডের।

স্যার হেনরী খানিক তফাতে জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলেন। দৌড়ে গিয়ে টান মেরে কলার খুলে ফেলল হোমস্।

কম্পিত শান্ত স্বরে বলে উঠল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ-গলায় দাঁত বসাতে পারেনি। আমরা ওকে জীবন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছি তাকে।

লেসট্রেড ব্রান্ডির ফ্লাস্ক খুলে ব্যারনেটের মুখে গুঁজে ধরল। কিছুক্ষণের

মধ্যে ভয়ার্ত চোখ মেলে তিনি তাকালেন আমাদের দিকে। তারপর চাপাস্বরে বললেন-মি. হোমস্, কি ওটা?

- বাস্কারভিল পরিবারের অভিশাপ-প্রেত কুকুর-চিরতরে শুইয়ে দিয়েছি-আর কখনো তার আবির্ভাব হবে না।

আমাদের সামনেই পড়ে আছে ভয়ঙ্কর প্রাণীটা। একটা সিংহীর মতই বিরাট আকৃতি। মৃত্যুর পরেও তার ভয়াবহতা প্রকট।

উন্মুক্ত চোয়াল চুঁইয়ে পড়ছে নীলচে আগুন। কোটরে গাঁথা ক্রূর চোখ ঘিরে আগুনের বলয় যেন লকলকে করছে।

জানোয়ারের জ্বলন্ত নাক মুখে হাত বুলিয়ে চমকে উঠলাম-আমার আঙ্গুলেও দপদপ জ্বলছে উত্তাপহীন আগুন।

হোমস্ের দিকে ফিরে বললাম-ফসফরাস।

হোমস্ বলল-কেবল ফসফরাস নয় ফসফরাস দিয়ে তৈরী একট মলম। গন্ধহীন। গন্ধ শুঁকে শিকারের পেছনে ধাওয়া করতে তাই কোন অসুবিধা হয় না। স্যার হেনরী, এরকম একটা ভয়ঙ্কর প্রাণীর জন্য আমরা তৈরী ছিলাম না। আমরা দুঃখিত। আপনাকে এভাবে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্য ক্ষমা করবেন।

- মি. হোমস্ আমার জীবন রক্ষা করেছেন আপনারা। এর বেশি আর কি বলব।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন স্যার হেনরী। তবে এখনো হাত পা কাঁপছে ঠকঠক করে। ধরাধরি করে তাকে একটা পাথরের ওপরে বসিয়ে দিলাম।

হোমস্ বলল বিপদের ভয় আর নেই, তবে লোকটাকে ধরা দরকার। আপনাকে এখন এখানেই ছেড়ে যাব আমরা। এখন প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান।

কোন কথা না বলে দু'হাতে মুখ গুঁজে বসে রইলেন হেনরী। আমরা দ্রুত পায়ে এগুতে লাগলাম।

চলতে চলতে হোমস্ বলল-এতক্ষণে নিশ্চয় পালিয়েছেন ভদ্রলোক। গুলির আওয়াজ শুনেই বুঝতে পেরেছেন তার খেলা শেষ হয়েছে গোটা বাড়িটা তল্লাশ করা দরকার।

হাট করে খোলা দরজার ভেতর দিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম। করিডরে দাঁড়িয়ে এক বৃদ্ধ ভৃত্য।

খাবার ঘর ছাড়া কোন ঘরে আলো নেই। ঘরের কোণ থেকে ল্যাম্পটা তুলে নিয়ে সবকটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল হোমস্।

কিন্তু কোথাও প্রকৃতিবিদকে পাওয়া গেল না।

ওপরে গিয়ে দেখলাম শোবার ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে। লেসট্রেড দরজায় কান পেতেই চেঁচিয়ে উঠলেন-ঘরে লোক আছে, নড়াচড়ার শব্দ পাচ্ছি। একটা গোঙ্গানির শব্দ আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে পায়ের চেটো দিয়ে তালার ওপর সজোরে লাথি হাঁকিয়ে দরজা খুলে ফেলল হোমস্। উদ্যত পিস্তল হাতে তিন জনই ঢুকলাম ঘরে। কিন্তু এখানেও নেই কেউ।

মিউজিয়মের মত করে সাজানো ঘরটা। সারি সারি কাচের আধারে প্রজাপতি আর মথের সংগ্রহ।

ঘরের মাঝ বরাবর খুঁটির সঙ্গে পুঁটলির মত করে কাপড় জড়িয়ে বাঁধা একটা মূর্তি। মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে হোমস্ বাঁধন খুলে দিল।

চমকে উঠলাম মূর্তির মুখ দেখে। এমন দৃশ্য আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। মিসেস ষ্টেপলটন। বুকের ওপর মাথা ঝুলে পড়েছে-ঘাড়ে পিঠে কশাঘাতের দগদগে লাল দাগ।

- লেসট্রেড, ব্রান্ডি আগুন। উৎপীড়নে আর ক্লান্তিতে সংজ্ঞা হারিয়েছেন মহিলা।

আমাদের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখ মেলে তাকালেন মিসেস ষ্টেপলটন প্রথমেই বললেন, স্যার হেনরী-উনি ঠিক আছেন তো?

- হ্যাঁ -

- আর-হাউন্ড -

- নেই-মারা গেছে।

ভদ্রমহিলা যেন পরিপূর্ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

- নরপিশাচ-দেখুন আমার কি অবস্থা করেছেন। দিনের পর দিন কেবল অত্যাচার উৎপীড়ন আর ধাপ্পা। ভালবাসা পেলাম না কখনো। তবু আশা নিয়ে বসে ছিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানলাম-লোকটার সব আশ্বাসই ধাপ্পা-তার কাছে আমি উদ্দেশ্য সিদ্ধির টোপ মাত্র। বলতে বলতে আকুলভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

হোমস্ এগিয়ে এসে বলল, ম্যাডাম, মিথ্যা আশায় শয়তানের দুস্কর্মের সহযোগিতা যদি কখনো করে থাকেন-এই তার প্রায়শ্চিত্তের সময়। বলুন, কোথায় গেলে তাকে পাওয়া যাবে?

কান্নারুদ্ধ কণ্ঠে মিসেস ষ্টেপলটন বললেন, এই সময়ে একটা জায়গাতেই সে যেতে পারে। জলার মাঝ বরাবর পাঁকঘেরা একটা দ্বীপ

আছে, সেই দ্বীপে একটা টিনের পুরনো খনি। হাউন্ডটাকে রাখত সেখানে। পালিয়ে সেখানেই গেছে সে।

জানালার ওপাশেই দুলছে সাদা কুয়াশার প্রাচীর। সেদিকে হাতের ল্যাম্প উঁচু করে ধরে হোমস্ বলল, দেখছেন বাইরের অবস্থা। এ অবস্থায় রাতে গ্রিমপেনের পাঁকে কারুর পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়।

- খুঁজে খুঁজে ঠিক যেতে পারবেন-বললেন মিসেস ষ্টেপলটন, কর্দম-ভূমির মাঝ দিয়ে পথ চিনে যাবার জন্য ও আর আমি সরু লম্বা কাঠি পুঁতে দিয়েছিলাম। তবে আজকের রাতে সেই কাঠিগুলো দেখতে পাবেন না।

কুয়াশা সরে না যাওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়, বুঝতে পারলাম। লেসট্রেডকে বাড়ি পাহারায় রেখে আমি আর হোমস্ স্যার হেনরীকে নিয়ে বাস্কারভিল হলে ফিরে এলাম।

অত্যাধিক মানসিক চাপে স্নায়ু বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল ব্যারনেটের। শেষ রাতের দিকে প্রবল জ্বরের ঘোরে আবোল তাবোল বকতে লাগলেন। ডক্টর মার্টিমারকে খবর দেওয়া হল। তিনি এসে চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন।

সকাল হতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মিসেস ষ্টেপলটন আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন-জলাভুমির মাঝে পাঁকে দ্বীপের দিকে।

বাদার দিক থেকে ক্রমশ সরু হয়ে একটা জমি নেমে গেছে কর্দম-রাজ্যের মধ্যে।

পচা উদ্ভিদে প্যাচপেচে শক্ত মাটি যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে কতগুলো সরু লম্বা কাঠি এদিক সেদিক সারি দিয়ে বসানো কাদার মধ্যে।

অর্থাৎ পচা আগাছা আর নোংরা দুর্গন্ধ প্যাঁকের মধ্য দিয়ে আমাদের এগুবার পথ।

চলতে গিয়ে বারবার উরু পর্যন্ত ঢুকে যাচ্ছে-পায়ের তলায় কেঁপে কেঁপে উঠছে কাদার স্তর। এ যেন এক জীবন্ত নরক-পথ। পা টেনে টেনে ধরছে এঁটেল কাদা-পচপচ শব্দে উঠছে দুর্গন্ধযুক্ত পচা গ্যাস।

সামনেই কাদার মধ্য থেকে তুলো ঘাসের একটা পটির গায়ে কালো মতন কি একটা ঠেকে রয়েছে। পথ থেকে সরে গিয়ে বস্তুটা ধরতে বিপদ ঘটালো হোমস্।

কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল তার। সঙ্গে সঙ্গে আমরা টেনে না ধরলে নির্ঘাৎ তলিয়ে যেত। ওই অবস্থাতেই হাত বাড়িয়ে একটা পুরানো বুট জুতো তুলে আনল।

ভেতরের চামড়ায় ছাপ রয়েছে-মেসার্স টরোন্টো।

নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বলল হোমস্-এই সেই হারানো বুট-স্যার

হেনরীর।

- এখানে এলো কি করে?। পালানোর সময় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছেন মনে হচ্ছে?

- ঠিক ধরেছো। হাউন্ড লেলিয়ে দেবার জন্য শুঁকিয়েছিলেন এটা। সেই থেকে হাতেই ধরা ছিল-হয়তো পেছন পেছন এগুচ্ছিলেনও-কিন্তু গুলির শব্দ শোনার পর হাতে নিয়েই উদভ্রান্ত হয়ে ছুটতে আরম্ভ করেন। এ পর্যন্ত নিরাপদে এসেছিলেন বোঝা যাচ্ছে-এখানে এসে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

স্থির হয়ে দু'দন্ড দাঁড়াবার উপায় নেই কোথাও। ভুর ভুর করে কাদা উঠছে-পা নেমে যাচ্ছে নিচে। এরই মধ্যে অবর্ণনীয় কষ্টে এক সময় কাদার রাজ্যে পার হয়ে শক্ত জমিতে পা দিতে পারলাম আমরা

কাদার ওপর পায়ের ছাপ মিলিয়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে। মি. ষ্টেপলটন কোন্ পথে কিভাবে এগিয়েছেন বুঝবার উপায় ছিল না।

কেবল পুরানো বুট জুতোর পাটিই সাক্ষ্য দিল তিনি এ পথে এসেছিলেন। শেষ পর্যন্ত দ্বীপের ঘরে পৌঁছাতে পেরেছেন-একথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমরা।

কুয়াশা ঢাকা রাতে-গ্রিমপেনের এই বীভৎস কর্দমভূমিই হয়তো তাকে টেনে নিয়েছে মাটির তলায়। নিষ্ঠুর, ষড়যন্ত্র কুটিল মানুষটির চির সমাধি হয়তো ঘটেছে-এখানেই নিঃশব্দে।

বিস্তীর্ণ কর্দমভূমি বেষ্টিত দ্বীপে পা দিয়েই হিংস্র ভয়াবহ শ্বাপদটিকে লুকিয়ে রাখার অনেক চিহ্নই পাওয়া গেল।

প্রকান্ড একটা চাকাকল পড়ে রয়েছে মাটিতে। পাশেই আবর্জনায় বোঝাই একটা পাতাল-কূপ-পরিত্যক্ত টিনের খনির শেষ স্বাক্ষর।

খানিকটা তফাতে শ্রমিকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত কুটিরের চিহ্ন।

একটা ভেঙ্গেপড়া কুটিরের দেয়ালে একটা আংটা দুমাথা গেঁথে বসানো। আংটা থেকে ঝুলছে একটা শেকল।

আশেপাশে ছড়িয়ে রয়েছে চিবিয়ে গুঁড়ো করা কিছু হাড়। জানোয়ারটাকে বেঁধে রাখার জায়গা এটাই বোঝা গেল।

পাশেই জঞ্জালের মধ্যে পড়ে আছে একটা পশুর কংকাল। কংকালের পায়ে কয়েক গোছা বাদামী লোম এখনো লেগে রয়েছে।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে হোমস্ বলে উঠল-এ যে কোঁকড়া চুলের কুকুরের কংকাল! স্প্যানিয়েলটা নিশ্চয়-ডক্টর মার্টিমারের হারিয়ে যাওয়া প্রিয় পোষা কুকুরটা। নাও, ফেরো এবারে-এখানে দেখবার আর কিছুই

নেই।

নোংরা গন্ধের জন্য দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছিল। একপাশে সরে এসে হোমস্ বলল্, ষ্টেপলটন হাউন্ডটাকে এখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু জানোয়ারটার হাঁকডাক চেপে রাখতে পারেন নি। তাই রাত বিলেতে-দিন দুপুরে অমন রক্ত-হিম-করা ডাক শোনা যেত জলার বুকে।

চরম ঘটনা ঘটাবার আগে বাগানের আউট হাউসে সাবধানে নিয়ে গিয়ে তুলতেন। এই তো-এইতো সেই মলমের টিনের কৌটো-শেকল ছাড়বার আগে জন্তুটার গায়ে লেপ্টে লাগিয়ে দিতেন।

ফন্দিটা ভালই খেলিয়েছিলেন বলতে হবে। কল্পনার প্রেত কুকুরকে জ্যান্ত অবস্থায় নামিয়ে এনেছিলেন। অমন মুখ চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুনো একটা প্রাণীকে অন্ধকারে চোখের সামনে দেখলে অতি বড় সাহসীরও দাঁতকপাটি লেগে যাবার কথা।

স্যার চার্লস দৌড়েছিলেন, অমন দুর্ধর্ষ খুনে কয়েদী সেলডন, সেও ভয়ে দৌড়েছিল-স্যার হেনরীও প্রাণভয়ে আর্তনাদ করে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন।

চাষীদের মধ্যে অনেকেই দেখেছে প্রাণীটাকে-কিংবদন্তীর গুজবটা তাতে আরো পোক্ত হয়েছে-খোঁজখবর নেবার কথা কারুর মাথায় আসেনি।

হাউন্ডের ভয়ে ভয় দেখিয়ে প্রমাণহীন ভাবে মানুষ খুন করার নিখুঁত নিটোল পরিকল্পনা। ওয়াটসন, অমন ধুরন্ধর বন্ধুটি শেষপর্যন্ত এই জলার মাটিতেই কর্দমশয়নে একাকী পড়ে রইলেন। তবে জয় আমাদেরই হল। রহস্যের তলা পর্যন্ত পৌছতে পেরেছি আমরা।

নয়

অভিশপ্ত বাস্কারভিল পরিবারের অভিশাপ, ভয় ও বিভীষিকা চিরতরে দূর হয়েছে। স্যার হেনরী শারীরিক সুস্থতা ফিরে পেলেও মানসিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ডক্টর মার্টিমারকে সঙ্গে নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরুতে হয়েছিল তাকে।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে এখন তিনি সুস্থ দেহে ও সুস্থ মনে ফিরে এসে বাস্কারভিল হলেই বাস করছেন।

বাস্কারভিল কুকুর-রহস্যের অনেক ঘটনাই আমার জানার বাকি ছিল-যা ছিল বন্ধুবর হোমস্‌ের নিজস্ব তদন্তের ফলাফল।

লন্ডনে ফিরে এসে একদিনে প্রসঙ্গক্রমে তার মুখ থেকে সব শুনলাম।

হোমস্‌ের তদন্তের ফলাফল নিঃসন্দেহে খুবই চমকপ্রদ ।

তার মুখের বিবরণই হুবহু তুলে দিচ্ছি এখানে।

হোমস্ বলেছিল-বাস্কারভিল পরিবারেরই একজন যে ষ্টেপলটন নামের ছদ্ম পরিচয়ে ভয়ঙ্কর চক্রান্তের জাল বিস্তার করেছে, গোড়ার দিকে তা ধরতে পারিনি।

ঘটনাগুলো আংশিকভাবে আমাদের গোচরে আসছিল। তাই খুবই জটিল বলে মনে হয়েছিল কেসটা। পরে মিসেস ষ্টেপলটনের সঙ্গে দুবার কথা বলার সুযোগ হয়েছিল আমার। তার পর সব কুয়াশাই কেটে গিয়েছিল সামনে থেকে।

পারিবারিক প্রতিকৃতি আমাকে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ করেছিল।

স্যার হেনরী বাস্কারভিল লন্ডন থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন কুখ্যাতি মাথায় নিয়ে। তিনি ছিলেন স্যার চার্লসের ছোট ভাই।

প্রবাসে গেলেও পরিবারের বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে একটা ভাবনা তার মাথায় নিশ্চয়ই ছিল। শোনা যায় অবিবাহিত অবস্থায় তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় মারা যান।

আসল ঘটনা কিন্তু তা নয়-তিনি বিয়ে করেছিলেন-একটি ছেলেও হয়েছিল তার। ষ্টেপলটন পরিচয়ের লোকটিই সেই ছেলে-আসল নাম বাপের নামে।

কোষ্টারিকার বিখ্যাত সুন্দরী বেরিল গারসিয়াকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। বিয়ের পর অনেক টাকাকড়ি আত্মসাৎ করে বৌকে নিয়ে পালিয়ে চলে আসেন ইংল্যান্ডে। নাম পাল্টে তখন তিনি মি. ভ্যানভেলর।

ফেরার পথে ফ্রেজার নামে ক্ষয় রোগাক্রান্ত একজণ প্রবীণ শিক্ষকের সঙ্গে তার আলাপ হয়। ভদ্রলোকের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ইয়র্কশায়ারের পূর্বে স্কুল ব্যবসায় নেমে পড়েন এবং যথেষ্ট উন্নতিও করেন।

কিন্তু সেই ফ্রেজার ভদ্রলোক মারা যাবার পরে ধীরে ধীরে স্কুল সুনাম হারিয়ে কুখ্যাতি অর্জন করে। শেষপর্যন্ত ভ্যানভেলর দম্পতি ষ্টেপলটন নাম নিয়ে স্কুলের টাকা-পয়সা পকেটস্থ করে পালিয়ে চলে আসেন দক্ষিণ ইংল্যান্ডে।

ভদ্রলোক বারবার নাম বদল করলেও একটা বিষয় পাল্টাতে পারেন নি। সেটা হল কীটবিদ্যার সখ। এই সূত্র ধরেই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে খোঁজখবর নেই। জানতে পারি-এক্ষেত্রে তিনি একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ।

ইয়র্কশায়ারে থাকার সময়েই বিশেষ একটা মথ পোকাকে তিনি বিজ্ঞানের গবেষণার আওতায় আনেন। পরে ভ্যানভেলর নামকরণ হয়েছে পোকাটার।

অভিশপ্ত বাস্কারভিল পরিবারের ভূসম্পত্তির খোঁজখবর যে তিনি রাখতেন তাতে সন্দেহ নেই।

তিনি ইতিমধ্যেই সন্ধান নিয়ে জেনেছিলেন বিশাল এই জমিদারির মালিক হওয়ার অন্তরায় দু'জন ব্যক্তি। সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে, স্যার চার্লস বাস্কারভিল হলে অবসর জীবন যাপন করতে আসার কিছুদিন পরেই ডেভনশায়ারে উপস্থিত হন।

জমিদারিটাই ছিল লক্ষ্য । এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে কোন ঝুঁকি নিতেই তিনি মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন।

স্ত্রীকেও যন্ত্র হিসাবে কাজে লাগানোর নিখুঁত একটা পরিকল্পনা করে নিয়েছিলেন। এবং প্রতিবেশীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির জন্য পূর্বপুরুষদের ভিটের কাছাকাছিই আস্তানা নিলেন ভদ্রলোক। স্ত্রীর পরিচয় দিলেন বোন বলে।

নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে কিছুদিন মেলামেশার পরে স্যার চার্লসই তাকে পারিবারিক অভিশাপ পিশাচ-হাউন্ডের গল্প শোনান।

এই ঘটনা শোনবার পরই উর্বর মস্তিস্ক ষ্টেপলটন পাকাপোক্তভাবে এটা পরিকল্পনা ছকে ফেলেন। কিংবদন্তীর হাউন্ডকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিলেন।

লন্ডনের ফুলহ্যাম রোডের রস অ্যান্ড ম্যাঙ্গলস-এর দোকান থেকে সবচাইতে শাক্তশালী ও হিংস্র কুকুরটাকে নিয়ে যান তিনি। খুবই, গোপনে প্রানীটাকে বাড়িতে এনে তুলেছিলেন- কাক- পক্ষীতেও জানতে পারেনি।

অথবা এও হতে পারে-একটা হাউন্ড আমদানির প্ল্যানটা মাথায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই আগে থেকেই গ্রিমপেন কর্দম-ভূমির মাঝে কুকুরের জন্য একটা নিরাপদ আস্তানার সন্ধান বার করে ফেলেছিলেন।

কীটপতঙ্গ খুঁজতে দিন দুপুরে ঘুরে বেড়াতেন জলাভূমিতে।

কর্দমবেষ্টিত নিরালা দুর্গম দ্বীপটাকে তাই কুকুরশালা বানিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন।

স্যার চার্লস প্রচলিত কিংবদন্তীটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই কোন অবস্থাতেই রাত্রে বাইরে যেতেন না।

কয়েকজন চাষী হাউন্ডটাকে দেখেছিল। বোধহয় ষ্টেপলটন কুকুরটাকে নিয়ে বেশ কয়েকবার সুযোগের সন্ধানে টহল দিয়েছিলেন। এতে তারই লাভ হয়েছিল-কিংবদন্তী যে নিছক কুসংস্কার নয়-আগাগোড়া সত্যি-মুখে মুখে তা প্রচার হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু স্যার চার্লসকে রাত্রে বাড়ির বাইরে ধরতে পাচ্ছেন না - খুবই অসুবিধায় পড়ে গেলেন ষ্টেপলটন।

ঠিক করলেন, এ ব্যাপারে স্ত্রীকে কাজে লাগাবেন। তিনি কোন এক সময় ভুলিয়ে ভালিয়ে বৃদ্ধকে কাছে এনে দেবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্ত্রী এ প্রস্তাবে বেঁকে বসলেন।

একজন নিরপরাধ বৃদ্ধকে মৃত্যুর মুখে টেনে আনতে বিবেকের পীড়া বোধ করলেন ভদ্রমহিলা। ফলে ভাগ্যে ঘটল নিদারুণ নির্যাতন। কিন্তু নিঃশব্দে সবই সহ্য করলেন তিনি।

শয়তানের সুযোগ শয়তানই হাজির করে। স্ত্রীর কাছ থেকে সহযোগিতা না পেয়ে বিকল্প সুযোগের সন্ধানে ছিলেন ষ্টেপলটন।

একসময়, স্যার চার্লসের মাধ্যমেই সেই সুযোগ উপস্থিত হল।

স্যার চার্লস দানধ্যান করতেন গোপনে-নাম প্রচার না করে। দুর্ভাগিনী মিসেস লরা লায়ন্সকেও সাহায্য পাঠাতেন ষ্টেপলটনেরই হাত দিয়ে।

এই সুযোগটা কাজে লাগলেন তিনি। নিজেকে অবিবাহিত পরিচয় দিয়ে ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হলেন এবং এক সময় কথা দিলেন, মিসেস লায়ন্স যদি স্বামীর

সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারেন তাহলে তাকে বিয়ে করবেন। ভদ্রমহিলা একেবারে কব্জায় এসে গেল তার।

ইতিমধ্যে ডক্টর মার্টিমারের পরামর্শে স্যার চার্লস লন্ডন গিয়ে কিছুদিন থাকবেন স্থির করলেন। ষ্টেপলটনও পরামর্শদাতাদের মধ্যে একজন ছিলেন-তবে সেটা ছিল তার ভান। তাই শিকার নাগালের বাইরে যাওয়ার আগেই কাজ সারতে উদ্যোগী হলেন।

চাপ দিয়ে মিসেস লায়ন্সকে দিয়ে চিঠি লেখালেন। লন্ডন রওনা হবার আগের রাত্রে দেখা করার জন্য কাকুতি-মিনতি করে চিঠি গেল। কিন্তু পরে আবার নানা রকম যুক্তি দিয়ে রাতে ভদ্রমহিলার যাওয়া বন্ধ করলেন।

এবারে দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত সুযোগ এসে গেল। পরিকল্পনা মাফিক সব ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখা ছিল। কুকুরশালায় গিয়ে ফসফরাস মেশানো নির্গন্ধ মলম লাগালেন কুকুরের গায়ে।

তারপর কুকুরটাকে নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন ফটকের ধারে। মিসেস লায়ন্সের জন্য এখানেই দাঁড়াবার কথা বৃদ্ধের। সরল হৃদয় স্যার চার্লস এখানেই তাড়া খেলেন হাউন্ডের।

সেটা তখন কেবল একটা হাউন্ড নয়-লেলিহান আগুনঘেরা চোয়াল-লকলকে আগুন ঠিকরানো চোখ নাক সমেত এক ভৌতিক মূর্তি।

এমন একটা ভয়াবহ নারকীয় প্রাণীর তাড়া খেয়ে আর্তস্বরে ইউ-বীথি ধরে পালাতে লাগলেন বৃদ্ধ। কিন্তু দুর্বল হৃদযন্ত্র আর আতঙ্কে বেশিদূর যেতে পারলেন না-প্রাণ হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

তাড়া খেয়ে স্যার চার্লস দৌড়েছিলেন ইউ-বীথির রাস্তা বরাবর-হাউন্ড দৌড়েছিল রাস্তার ধারের ঘাসের পটি বরাবর। তাই বৃষ্টিভেজা মাটিতেও স্যার চার্লসের দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

হাউন্ড মড়া ছোঁয় না। তাই প্রাণহীন স্যার চার্লসের দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। নিশ্চয়ই হুমড়ি খেয়ে পড়া শরীরটার কাছে এগিয়ে গিয়েছিল-দেহে প্রাণ নেই বুঝতে পেরে ফিরে আসে।

এই সময় পথের ওপর হাউন্ডের যে পায়ের ছাপ পড়ে তাই চোখে পড়েছিল ডক্টর মার্টিমারের।

নির্বিঘ্নে কার্য সিদ্ধি করে কুকুর নিয়ে ফিরে যান ষ্টেপলটন। আর এই রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল গোটা তল্লাটে। রহস্যের কিনারা করতে না পেরে স্থানীয় পুলিশ চোখে অন্ধকার দেখলেন।

এখান থেকেই কেসটা এল আমাদের হাতে।

স্যার বাস্কারভিলের মৃত্যুটা এমন নিখুঁতভাবে ঘটানো হয়েছে যে খুনীর

বিরুদ্ধে কোন কেসই দাঁড় করানো সম্ভব নয়। তিনি জানতেন মিসেস লায়ন্স কখনোই তাকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করবে না। সেদিক থেকে তাই নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি।

চিঠি এবং অ্যাপয়েন্টমেন্ট সংক্রান্ত ব্যাপারটা একমাত্র মিসেস লায়ন্সই জানতেন।

হাউন্ডের খবর উনি জানতেন না। তাই বৃদ্ধের মৃত্যুসংবাদ জানবার পরেও ষ্টেপলটনের ওপর সন্দেহ দানা বাঁধতে পারেনি।

স্ত্রীর সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত ছিলেন ষ্টেপলন। বৃদ্ধকে ঘিরে তার ষড়যন্ত্রের কথা মিসেস জানতেন, হাউন্ডের অস্তিত্বও অজানা ছিল না তার, কিন্তু চিঠি ইত্যাদির কোন বিষয়ই তিনি জানতেন না।

নানা কৌশলে এই দুই মহিলাকেই কব্জা করে রেখেছিলেন ষ্টেপলটন এবং জানতেন তাদের দিক থেকে কোন আশঙ্কার কারণ নেই।

বাস্কারভিল জমিদারীর একজন উত্তরাধিকারী কানাডায় রয়েছে সে খবর ষ্টেপলটন জানতেন কিনা জানি না। তবে খবরটা তিনি পেয়েছিলেন ডক্টর মার্টিমারের থেকে। তাই তরুণ আগন্তককে লন্ডনেই শেষ করে দেবার মতলব ছিল তার।

সেই উদ্দেশ্যেই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনে এসে উঠেছিলেন। কাজের সহযোগী না হওয়ায় স্ত্রীকে বিশ্বাস করতে পারতেন না। তাই তাকে কাছছাড়া করতে ভরসা পেতেন না। লন্ডনে হয়তো সেই কারণেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন।

ষ্টেপলটন দম্পতি উঠেছিলেন ক্র্যাভেন ষ্ট্রীটের মেক্সবরো প্রাইভেট হোটেলে। আমার বিশ্বস্ত চর এ হোটেলে খবর নিয়ে জেনেছিল, হোটেলের ঘরে স্ত্রীকে আটকে রেখে গালে দাড়ি লাগিয়ে ছদ্মবেশে ডক্টর মার্টিমারকে অনুসরণ করে বেকার স্ট্রীটে গিয়েছিলেন। পরে ষ্টেশনে ফিরে এসে আবার নর্দামবারল্যান্ড হোটেলে যান।

স্বামীর বদমতলবের কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন ভদ্রমহিলা-নরদামবারল্যান্ড নামটাও নিশ্চয় স্বামীর মুখ থেকে শুনেছিলেন।

কিন্তু বিপদাপন্ন মানুষটিকে সতর্ক করে দেবার সাহস ছিল না। তবুও তিনি চেষ্টা করেছিলেন, খবরের কাগজ থেকে শব্দ কেটে নিয়ে স্বামীর অগোচরে স্যার হেনরীকে আসন্ন বিপদের হুঁশিয়ারী পাঠিয়েছিলেন।

লন্ডনে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে ষ্টেপলটন কর্মক্ষেত্র ডার্টমুরে পিছিয়ে নিতে বাধ্য হন।

শেষ পর্যন্ত কুকুরটাকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যেই তিনি হোটেল থেকে

কোন পরিচারিকাকে হাত করে একপাটি বুট সরিয়ে ফেলেন।

ভদ্রলোকের কাজের দক্ষতা এবং সাহস সত্যই প্রশংসা করার মত। এতটুকু সময় অযথা নষ্ট হতে দেন নি।

প্রথমের বুট জুতোটা আনকোরা-হাউন্ডকে গন্ধ শুঁকিয়ে পেছনে লেলিয়ে দেবার উপযুক্ত ছিল না।

তাই নতুন পাটি ফেরত দিয়ে পুরনো বুট জুতো হস্তগত করলেন।

হাউন্ড সংক্রান্ত পটভূমি এবং পুরনো বুট জুতো অপহরন-দুটি ঘটনার যোগাযোগই আমাকে সঠিক সূত্রের সন্ধান দেয়।

স্পষ্টই বুঝতে পারলাম-লড়াইটা হবে আমাদের কিংবদন্তীর প্রেত কুকুর নয়-আসল হাউন্ডের সঙ্গে। এছাড়া দুরকম বুট চুরির ঘটনার অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই।

সকালে যেদিন ডক্টর মার্টিমারের সঙ্গে স্যার হেনরী আমাদের এখানে আসেন-পেছনে ছায়ার মত লেগে ছিলেন গাড়ি নিয়ে ষ্টেপলটন।

এই বাড়ির হদিস তিনি জানতেন, কোচওয়ানের কথা থেকে তা জানতে পারি। এ থেকেই বুঝতে পারি-আগেও কুকীর্তি কিছু কম করেন নি তিনি।

গত তিন বছরে পশ্চিম ইংল্যান্ডে চারটি বড় রকমের চুরির ঘটনা ঘটে-যার কিনারা পুলিশ এখনো করতে পারেনি। আমার বিশ্বাস চুরিগুলি ষ্টেপলটনেরই কীর্তি-টাকার অভাব তিনি এভাবে পূরণ করেছেন।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমারই কিছুটা তাৎক্ষণিক বুদ্ধির ভুলে আমাদের হাত ফস্কে পালাতে পেরেছিলেন। এবং গাড়োয়ানের কাছে উদ্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।

কেসটা আমি নিয়েছি বুঝতে পেরে লন্ডনে আর অপেক্ষা করেন নি-ডার্টমুরে ফিরে গিয়ে ওঁৎ পেতে রইলেন।

হোমসে্র দেওয়া পর পর ঘটনার বিবরণ মনোযোগ সহকারে শুনছিলাম। এতটা শুনবার পর একটা প্রশ্ন জাগল মনে।

জিজ্ঞেস করলাম-ভদ্রলোক লন্ডনে গিয়ে কয়েকদিন কাটালেন-এই সময় তার গোপন আস্তানায় হাউন্ডের দেখাশোনা তাহলে কে করত?

স্মিত হেসে হোমস্ বলল, প্রশ্নটা যথার্থই প্রাসঙ্গিক। সন্দেহ নেই যে, ষ্টেপলটনের একজন সহযোগী ছিল। একার পক্ষে সবদিক সামলানো একটা মাত্র মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

কাজের সুবিধার জন্য যতটা জানানো নিরাপদ নিশ্চয় ততটুকু জানিয়েছিলেন এই সহযোগীকে। আমার বিশ্বাস মেরিপিট হাউসের অ্যান্টনি নামের বৃদ্ধ ভৃত্যটিই এই দোসর।

আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি-স্কুল জীবন থেকেই অ্যান্টনি রয়েছে তার সঙ্গে। মনিব দম্পতির সম্পর্কটা সে ভাল ভাবেই জানত।

কাজেই স্ত্রীকে বোন বলে পরিচিতি করাবার আগে, তাকে মতলবের কিছুটা আচঁ অবশ্যই দিতে হয়েছিল।

গ্রিমপেন কর্দামভূমির মাঝখান দিয়ে চলবার জন্য কাঠি বসিয়ে যে গোপন চিহ্ন রেখেছিলেন ষ্টেপলটন, আমি একদিন বুড়োকে সেই রাস্তার ভেতরে যেতে দেখেছি।

হাউন্ডকে নিয়ে মনিবের-সঠিক উদ্দেশ্য হয়তো সে জানত না-কিন্তু মনিবের অনুপস্থিতিতে হাউন্ডটার দেখাশোনা সেই করত। এখন সে পলাতক। দেশ ছেড়ে পালিয়েছে।

যথারীতি ষ্টেপলটন ডেভনশায়ারে ফিরে গেলেন-পরে স্যার হেনরীকে নিয়ে তুমিও পৌঁছালে বাস্কারভিল হলে। আর এই সময়টা আমি মেতে রইলাম গোপন তদন্তে। এবারে সেই পর্ব শোন।

ছাপা শব্দ সাঁটা যে চিঠিটা প্রথম সতর্কবার্তা বহন করে এনেছিল সেটার গায়ে আমি যুঁই ফুলের হালকা একটা গন্ধ পাই।

অপরাধ বিশেষজ্ঞ হিসেবে বিভিন্ন সেন্টের গন্ধ আলাদাভাবে চিনবার ক্ষমতা আমি বিশেষ চেষ্টায় আয়ত্ব করেছি। অপরাধ নির্ণয়ে দারুণ কাজে আসে এই ক্ষমতা।

বাজারে পঁচাত্তর রকমের সেন্ট আছে-তার প্রত্যেকটার গন্ধ আলাদাভাবে আমি চিনতে পারি। চিঠির কাগজের গন্ধ থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম-একজন মহিলাও এ কেসে জড়িয়ে আছেন।

তখন থেকেই স্যার হেনরীর প্রতিবেশীদের মধ্যে ষ্টেপলটনদের ঘিরে ছিল আমার চিন্তা ও চোখ।

হাউন্ড সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম-আগেই বলেছি। পশ্চিম ইংলন্ড রওনা হবার আগেই অপরাধী নির্ণয় করা হয়ে গিয়েছিল আমার। তাই সকলের চোখের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকলেও সতর্ক নজর রইল ষ্টেপলটনের ওপর। আমার উপস্থিতি টের পেলে সাবধান হয়ে যেত সে।

বেশির ভাগ সময়টাই থাকতাম কুমবেট্রেসিতে। দরকার মত পাহাড়ের পাথরের ঘরে চলে আসতাম। নির্ভেজাল গ্রাম্য বালকের ছদ্মবেশে কার্টরাইট অনেক সহযোগিতা করেছে আমাকে। তোমার খবরাখবরও সেই জানাত। তোমার পাঠানো রিপোর্টগুলো একদিন অন্তর কুমবেট্রেসির ঠিকানায় পেয়ে যেতাম। ফলে ষ্টেপলটন সম্পর্কে ধারণা আমার স্পষ্ট হয়ে গেল এবং স্বামী-

স্ত্রীর সম্পর্কটাও আর গোপন রইল না।

জলার কুটিরে তোমার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হল, তখন আমার দিক থেকে চেষ্টা চলছে প্রমাণ সংগ্রহের।

স্যার হেনরীকে মারতে গিয়ে কয়েদী ডানহিলের মৃত্যু ঘটানোর পরও ষ্টেপলটনকে জড়ানোর মত কোন প্রমাণ পেলাম না। মুখোমুখি নামবার সিদ্ধান্ত তখনই নিতে হল।

স্যার হেনরীকে নৈশভোজের নিমন্ত্রণে একা পাঠাবার ব্যবস্থা করে ফাঁদ পাততে হল। ফাঁদে শিকার ধরা পড়ল-কিন্তু তার জন্য বড় বেদনাদায়ক মূল্য দিতে হল।

এমন একটা দানবীয় প্রাণী যে ষ্টেপলটন লেলিয়ে দেবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি। এ কেসে সাফল্যের কথা মনে হলেই স্যার হেনরীর প্রতি কৃত ব্যবহারের জন্য কাতর হয়ে পড়ি।

তাঁর স্নায়ুর ওপরে অবশ্য সব চেয়ে বেশি চাপ পড়েছে মিসেস ষ্টেপলটনের ব্যাপারে। ভদ্রমহিলাকে উনি আন্তরিকভাবে ভালবেসে ফেলেছিলেন। তাই তার প্রতারণা বড় হয়ে বেজেছে তার বুকে।

ভদ্রমহিলাকে অবশ্য নিরুপায় হয়েই এই অভিনয় করতে হয়েছিল। স্বামীর প্রভাব সেটা নিজের দিক থেকে ভালবাসারও হতে পারে, ভয়েরও হতে পারে, সহজে কাটিয়ে উঠতে পারেন নি।

ষ্টেপলটন সেকারণে নিশ্চিন্তই ছিলেন। কিন্তু চিনতে ভুল করেছিলেন তিনি স্ত্রীকে। স্পেনীয় রক্ত যার ধমনীতে বইছে, সহজে সে অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করে কি করে।

খুনের ব্যাপারে ষ্টেপলটনের সঙ্গে তিনি হাত মেলান নি। স্বামীকে বিপন্ন না করে তিনি গোড়া থেকেই বারবার সাবধান করে দিতে চেষ্টা করেছেন স্যার হেনরীকে।

নিজের পরিকল্পনা মতই ষ্টেপলটন স্ত্রীকে স্যার হেনরীর কাছাকাছি এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দুজনকে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখে আবার ঈর্ষায় ফেটে পড়েছিলেন।

সেই সুযোগেই তার ভেতরের ভীষণ প্রকৃতি সংযমের মুখোশ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই পরে সংযত হন এবং দুজনের ঘনিষ্ঠতাকে প্রশ্রয় দেন।

তার উদ্দেশ্য ছিল, মেরিপিট হাউসে ঘন ঘন যাতায়াত ঘটুক স্যার হেনরীর। তারপর সুযোগ মত তিনি উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবেন।

কিন্তু চরম ঘটনার সেই দিনটিতে ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই বুঝে

দাঁড়িয়েছিলেন। কয়েদীর মৃত্যুর আগে হাউন্ডটাকে আউট হাউসে এনে রাখা হয়েছিল। কয়েদীর মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল তা তিনি জেনে যান।

স্যার হেনরী যে রাত্রে ডিনার খেতে এলেন সেই সময়ও হাউন্ডকে আউট হাউসে রাখা হয়েছিল। উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বুখে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

ষ্টেপলটন প্রমাদ গুনলেন। তাই স্যার হেনরীকে যাতে কোনভাবে সাবধান করতে না পারেন সেজন্য ওপরের শোবার ঘরে বেঁধে রাখলেন স্ত্রীকে।

মনে হয় মারধোর করার সময় ষ্টেপলটন স্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা বলেও ফেলেছিলেন তাকে। ফলে ভদ্রমহিলার অন্তরের ভালবাসা পর্যবসিত হয়েছিল অপরিসীম ঘৃণায়।

স্বামীর প্রতি এই ঘৃণাই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কর্দম ভূমির দ্বীপের দিকে।

এই একটি জায়গাতেই হিসেবে ভুল করে ফেলেছিলেন ষ্টেপলটন। স্যার হেনরীর মৃত্যুটাকে নিরাপদে প্রেত-কুকুরের কাঁধে চাপাতে সক্ষম হলেও এই ভুলই তাকে শেষ পর্যন্ত নরকে পাঠিয়ে ছাড়ত।

স্যার হেনরীকে সরাতে পারলেই সম্পত্তি দখলের সব বাধা অপসারিত হত ষ্টেপলটনের। তার পর কিভাবে দাবী আদায় করবেন সে পথও নিশ্চয় ভালভাবে ভেবে রেখেছিলেন।

ভবিষ্যতের পথ নিষ্কন্টক না করে তার মত বুদ্ধিমান মানুষ জীবন-মৃত্যুর এমন খেলায় মরিয়া হয়ে নামতেন না।

ভায়া ওয়াটসন, আমার বিবরণের সঙ্গে এবার ঠান্ডামাথায় ঘটনাগুলো মিলিয়ে নাও।

মূল কাহিনি : স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের *'দ্য হাউণ্ড অভ বাস্কারভিলস'*

==== o ====

অদৃশ্য আততায়ী

আগাথা ক্রিস্টি

এক

কক্সবাজার।

সী-বীচের এদিকটায় লোকজনের ভিড় বেশ কম। একটু দূরেই বৌদ্ধ মন্দির। এরপর ছোট একটা কাঁচাবাজার। আরও একটু এগুলে কয়েকটা পাকা বাড়ি নজরে পড়ে।

যে হোটেলটায় আমরা উঠেছি সেটার নাম 'অবকাশ'। দোতলা। ছোট হলেও বেশ ছিমছাম। নভেম্বরের শেষাশেষি টুরিস্টদের ভিড় লেগেই থাকে এসব হোটেলে। তবু ভাগ্য ভাল বলতে হবে আমাদের, কোনরকম ঝামেলা ছাড়াই দোতলায় দক্ষিণমুখী স্যুইট পেয়েছি।

বিকেল প্রায় পাঁচটা। হোটেলের লনে বসে কথা বলছিলাম আসাদের সঙ্গে। ইদানীং শরীরটা ভীষণ ভোগাচ্ছে ওকে। আর তাই তাড়াহুড়ো করে হাওয়া বদল করতে এখানে আসা। নইলে আর সব বছরের মত এবারও পরিকল্পনা করতে করতেই সময় পেরিয়ে যেত।

'সমুদ্রের খোলাবাতাস শরীরে লাগলে খিদেটা কিন্তু বেশ বেড়ে যায়।'

'হুঁ। আর সেই সাথে শরীরটাও চাঙা হয়ে ওঠে,' আসাদের কথায় সায় দিয়ে বললাম। ওর কোলের ওপর রাখা দৈনিক 'জনবার্তা'র একটার বিশেষ খবরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, গ্লাইডারে চেপে বঙ্গোপসাগরের ওপর চক্কর দিতে গিয়ে এক ভদ্রলোক যে নিখোঁজ হয়েছেন, সে ব্যাপারে নতুন কোন খবর আছে?'

'নাহ্; সেই একই পুরনো খবর ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ছেপেছে। মানে, ভদ্রলোক এখনো নিখোঁজ, সার্চ পার্টি পুরোদমে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে...ইত্যাদি ইত্যাদি।' পত্রিকাটা ভাঁজ করে পাশের টেবিলে রাখল আসাদ।

'গ্লাইডারসুদ্ধ পানিতেই ডুবে গেছেন বোধহয়।'

'সেরকম সম্ভাবনাই বেশি। অবশ্য পত্রিকায় লিখেছে, বঙ্গোপসাগরে ব্যাপক খোঁজাখুঁজি চলছে। বেশ কদিন হয়ে গেল ভদ্রলোক নিখোঁজ। সত্যি সত্যিই যদি পানিতে ডুবে গিয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে সার্চ পার্টি তাঁকে খুঁজে পাবে বলে মনে হয় না। সামুদ্রিক প্রাণীর খোরাক হলেও অবাক হবার কিছু নেই।'

সূর্যটা ধীরে ধীরে হেলে পড়ছে পশ্চিমে। সন্ধ্যা হতে আর বেশি বাকি নেই। উঠে দাঁড়াল আসাদ। উঠলাম আমিও। হাঁটতে শুরু করলাম সী-বীচের দিকে।

হঠাৎ কি হলো কে জানে! মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় ব্যথায় ককিয়ে উঠল আসাদ। কিছু বোঝার আগেই হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিল একটা মেয়ের গায়ের ওপর। যেন তৈরিই ছিল মেয়েটা। চট্ করে এক পাশে সরে গিয়ে একটা হাত ধরে ফেলল আসাদের, আর পেছন থেকে পিঠ খামচে ধরলাম আমি। দুজনে ধরাধরি করে হোটেলের লনে পাতা চেয়ারে বসিয়ে দিলাম ওকে। দুজনে বাকি দুটো চেয়ারে বসে পড়লাম। ততক্ষণে সামলে উঠেছে আসাদ। 'হঠাৎ মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল,' মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল ও, 'আমি খুবই দুঃখিত, মিস্... ।'

'আমার নাম এলিজাবেথ গোমেজ; সব্বাই লিজা বলে ডাকে,' আসাদের কথায় বাধা দিয়ে বলল মেয়েটা।

'আমি আসাদ রহমান। শখের গোয়েন্দা বলতে পারেন। আর এর নাম হাবিব আখন্দ, আমার বন্ধু,' আমার দিকে ইঙ্গিত করে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল আসাদ।

আলাপ জমে উঠল। মেয়েটাকে মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায়। বেশভূষায় অনেকটা পাঙ্কদের মত। পরনে জিন্সের ট্রাউজার ও শার্ট। মাথায় বেতের তৈরি সুন্দর একটা হ্যাট শোভা পাচ্ছে। বাজার থেকে খানিকটা দূরে যে গুটিকয়েক সুন্দর বাড়ি নজরে পড়ে, তারই একটার মালিক এই মেয়েটা। তিন পুরুষ ধরে এই এলাকায় বাস করছে ওরা। বাবা-মা নেই মেয়েটার। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় খান সেনাদের গুলিতে মারা পড়েন ওর বাবা। এর বছর দুয়েক পর মা-ও মারা যান। পিতামহ মাইকেল গোমেজের ছিল বিরাট কাঠের ব্যবসা। তবে ওর বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীর মেজর। পিতা-পিতামহ দুজনেই বিলাসী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। সঞ্চয় করার দিকে নজর ছিল না কারোর। পৈত্রিকসূত্রে শুধু বাড়িটাই পেয়েছে লিজা। কথাবার্তা আর চালচলনে আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না, বাপ-দাদার স্বভাব

মেয়েটাও পেয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে অনার্স করেছে ও। এরপর লেখাপড়ায় ক্ষান্ত দিয়ে বাড়িঘর দেখাশোনা আর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়েই দিন কেটে যাচ্ছে ওর।

বেয়ারা চা দিয়ে গেল। চায়ে চুমুক দিতে দিতে মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এত বড় বাড়িতে একলা থাকতে অসুবিধা হয় না আপনার?'

'নাহ্; অসুবিধা আর কি! অনেক দিনের পুরনো এক ঝি আছে। ও-ই সবকিছু দেখাশোনা করে। আর ওর স্বামী বাগানে মালীর কাজ করে। মাঝে মধ্যে চট্টগ্রাম থেকে বান্ধবীরা এসে বেড়িয়ে যায়।'

'তবু আপনার সাহস আছে বলতে হবে,' মুচকি হেসে বলল আসাদ, 'নইলে এরকম নির্জন জায়গায় আপনার মত মেয়ের পক্ষে কিছুতেই একা থাকা সম্ভব হত না।'

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা। 'অনেকেই বলে আমার স্বভাব নাকি গেছো মেয়েদের মত। ছোটবেলায় মারামারিতে সমবয়সী ছেলেদের প্রায়ই হারিয়ে দিতাম। আর বড় হয়ে এভাবে একলা থাকার অভ্যেসটা জন্মেছে বাবা মারা যাওয়ার পর।'

চায়ের কাপ তুলে নিল মেয়েটা। 'তবে আজকাল মাঝে মাঝে কেমন যেন ভয় হয়। যখন চুপচাপ শুয়ে থাকি, মনে হয় কতকগুলো ছায়া যেন চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাতে ঘুমোনোর সময় এরকমটা হয় বেশি।'

'অনেক সময় নার্ভাস টেনশন থেকে এমনটা হয়,' বললাম।

'কিংবা পারিবারিক কোন অভিশাপ তাড়া করে ফিরছে কিনা কে জানে!' হেসে পরিবেশটাকে হালকা করার চেষ্টা করল আসাদ।

'কেন এরকম হচ্ছে জানি না। তবে ইদানীং কয়েকটা ব্যাপার...' চায়ে চুমুক দিল মেয়েটা।

হঠাৎ কোত্থেকে কয়েকটা মৌমাছি এসে বিরক্তিকর ভনভন শব্দে আমাদের চারপাশে ঘুরতে লাগল। হাত নেড়ে ওগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু কাজ হলো না। মাথার হ্যাট খুলে কয়েকটা ঝটকা মেরে মৌমাছিগুলোকে তাড়িয়ে দিল মেয়েটা। হ্যাটটা নামিয়ে রাখল লনের ঘাসে।

'কি যেন বলছিলেন, আপনি...' মেয়েটাকে আগের কথার সূত্র ধরিয়ে দিল আসাদ।

'কি যেন বলছিলাম...' একটু ভাবল মেয়েটা, 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অবশ্য তেমন কিছু নয়, তবু ঘটনাগুলো বেশ ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে।

শুনলে হয়তো হাসি পাবে আপনাদের।'

'বলেই ফেলুন না! কি এমন ঘটনা যা ভাবিয়ে তুলেছে আপনাকে?'

কি যেন ভাবল মেয়েটা। 'প্রথম ঘটনাটা দিন পনেরো আগের। রাত প্রায় দেড়টা-দুটো হবে। হঠাৎ ভারী কিছু পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি, মাথার কাছে টাঙানো বিরাট অয়েলপেইন্টিংটা মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। চারদিকে ভাঙা কাচের টুকরো ছড়ানো ছিটানো। মজবুত দড়ি দিয়ে খাটের মাথার দিকের দেয়ালে টাঙানো ছিল ওটা। দেয়ালের প্রায় সঙ্গেই খাটটা। ভাগ্য ভাল যে ওটা আমার মাথায় না পড়ে মেঝেয় পড়েছিল। এর কয়েকদিন পরের ঘটনা। মর্নিং ওয়াক করতে যাচ্ছিলাম সী-বীচের দিকে। হঠাৎ দেখলাম, দূরের টিবি থেকে পাথরের একটা বড় চাঁই গড়িয়ে আমার দিকেই আসতে লাগল। মনে হচ্ছিল, আমাকে লক্ষ্য করেই কেউ ওটাকে গড়িয়ে দিয়েছে। চাঁইটা গড়াতে গড়াতে কাছে এসে পড়তেই চট্ করে সরে গেলাম। সেটা গিয়ে আছড়ে পড়ল সমুদ্রের পানিতে। এবারও অল্পের জন্যে বেঁচে গেলাম। শেষ ঘটনাটা ঘটেছে দিন তিনেক আগে। সকাল দশটার দিকে গাড়ি বের করলাম। চট্টগ্রাম যাওয়ার কথা। আমার গাড়িটা মিনি অস্টিন। নিজেই চালাই। তো ঐ দিন গাড়ি স্টার্ট দিয়ে একটু পথ পেরিয়ে যেই ব্রেকে পা দিয়েছি, দেখি ব্রেক ধরছে না। এরকমটা অবশ্য হবার কথা নয়। কারণ কয়েকদিন আগেই পরিচিত এক গ্যারেজ থেকে গাড়িটা সার্ভিসিং করিয়েছি। যা হোক, শেষে একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়ে কোনমতে গাড়িটাকে থামালাম। ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখি, গাড়ির ব্রেক অয়েল ফেলে দেয়া হয়েছে। পরে ঐ গ্যারেজের মেকানিককে জিজ্ঞেস করে জেনেছি, সার্ভিসিংয়ের সময় ব্রেকটাও ঠিক করে দিয়েছিল।' লম্বা একটা দম নিল মেয়েটা। 'পরে অবশ্য ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখলাম, আসলে এগুলো স্রেফ দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়। আপনার কি মনে হয়?'

'মনে হচ্ছে আপনার অনুমানই ঠিক। প্রথম দুর্ঘটনাটার কথাই ধরুন না, বিরাট অয়েল-পেইন্টিংটার ভারে পুরনো কর্ড ছিঁড়ে যাওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এ ছাড়া টিবির গা থেকে প্রায়ই বড় বড় পাথরের চাঁই খসে পড়ার কথা শোনা যায়। মাঝে মধ্যে সেগুলো পথচারীদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর তৃতীয় দুর্ঘটনাটা স্রেফ গ্যারেজ মেকানিকের গাফিলতি।'

আসাদের কথায় মনে জোর পেল মেয়েটা। 'আমারও তাই মনে হয়। ওগুলো নেহায়েত দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়,' উঠে দাঁড়াল সে, 'আজ তা

হলে চলি। বাজারের দক্ষিণ দিকের প্রথম বাড়িটাই আমার, নাম "স্বপ্নবিলাস"। সময় করে আসবেন কিন্তু।'

চলে গেল মেয়েটা। তাড়াহুড়ো করে যাবার সময় হ্যাটটা ভুলে ফেলে রেখে গিয়েছে। ওটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল আসাদ। হঠাৎ চেহারাটা গম্ভীর হয়ে গেল ওর। আমার দিকে হ্যাটটা বাড়িয়ে দিল। 'ভাল করে দেখে বলো তো জিনিসটায় লক্ষ্য করার মত কিছু আছে কিনা?'

হ্যাটটি নেড়েচেড়ে দেখলাম। ভাল বেতের তৈরি। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ল না। জিনিসটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিলাম। 'হ্যাটটা সত্যিই সুন্দর, আর মেয়েটাকে মানিয়ে ছিলও চমৎকার।'

আমার কথায় কিছুটা যেন বিরক্ত হলো আসাদ। 'আমি তোমাকে জিনিসটার ভালমন্দ খুঁটিয়ে দেখতে বলিনি। ওটার অন্য কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, সেটাই ভাল করে দেখতে বলেছিলাম।'

হেসে ফেললাম। 'তুমি হচ্ছো শখের গোয়েন্দা। আর সবকিছুতেই রহস্যের গন্ধ শুঁকে বেড়ানো গোয়েন্দাদের একটা বদভ্যাস। আমার চোখে তো কিছুই ধরা পড়ল না। এখন বলো দেখি, ব্যাপারটা কি?'

'হ্যাটটার ঠিক মাথার কাছাকাছি সামনে-পেছনে লক্ষ্য করো।'

আসাদের কথামত হ্যাটটা হাতে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করলাম। সামনে এবং পেছনে দুদিকেই একই সরলরেখা বরাবর দুটো গোল ছিদ্র।

'ছিদ্র দুটো পিস্তলের গুলির। গুলিটা আর ইঞ্চি দেড়েক নিচু দিয়ে গেলেই মেয়েটার মগজে ঢুকে যেত।'

'মানে! কি বলতে চাও তুমি?'

'যা বলতে চাই সেটা খুবই সহজ। এই দ্যাখো,' মাটি থেকে কি যেন তুলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ও, 'বুলেট। আমরা যখন কথা বলছিলাম সম্ভবত তখনই ঘটেছে ঘটনাটা। আততায়ী মনে হয় অনেক দূর থেকে তাক করেছিল—তাই লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি। এখন কেন যেন মনে হচ্ছে, ঐ দুর্ঘটনাগুলো আসলে দুর্ঘটনা নয়। এসবের পেছনে নিশ্চয়ই কারো হাত আছে।'

'কিন্তু ওকে খুন করে কার কি লাভ? কথাবার্তায় যা বোঝা গেল তাতে বিষয়-সম্পত্তি বলতে মান্ধাতার আমলের বাড়িটা ছাড়া আর কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।'

'খুনের মোটিভ সবসময় টাকা পয়সা না—ও হতে পারে।'

'তা ঠিক। কিন্তু—একটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না। গুলিটা যেই ছুঁড়ে

থাকুক তার শব্দ তো নিশ্চয়ই শুনতে পাওয়া যেত। আর গুলিটা আমাদের পায়ের কাছাকাছিই বা এসে পড়ল কি করে?'

'সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের আওয়াজ শুনতে না পাবারই কথা। আর পেছন দিককার বড় পাথরের চাঁইটাতে ধাক্কা খেয়েই গুলিটা ছিটকে আমাদের পায়ের কাছাকাছি এসে পড়েছে।'

'পিস্তলে সাইলেন্সার লাগানো থাকলেও গুলি করলে টের পাওয়া যায়... ।'

'কিন্তু সমুদ্রের গর্জনে ঐ সামান্য শব্দটুকু ঢাকা পড়ে যেতে বাধ্য। উহুঁ, তুমি যাই বলো না কেন, আজ আমাদের সামনে মেয়েটাকে যে খুন করার চেষ্টা চালানো হয়েছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, হাবিব। আততায়ী এ নিয়ে পরপর চারবার ব্যর্থ হয়েছে। পঞ্চমবারে সে সাফল্যের মুখ দেখলেও দেখতে পারে। চলো, আর দেরি না করে এখনই ওর বাড়ি থেকে ঘুরে আসি।'

লিজার বাড়িতে যখন পৌঁছলাম ঘড়িতে তখন সন্ধ্যে সাতটা। বাড়িটা পুরনো হলেও বেশ মজবুত। দোতলা। মরচে ধরা লোহার গেটের সাথে সাঁটা ছোট একটা টিনের ফলকে লেখা "স্বপ্নবিলাস"। গেট খুলে ভেতরে ঢুকলাম। কলিং বেল টিপতেই মাঝবয়েসী এক মেয়েলোক বেরিয়ে এল। আমাদের আসার উদ্দেশ্য বললাম। ড্রইংরুমে আমাদের বসিয়ে ভেতরে চলে গেল সে। কয়েক মিনিট পর রুমে ঢুকল লিজা। আমাদের দুজনকে দেখে বেশ অবাক হয়েছে সে।

'আপনার হ্যাটটা ফিরিয়ে দিতে এলাম। তখন ভুল করে লনে ফেলে এসেছিলেন,' লিজার দিকে হ্যাটটা বাড়িয়ে দিল আসাদ।

'থ্যাঙ্কস। আমি তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না, হ্যাটটা গেল কোথায়! গত শীতে মেলা থেকে কিনেছিলাম এটা। বেশ সুন্দর, তাই না?'

আমরা কোন জবাব দিলাম না। আমাদের গম্ভীর চেহারার দিকে তাকিয়ে একটু যেন ভড়কে গেল লিজা। 'কি ব্যাপার! এত চুপচাপ কেন?'

'আপনারা সঙ্গে কিছু জরুরী কথা আছে,' বলল আসাদ।

'বেশ তো, বলুন না!'

'আজ বিকেলে যে দুর্ঘটনাগুলোর কথা বললেন, এখন মনে হচ্ছে ওগুলো আসলে দুর্ঘটনা নয়।'

'মানে?' অবাক চোখে তাকিয়ে রইল সে আসাদের দিকে।

'মানে, বলতে চাচ্ছি, ঐ দুর্ঘটনাগুলো আপনাআপনি ঘটেনি। ওগুলোর পেছনে কারো হাত আছে।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমাকে খুন করার জন্য কেউ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে,' লিজার কণ্ঠে মৃদু তাচ্ছিল্যের আভাস।

লিজার অবজ্ঞা গায়েই মাখল না আসাদ। 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। এখন থেকেই আপনার সাবধান হওয়া উচিত।'

'আচ্ছা, না হয় ধরেই নিলাম, আমাকে কেউ খুন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আততায়ীর মোটিভ কি? থাকার মধ্যে তো আছে শুধু এই পোড়ো বাড়িটা; তা–ও আবার ব্যাংকের কাছে বন্ধক দেয়া।'

'খুনের মোটিভ সবসময় টাকা-পয়সা কিংবা সম্পত্তির সঙ্গে জড়িত না-ও হতে পারে। অনেক সময় প্রতিহিংসা, ঘৃণা কিংবা জেলাসীও জোরালো মোটিভ হিসেবে কাজ করে।'

'কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার হচ্ছে না। ঐ দুর্ঘটনাগুলোর পেছনে কারো যে হাত আছে, সে ব্যাপারে এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে? ওগুলো তো কাকতালীয় ব্যাপারও হতে পারে!'

'প্রথমে আমিও ঐ রকমই ধারণা করেছিলাম। কিন্তু আপনি চলে আসার পর হঠাৎ করে একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম। আর তখন থেকেই মনে হচ্ছে দুর্ঘটনাগুলো শুধুই দুর্ঘটনা নয়–নিখুঁত পরিকল্পনার ফসল। ওগুলোর যে কোন একটাতে আপনি মারা গেলেও সেটাকে খুন বলে সন্দেহ করত না কেউ। কপাল খুবই ভাল বলে তিনবারই অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছেন আপনি। আততায়ীকে তাই পরিকল্পনায় কিছুটা অদল বদল করতে হয়েছে। সে চাইছিল খুনটাকে দুর্ঘটনার আবরণে চালিয়ে দিতে। কিন্তু তিন তিনবার ব্যর্থ হওয়ায় আজ একেবারে সরাসরি আঘাত হেনেছে সে। কিন্তু এবারও অসম্ভব কপালগুণে বেঁচে গিয়েছেন আপনি।'

'কিন্তু এসবের মাথামুণ্ডু কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আজ আবার আমার উপর হামলা হলো কখন?' চোখ বড় বড় করে আসাদের দিকে তাকাল লিজা।

'এই দেখুন,' লিজার হাত থেকে হ্যাটটা নিল আসাদ, 'এই ফুটো দুটো ভাল করে লক্ষ্য করুন। দুটো ফুটো একই সরলরেখা বরাবর। পিস্তল কিংবা রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়লে ঐ রকম ফুটো হওয়া সম্ভব।'

'আপনার কি ধারণা, আমাকে কেউ গুলি করে খুন করার চেষ্টা করেছিল?'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন,' পকেট থেকে গুলিটা বের করে লিজার সামনে মেলে ধরল আসাদ। 'এটা পাওয়া গেছে হোটেলের লনে–যেখানটায় বসেছিলাম। আমরা যখন কথা বলছিলাম, আততায়ী সেই সুযোগটাই নিয়েছে।'

এই প্রথম লিজার চেহারায় স্পষ্ট ভয়ের ছাপ দেখতে পেলাম। কয়েক মুহূর্ত কোন কথাই বলতে পারল না। ওর চেহারা দেখে মনে হলো, ঘটনার গুরুত্ব বোধ শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পেরেছে।

ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিল লিজা। 'কেউ আমাকে খুন করতে চাইতে পারে, কথাটা বিশ্বাসই হয় না। এমন কোন শত্রুও তো নেই আমার!'

'ইদানীং কারো সঙ্গে কি ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল, আপনার?'

'কই, না তো!'

'হুঁ।' চিন্তিত দেখাচ্ছে আসাদকে। 'বাড়িতে আপনি, ঝি আর মালী ছাড়া আর কে থাকে?'

'বাড়ির পেছন দিকে আধাপাকা গোটা তিনেক ঘর আছে। ওখানে থাকেন মি, ও মিসেস ডি কস্টা আর তাদের তেরো-চোদ্দ বছর বয়সের একমাত্র ছেলে টনি।'

'ডি কস্টারা কে কি করেন?'

'কাছের বাজারটাতে মি. ডি কস্টার বড় একটা মুদি দোকান আছে। মিসেস ডি কস্টা একটা অ্যাক্সিডেন্টে কয়েক বছর ধরে পঙ্গু। হুইল চেয়ার ছাড়া চলতে ফিরতে পারেন না। ওঁদের ছেলেটা এবার ক্লাস নাইনে। বেশ নির্ঝঞ্ঝাট পরিবার। কারো সাতে-পাঁচে নেই।'

'ঝি,মালী কিংবা ডি কস্টাদের কাউকে কি আপনার সন্দেহ হয়?'

'মি. ডি কস্টা আমাকে নিজের মেয়ের মতই স্নেহ করেন। বাবার সাথে এক সঙ্গে কাজও করেছেন। এ ছাড়া বুয়া কিংবা মালী আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে, একথা ভাবতেও কষ্ট হয়।'

'আত্মীয়দের কেউই এখানে থাকে না। চট্টগ্রামে এক মামাতো ভাই আছে। অ্যালবার্ট। পেশায় উকিল। এ ছাড়া একমাত্র চাচাতো বোন এলি, সে-ও থাকে চট্টগ্রামেই। ওখানকার এক কিণ্ডারগার্টেন স্কুলে চাকরি করে।'

'আর আপনার বন্ধু-বান্ধবরা?''

'তাদের প্রায় সবাই এই এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা। কয়েকটা বাড়ি পরেই আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী রিয়ার বাসা। ওর বাবা কিছুদিন আগে মারা

গেছেন। পৈত্রিক সূত্রে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছে ও। বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু লোকটা একটা আস্ত পিশাচ–তার উপর আবার ড্রাগ অ্যাডিক্ট। তাই শেষ পর্যন্ত টিকলো না বিয়েটা। আমার আরেক বন্ধু ফিরোজ, সে-ও থাকে রিয়ার কাছাকাছিই। পেশায় চিত্রকর। চট্টগ্রামে পেইন্টিংসের একটা দোকান আছে। ওর বাবাই দোকানটা দেখাশোনা করেন। আরও একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে–জাহাজের ক্যাপ্টেন হোবার্ট। চট্টগ্রামে বাড়ি। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই বন্ধু-বান্ধবদের এখানে পড়ে থাকে।'

'এদের কাউকে কি আপনার সন্দেহ হয়?'

'না।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে আসাদকে। হ্যাটটা আরও বারকয়েক উল্টেপাল্টে দেখে লিজার দিকে বাড়িয়ে দিল। 'আচ্ছা, আপনার বন্ধু-বান্ধবদের কারোর কি পিস্তল আছে?'

'ঠিক জানি না। তবে মনে হয় না। অবশ্য আমার নিজেরই একটা পিস্তল আছে। জিনিসটা ছিল বাবার। স্মৃতি হিসেবে রেখে দিয়েছি আমি। যদিও কোন কাজেই আসে না...।'

'পিস্তলটা একটু দেখাবেন?'

'অবশ্যই! একটু অপেক্ষা করুন, আমি নিয়ে আসছি,' উঠে চলে গেল লিজা। দোতলার সিঁড়ি ভাঙার শব্দ পেলাম। কয়েক মিনিট পর ফিরে এল ও। চোখমুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে। 'পিস্তলটা নেই। ওয়ার্ডরোবের কাপড়ের নীচে রাখা ছিল। গত পরশুও জিনিসটা নজরে পড়েছে আমার।'

দুই

পিস্তল চুরির বিষয়টা জানার পর থেকেই আমাদের আলোচনা নতুন দিকে মোড় নিল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল আসাদ বুঝি খামকাই ভয় পাইয়ে দিচ্ছে লিজাকে। আর লিজাও বোধহয় ওর কথাগুলোকে একেবারে উড়িয়ে না দিলেও খুব একটা গুরুত্ব দিচ্ছিল না। কিন্তু এখন রীতিমত নার্ভাস দেখাচ্ছে ওকে।

'আততায়ী যে অতিশয় চালাক তাতে কোন সন্দেহ নেই। পিস্তলে নিশ্চয়ই আপনার হাতের ছাপ থেকে থাকবে। আর একটা পিস্তল দিয়ে আপনাকে খুন করে আপনার পিস্তলটা যদি আশপাশে কোথাও ফেলে রাখা যায় তা হলে জিনিসটা নিশ্চয়ই কারো না কারো নজরে পড়বে। ধরে নিই, সে পুলিশে খবর দেবে। আর পুলিশ পিস্তলের গায়ে পাওয়া ছাপ পরীক্ষা করে যখন জানবে যে সেটাতে আপনারই হাতের ছাপ তখন ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা বলেই ধরে নেবে তারা। পরিকল্পনা মাফিক ঠিকই এগোচ্ছিল আততায়ী কিন্তু কিছুতেই খুন করার জুতসই জায়গা পাচ্ছিল না সে। নইলে আজ আমাদের সামনে সরাসরি হামলা করতে সাহস পেত না। কাজটা সে করেছে অনেকটা মরিয়া হয়ে। যে কোন কারণেই হোক, খুব বেশি সময় নষ্ট করতে রাজি নয় সে। আর তাই খুনকে দুর্ঘটনা কিংবা আত্মহত্যার রূপ দেয়ার চেষ্টা না করে আজ সে সরাসরি হামলা চালিয়েছে।'

'আশ্চর্য! আমার মত সাধারণ একজন মেয়েকে খুন করার জন্য আততায়ী আমারই পিস্তল চুরি করবে—ঝুঁকিটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

'তা হয়তো একটা হচ্ছে। কিন্তু ঐ যে বললাম, আততায়ীর আগেকার পরিকল্পনা ছিল অন্য রকম। আর সে ক্ষেত্রে আপনার পিস্তল চুরি করা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা ছিল না,' সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নি সংযোগ করল আসাদ, 'যাক, আপনি ঘাবড়াবেন না।

ঘটনার সঙ্গে আমরা একবার যখন জড়িয়ে পড়েইছি তখন এর শেষ না দেখে ছাড়ছি না। আততায়ী চারবার ব্যর্থ হয়েছে। আগামীতে হয়তো আরও শক্ত হামলা আসতে পারে। তাই আমরা আপনাকে চোখেচোখে তো রাখবই, আপনি নিজেও এখন থেকে খুব সাবধানে থাকবেন।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু কিভাবে সাবধান হব, একদিন বাইরে না বেরুলেই দম বন্ধ হয়ে আসতে চায় আমার... ।'

'না, না বাড়িতে আটক থাকতে হবে না। তাতে বরং আততায়ী সতর্ক হয়ে যাবে। তখন তাকে ফাঁদ ফেলা কঠিন হয়ে পড়বে। তাই নিরাপদ দূরত্বে থেকে আততায়ীকে সুযোগ করে দিতে হবে। আপনার চলাফেরায় কোন বিধি নিষেধ নেই। কেবল চোখকান একটু খোলা রাখতে হবে।'

'তা কি করতে হবে আমাকে, বলুন?'

'তেমন কিছুই না। যদি সম্ভব হয় তা হলে আপনার কোন আততায়ীকে কয়েক দিনের জন্য এখানে এসে থাকতে বলুন। আমি চাই, রাতের বেলা অন্তত কেউ একজন আপনার কাছাকাছি থাকুক।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে লিজাকে। মনে হচ্ছে, কিছু একটা ভাবছে । চুপচাপ কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। 'ইয়ে...মানে আত্মীয়দের মধ্যে ধারেকাছে তো এমন কাউকে দেখছি না যাকে কয়েকদিন এ বাড়িতে থাকার কথা বলতে পারি। অবশ্য রিয়াকে বলা যেতে পারে; কিন্তু নিজের বাড়িঘর ফেলে এখানে এসে আমাকে পাহারা দেয়া বোধহয় ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। বরং এক কাজ করা যায়, চট্টগ্রামে আমার যে চাচাতো বোন থাকে ওকে বললে মনে হয় রাজি হবে।'

'বেশ তো, তা হলে ওকেই টেলিফোন করে দিন জলদি এখানে চলে আসার জন্যে। ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনার চাচাতো বোনকে আমার পরামর্শেই যে এখানে আসতে বলেছেন একথা কেউ যেন না জানে। এ ছাড়া ওকে এখানে আসতে বলার পেছনে সত্যিকারের উদ্দেশ্যটা গোপন রাখতে হবে।'

'বেশ। তাই হবে।'

'এবারে অন্য একটা প্রসঙ্গে আসি। আপনি কি কখনো উইল করেছিলেন?'

'হ্যাঁ। আট নয় মাস আগে। পেটে টিউমার হয়েছিল। ওটা অপারেশন করানোর সময় উইলটা করেছিলাম। যারা অপারেশনের সময় কাছে ছিল তাদেরই চাপাচাপিতে করেছিলাম ওটা।'

'উইলে কাকে কি দিয়েছিলেন?'

'আসলে উইল করার মত সম্পত্তি কীই বা আছে আমার! বাড়িটা অ্যালবার্টের নামে আর বাদবাকি যা-কিছু সব রিয়ার নামে লিখে দিয়েছিলাম।'

ঘড়ি দেখল আসাদ। রাত প্রায় ন'টা। উঠে দাঁড়ালাম আমরা। ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে আসব, এমন সময় আসাদের নজর গেল দেয়ালে টাঙানো বিরাট অয়েল-পেইন্টিংটার দিকে। সুঠামদেহী এক সুপুরুষের জ্যান্ত প্রতিকৃতি যেন! 'ছবিটা কার?'

'ওটা আমার দাদার। ফিরোজ বেশ কয়েকবার কিনতে চেয়েছে। যদিও টাকাপয়সার টানাটানি, তবু বেচতে ইচ্ছে হয়নি ওটা।'

'ছবিটার জন্য ফিরোজ কত টাকা দিতে চেয়েছিল?'

'পাঁচ হাজার। কিন্তু তবু বুড়ো খোকার স্মৃতিটাকে হাতছাড়া করতে মন সায় দেয় না।'

'এটাই স্বাভাবিক। তো চলি আজকের মত। কোন জরুরি দরকার পড়লে টেলিফোন করে জানাতে দ্বিধা করবেন না।'

পায়ে হাঁটা পথ ধরে হোটেলের কাছাকাছি যখন পৌঁছলাম, রাত তখন প্রায় দশটা।

রাতের খাবার সেরে বিছানায় যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলাম। আসাদকে কিছুটা চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'চুপচাপ কি ভাবছ এত, তোমার কি মনে হয় আততায়ী আজ রাতেই আবার হামলা চালাবে?'

'অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা,' দৈনিক জনবার্তা'র কপিটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা খবরের দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল আসাদ।

খবরটা খুব ছোট. কিন্তু বক্স করে দেয়াতে সহজেই চোখে পড়ে। খবরটা এরকমঃ বিখ্যাত শখের গোয়েন্দা আসাদ রহমান ও তার বন্ধু এবং সহকারী হাবিব আখন্দ বর্তমানে এ শহরে। তাদের এখানে আসার কারণ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত।

আসাদের দিকে বাড়িয়ে দিলাম জনবার্তা-টা। 'যেভাবে ছেপেছে তাতে যে কারুরই, এমনকী লিজার আততায়ীরও চোখে পড়ার কথা। সে এখন সতর্ক হয়ে পা ফেলবে।'

'আর তাতে করে আততায়ীকে ফাঁদে ফেলাও কঠিন হয়ে পড়বে।'

'তা ঠিক। এখন একটা কথার জবাব দাও তো? তুমি শুধু শুধু কেন লিজার চাচাতো বোনকে টেলিফোন করতে বললে, বরং উচিত ছিল পুলিশ

পাহারা বসিয়ে দেয়া।'

মুচকি হাসল আসাদ। 'পুলিশ পাহারা বসিয়ে কিছু দিনের জন্য হয়তো বা লিজাকে বিপদমুক্ত রাখা সম্ভব। কিন্তু অনির্দিষ্ট কালের জন্য সেটা সম্ভব নয়। তোমার কথামত যদি পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয় তা হলে হবে কি, যতদিন পুলিশ পাহারা থাকবে আততায়ীও ততদিন ঘাপটি মেরে আশপাশেই কোথাও সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। কারণ সে জানে, একদিন পুলিশ পাহারা উঠে যাবেই। আর সে জানে যে আমরাও এখানে বেশি দিনের জন্য থাকতে আসিনি,' হাই তুলল ও, 'চলো এবার শুয়ে পড়া যাক, বিকেল থেকে তো কম ধকল গেল না,' বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল আসাদ, সেই সঙ্গে আমিও।

পরদিন একটু দেরিতেই ঘুম ভাঙল। উঠে ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে ন'টা। আসাদ অনেকক্ষণ আগেই ঘুম থেকে উঠেছে বলে মনে হলো। ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানছে। আমার ওঠার শব্দ পেয়ে আড়চোখে চাইল একবার। তারপর আবার আগের মত চোখ বন্ধ করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। হাতমুখ ধুয়ে রুম সার্ভিসকে নাশতা আনতে বললাম। বেশ খিদে পেয়েছিল। তাই ডাবল ডিমের ওমলেট, চার স্লাইস মাখন-জেলি লাগানো রুটি আর দুটো বড় সাগর কলা কয়েক মিনিটেই উধাও হয়ে গেল। এবার আয়েশ করে চায়ে চুমুক দিলাম। 'আজ কি কাজ আমাদের?'

আমার কথায় যেন তন্দ্রাভঙ্গ হলো আসাদের। 'প্রথমে লিজার বন্ধু-বান্ধবদের একটু বাজিয়ে দেখা দরকার। এরপর আরও কয়েকটা কাজ আছে, পথে যেতে যেতে বলব।'

কাপড়চোপড় পরে তৈরি হয়ে নিলাম। প্রথমে রিয়ার সঙ্গে দেখা করব।

হোটেল থেকে রিয়ার বাড়িতে হেঁটে যেতে সময় লাগল প্রায় বিশ মিনিট। বাইরে থেকে বাড়িটা বেশ বড় বলে মনে হলো। কলিং বেল টিপতেই অল্পবয়সী একটা কাজের মেয়ে বেরিয়ে এল। আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে রিয়াকে ডেকে দিতে বললাম। ড্রইংরুমে আমাদের বসিয়ে ভেতরে চলে গেল সে।

একটু পর পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা মেয়ে ঘরে ঢুকে সালাম জানাল আমাদের। বুঝতে কষ্ট হলো না, এরই নাম রিয়া। আসাদ সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়ে, আমাকে পরিচয় করিয়ে চট্ করে কাজের কথায় চলে গেল। 'আমরা ঢাকা থেকে কয়েকদিন আগে এসেছি। একটা বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে আপনার কাছে আসতে হয়েছে।'

স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পেল মেয়েটার চেহারায়। কিন্তু সেটা মুখে প্রকাশ না করে বলল, 'আপনাদের নাম এর আগে কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। ভেবেই পাচ্ছি না, আমার মত সাধারণ এক মেয়ের কাছে আপনাদের কি দরকার থাকতে পারে,' আড়চোখে হাতঘড়ির দিকে একবার তাকাল রিয়া।

'ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। আপনি যদি দয়া করে আমাদের একটু সময় দেন...,' রিয়ার তড়িঘড়ি ভাব দেখে একটু যেন বিরক্তই হলো আসাদ।

আসাদের কথায় এবারে যেন লজ্জা পেয়ে গেল রিয়া। 'কোন তাড়া নেই আমার। আপনারা সুস্থির হয়ে বসুন। যা বলার ধীরে-সুস্থে বললেই হবে। তার আগে চায়ের কথা বলে আসি,' উঠে গেল সে।

রিয়াকে মোটামুটি সুন্দরীই বলা যায়। হালকা ছিপছিপে গড়ন। গায়ের রং বেশ ফর্সা। চোখ দুটোতে সম্মোহনী দৃষ্টি। কথাবার্তায়ও বেশ চটপটে। একটু পর ফিরে এল ও। পেছন পেছন চায়ের ট্রে হাতে কাজের মেয়েটাও ঢুকল। আমাদের দিকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিল ও। 'এবার বলুন তো, কি এমন জরুরি কথা?'

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল আসাদ। 'তা হলে গোড়া থেকেই আরম্ভ করি। কাল বিকেলে আপনার বান্ধবী লিজার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। হোটেলের লনে বসে আলাপ করছিলাম আমরা। সে সময় কেউ একজন ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। ভাগ্য খুবই ভাল বলতে হবে, গুলিটা ওর মাথায় না লেগে হ্যাট ফুটো করে বেরিয়ে গেছে।'

বিস্ময়ে দু-চোখ যেন কপালে উঠল রিয়ার। 'বলেন কি! এবার তা হলে সত্যি সত্যিই হামলা হয়েছে? নাকি এটাও গুলগপ্পো?'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল আসাদ। রিয়ার শেষ কথাটায় বোধহয় একটু বিরক্তই হয়েছে সে। 'পিস্তল থেকে ছোঁড়া গুলিটা লনের ঘাসের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি আমি। কোন সন্দেহ নেই, ঐগুলিটাই লিজার হ্যাট ফুটো করে বেরিয়ে গেছে।'

'আপনি কি নিশ্চিত?'

'হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট। গুলিটা আততায়ীই ছুঁড়ছে। লিজার কপাল ভাল। এবারেও বেঁচে গেছে।'

'কিন্তু কেন ওকে কেউ খুন করতে চাইছে–আততায়ীর অন্তত একটা মোটিভ তো থাকা চাই! অগাধ টাকা-পয়সা কিংবা প্রচুর সম্পত্তি–কোনটাই নেই ওর।'

'কিন্তু তবু ওর উপর হামলা হয়েছে–এবং আমাদের উপস্থিতিতেই

হয়েছে সেটা।'

'আপনি যা-ই বলুন না কেন, আজগুবি গল্প ফাঁদতে জুড়ি নেই লিজার। বেশ ক'দিন আগে, হঠাৎ সাত সকালে বাসায় এসে হাজির। বলে কিনা, মাথার কাছে টাঙানো অয়েল-পেইন্টিংটার কর্ড ছিঁড়ে সেটা নাকি পড়তে যাচ্ছিল ওর মাথায়। নেহায়েত বরাতজোরে বেঁচে গিয়েছে। এ ঘটনার কয়েকদিন পর আবার শুনলাম, ও সী-বীচের দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় টিলা থেকে কে নাকি একটা বড় পাথরের চাঁই গড়িয়ে দিয়েছিল ওর দিকে। ভাগ্য ভাল যে, সেটা গায়ে লাগতে লাগতেও লাগেনি। দিন চার-পাঁচেক আগের ঘটনাটা আরও মজার। ওর গাড়ির ব্রেক নষ্ট করে রেখেছিল কেউ। এতে প্রায় অ্যাক্সিডেন্ট হতে হতে নাকি বেঁচে গিয়েছে ও। আর আজ শুনলাম এই হ্যাট সমাচার।'

'তার মানে, সত্যি সত্যিই যে এ ঘটনাগুলো ঘটেছে, সে কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, আপনার?'

'আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না। তবে লিজার কোন কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করা কঠিন। সাদামাঠা কোন ঘটনা ও এমনভাবে রঙ চড়িয়ে বলে যে শুনলে মনে হবে যেন সাংঘাতিক কিছু। এই ঘটনাগুলোর কথাই ধরুন না: চার-চারটে হামলা হয়ে গেল অথচ ওর গায়ে আঁচড়টাও লাগল না!'

'ভাগ্য ওর সহায় ছিল, তাই প্রতিবারই বেঁচে গিয়েছে। কিন্তু তাই বলে ওকে মিথ্যেবাদী বলাটা বোধহয় ঠিক নয়। আর কাল যা ঘটল তার সাক্ষী তো আমি নিজেই।'

'যাকগে। এখন বলুন এ ব্যাপারে আমি কি সাহায্য করতে পারি?'

'আপনি তো লিজার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের একজন। গুলির ব্যাপারটায় আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?'

'উহুঁ; আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না ওকে খুন করতে যাবে কে, আর তাতে লাভই বা কি?'

'অনেক সময় বৈষয়িক লাভ-লোকসান ছাড়াও একজন আরেকজনকে খুন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে মোটিভ হিসেবে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক কারণ দাঁড় করানো হয় যেমন, প্রতিহিংসা, প্রেম, ঈর্ষা ইত্যাদি...।'

'এ ক্ষেত্রে তেমন কিছু থেকে থাকলেও আমার তা জানা নেই।'

'আচ্ছা, লিজার কি কারো সঙ্গে বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে?'

'ওকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সঙ্গে ঘুরতে দেখা যেত। কখনো ক্যাপ্টেন হোবার্টের সঙ্গে, কখনো বা রবার্টের সঙ্গে। এ ছাড়া মাঝেমধ্যে

চট্টগ্রাম থেকেও কেউ কেউ এসে আড্ডা জমাত। বলতে গেলে বাড়িতে ও একা। এ ছাড়া নেই কোন অভিভাবক। সুতরাং বুঝতেই পারছেন... ।'

বেশ বুঝতে পারছি, রিয়ার ইঙ্গিতপূর্ণ কথাগুলো পছন্দ হচ্ছে না আসাদের। তবু মনের ভাব মুখে প্রকাশ না করে আগের কথার খেই ধরল সে, 'আপনি যে দুজনের কথা বললেন তার মধ্যে হোবার্টের নাম আগেই শুনেছি, কিন্তু এই রবার্টটা কে?'

'কাগজে ওর নাম দেখেননি? ও-ই তো গ্লাইডারে চেপে বঙ্গোপসাগরে চক্কর দিতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে। বাবা নেই। কোটিপতি দাদার কাছেই মানুষ। সেই দাদাও মারা গেছেন অল্প কিছুদিন আগে।'

'যাক এবারে অন্য কথায় আসি। এ বাড়িতে কি আপনি একলাই থাকেন?'

'হ্যাঁ, অনেকটা তাই। একটা কাজের মেয়ে আছে। আর আছে দারোয়ান। বাবা মারা গেছেন বছর দুয়েক আগে। কাঠের ব্যবসা ছিল ওঁর। পৈত্রিকসূত্রে পেয়েছি এই বাড়িটা আর সেই সঙ্গে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স। মোটামুটি সচ্ছলভাবেই চলে যায়।'

'এতবড় বাড়িতে একা থাকতে ভয় লাগে না?'

'না। ছেলেবেলা থেকেই এভাবে একা থাকতে অভ্যস্ত আমি। মা মারা গেছেন সেই ছেলেবেলায়। আর বাবাও ব্যবসার কাজে ভীষণ ব্যস্ত থাকতেন। আমাকে বেশিরভাগ সময়েই থাকতে হত বুয়ার কাছে। একটু বড় হয়ে একা একা থাকতে শিখলাম। আর তখন থেকেই ভয়-ডরটা একটু কম আমার।'

'ভাল কথা, নিরাপত্তার জন্য আপনি কি বাড়িতে পিস্তল কিংবা অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্র রাখেন?'

'না, তো!' একটু যেন অবাকই হয়েছে রিয়া।

'আপনার জানামতে এই এলাকায় কারো কি পিস্তল কিংবা রিভলবার আছে?'

'লিজার একটা পিস্তল আছে, শুনেছি। এ ছাড়া আর কারো কোন আগ্নেয়াস্ত্র আছে কিনা, ঠিক জানা নেই আমার। কিন্তু এসব কথা কেন জানতে চাইছেন, বলুন তো?'

'কাল লিজার বাসায় গিয়েছিলাম। কথায় কথায় জানলাম ওর একটা পিস্তল আছে। জিনিসটা দেখতে চাইলাম। কিন্তু পিস্তলটা যেখানে রাখা ছিল সেখান থেকে জিনিসটা বেমালুম গায়েব! অথচ পিস্তলটা দিন দুয়েক আগেও নাকি যথাস্থানে ছিল।'

'আপনার কি ধারণা আততায়ী ঐ পিস্তল দিয়েই লিজাকে গুলি করেছে?'

'অসম্ভব কিছু নয়। আজ তা হলে উঠি। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা। যদি সম্ভব হয় লিজার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।'

'বেশ। চেষ্টা করব।'

রিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আবার লিজার বাড়ির দিকে রওনা হলাম। মি. ও মিসেস ডি কস্টার সাথে দেখা করতে হবে।

লিজার বাড়ির পেছন দিকটায় তিনটে আধাপাকা ঘর নিয়ে ডি কস্টারা থাকেন। আমরা বাড়ির পেছন দিকটায় যাবো ভাবছি, এমন সময় লম্বামত একজন লোক এগিয়ে এল আমাদের দিকে। কোনরকম ভণিতা না করে লোকটাকে জিজ্ঞেস করল আসাদ, 'আচ্ছা, এখানে মি. ডি কস্টার বাসা কোন্‌টা বলতে পারেন?'

'আমিই যোসেফ ডি কস্টা। কি প্রয়োজন বলুন তো?'

'ইয়ে...আমার নাম আসাদ রহমান। শখের গোয়েন্দা। আর ও হাবিব আখন্দ, আমার বন্ধু। একটা বিশেষ প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছি।'

'আপনিই আসাদ রহমান?' যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না যোসেফের, 'কী সৌভাগ্য আমার! পত্র-পত্রিকায় অনেক পড়েছি আপনার কথা। কিন্তু এভাবে চাক্ষুস দেখা হয়ে যাবে তা ভাবিনি কখনো। চলুন, বাসার দিকে যাওয়া যাক।'

বাসার কাছাকাছি পৌঁছে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল যোসেফ। হঠাৎ কেউ শিস দিল। একটু পর আরও একবার শিসের শব্দ শোনা গেল। দু-তিন মিনিট পর ফিরে এল যোসেফ। আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে বাসার ভেতরে ঢুকল। ড্রইংরুমে ঢুকতেই হুইল চেয়ারে বসা এক মহিলার সঙ্গে চোখাচোখি হলো। যোসেফ পরিচয় করিয়ে দিল, 'মিলি, ইনি হচ্ছেন এ দেশের শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ আসাদ রহমান। আর উনি ওঁর বন্ধু হাবিব আখন্দ।'

'আপনার অদ্ভুত সব রহস্যভেদের কথা অনেক পড়েছি পত্র-পত্রিকায়। কী সৌভাগ্য! সেই মানুষটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আজ,' কণ্ঠে একরাশ উচ্ছ্বাস মিলির।

খুচরো আলাপ জমাতে জুড়ি নেই আসাদের। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ জমিয়ে ফেলেছে মিলির সঙ্গে। 'আপনার এই দুর্ঘটনাটা ঘটেছিল কবে?'

'প্রায় বছর দুয়েক আগে,' বোধহয় অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল

মিলি, 'চিটাগাং থেকে নাইট কোচে ঢাকা যাচ্ছিলাম। আমাদের বাসটা একটা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছিল প্রায় বিশ ফুট গভীর একটা খাদে। ওই অ্যাক্সিডেন্টে মারা পড়েছিল প্রায় দশ-বারো জন। আমি প্রাণে বাঁচলাম ঠিকই কিন্তু জন্মের মত পঙ্গু হয়ে গেলাম। কয়েকজন বিশেষজ্ঞকেও দেখিয়েছি। বিদেশে নাকি এর চিকিৎসা সম্ভব। কিন্তু আমাদের বিদেশ যাবার মত সামর্থ্য কোথায়?'

ছোট একটা কাজের মেয়ে ট্রে-তে করে চা নিয়ে এল। সাথে বিস্কুট। চায়ের কাপে চুমুক দেয়ার ফাঁকে ফাঁকে যোসেফের সঙ্গে কথা বলছে আসাদ। আমি ভাবছি মিলির কথা। ভদ্রমহিলার বয়স কতই বা, বড়জোর চল্লিশ। শরীর-স্বাস্থ্যও ভাল। শুধুমাত্র এই অ্যাক্সিডেন্টের জন্যেই বাকি জীবনটা হয়তো হুইল চেয়ারকে অবলম্বন করেই কাটাতে হবে ওর–ভাবতেও কষ্ট হয়।

এদিকে কথায় কথায় লিজার প্রসঙ্গ তুলল আসাদ। 'আচ্ছা, গত কিছুদিনের মধ্যে পরপর তিনটে দুর্ঘটনা ঘটেছিল লিজার। এ ব্যাপারে আপনারা কি কিছু জানেন?'

'হ্যাঁ, লিজার কাছে শুনেছি,' বলল যোসেফ।

'আমার মনে হয়, ওগুলো স্রেফ দুর্ঘটনা নয়, লিজাকে খুন করার প্রচেষ্টাও হতে পারে।'

'বলছেন কি আপনি?'

'হ্যাঁ, তাই,' কাল বিকেলের ঘটনাটা খুলে বলল আসাদ।

চোখ বড়বড় হয়ে গেল যোসেফের। 'তা হলে তো এখন থেকেই লিজার সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত।'

'এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আপনাদের সাহায্য দরকার হবে। আপাতত লিজার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন।'

'বেশ। কিন্তু ব্যাপারটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। কেউ হঠাৎ করে লিজাকে খুন করতে চাইবে কেন?'

'আমারও সেই একই প্রশ্ন। আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, লিজার কি কারো সঙ্গে প্রেম-ট্রেম আছে?'

'ঠিক জানি না,' বলল যোসেফ।

'জানি না বললেই হলো!' ফুঁসে উঠল মিলি, 'আজ এর সঙ্গে কাল ওর সঙ্গে তো ঘুরছেই। মাঝে মধ্যে আবার চট্টগ্রাম থেকে কেউ কেউ এসে রাত কাটিয়ে...।'

'চুপ করো তুমি,' ধমক দিয়ে মিলিকে থামিয়ে দিল যোসেফ।

দুজনের কথা কাটাকাটির মাঝখানে আবার জিজ্ঞেস করল আসাদ, 'অপারেশনের আগেও নাকি একটা উইল করেছিল?'

'হ্যাঁ, আমরাই এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছিলাম। অপারেশনের ব্যাপার, বলা তো যায় না?'

ডি কস্টাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তখনকার মত বিদায় নিয়ে চলে এলাম আমরা। রাস্তায় হাঁটছি দুজন। টুকটাক কথাবার্তাও চলছে। 'ডি কস্টাদের তোমার কাছে কেমন মনে হলো?'

'ভালই তো। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেশ অমায়িক। ছিমছাম পরিবার। কেন, তুমি ওদের মধ্যেও সন্দেহ করার মত কিছু পেলে নাকি?'

'ওদের বাসায় ঢোকার আগে দু-বার শিসের শব্দ ভেসে এসেছিল।'

'কি হয়েছে তাতে? সবকিছুতেই সন্দেহ করার একটা বাতিক আছে তোমার।'

ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসির রেখা খেলে গেল আসাদের। 'বাতিক বলো, আর যা-ই বলো, ওদের ওখানে কিছু একটা ব্যাপার আছে। আমি কিন্তু বিপদের গন্ধ পাচ্ছি, হাবিব। হিসেবে ভুল না হয়ে থাকলে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে অঘটন একটা ঘটবেই।'

'সে যখন ঘটবে তখন দেখা যাবে। এখন চলো, থানা থেকে একটা চক্কর দিয়ে আসি,' ওর ডান হাতটা নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে তাড়াতাড়ি থানায় উদ্দেশে হাঁটতে লাগলাম।

তিন

কক্সবাজার থানার ইন্সপেক্টর জাফর তালুকদার আমাদের পুরনো বন্ধু। আমরা রুমে ঢুকতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। 'আরে! কি সৌভাগ্য আমার! এ যে দেখছি মণি আর কাঞ্চন একই সঙ্গে,' দুজনকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল ও।

'তোমার সঙ্গে দেখা হলেই পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়,' বলল আসাদ।

'আমার কিন্তু আরও বেশি করে মনে পড়ে তোমার সেই অদ্ভুত সব রহস্যভেদের কথা। যাকগে, এখন কি জন্য এসেছো তাই বলো। স্রেফ হাওয়া বদল, নাকি এখানেও আবার...।'

'ঢেকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে,' হাসতে হাসতে বললাম।

কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল জাফরের। 'কেন, অঘটন কিছু ঘটেছে নাকি কোথাও?'

ঘটনার আগাগোড়া জাফরকে খুলে বলল আসাদ।

সব কথা শুনে কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল জাফর। 'তা হলে এক কাজ করা যেতে পারে। লিজার বাড়িতে পুলিশ পাহারা বসিয়ে দিই।'

'না, এতে করে আততায়ী সতর্ক হয়ে যাবে।'

'তা হলে কি করতে চাও, তুমি?'

'আমি চাই,' বলল আসাদ, 'আততায়ীকে আপাতদৃষ্টিতে সহজ সুযোগ করে দিতে। নইলে তাকে পাকড়াও করা সহজ হবে না। লিজার চাচাতো বোন আজকালের মধ্যে এসে পড়বে। তখন ও-ই পাহারা দেয়ার দায়িত্বটা নেবে। তার আগে পর্যন্ত ওকে সতর্ক হয়ে চলাফেরা করার জন্য বলেছি।'

'কিন্তু ব্যাপারটায় ঝুঁকি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

'আমার তা মনে হয় না। কারণ, দেখো, আততায়ীর প্রতিটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবার পর তার পরবর্তী প্রচেষ্টার মধ্যে তিন-চার দিনের গ্যাপ আছে।

আর এর কারণটাও খুব সহজ। একটা পরিকল্পনা ভেস্তে যাবার পর আরেকটা তৈরি করতে সময় লাগছে।'

'হুঁ; তা হলে এখন কি করতে পারি আমরা?'

'চুপচাপ চোখ কান খোলা রাখা ছাড়া আপাতত আর কিছুই করার নেই আমাদের।'

'আচ্ছা, তুমি যে সবার কাছেই কালকের ঘটনাটা বলে বেড়াচ্ছো, এটা কি ঠিক হচ্ছে?' এবারে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আততায়ীকে তাড়াতাড়ি আঘাত হানার জন্য উসকে দিতে হবে। ঘটনাটা যত বেশি জানাজানি হচ্ছে, আততায়ীর পক্ষে নিরিবিলিতে কাজ সারা ঠিক ততই কঠিন হয়ে পড়ছে। আমি একরকম নিশ্চিত, আগামী দুই-এক দিনের মধ্যে আততায়ী তার নতুন পরিকল্পনা কার্যকর করার চেষ্টা চালাবে। আর হ্যাঁ, যেহেতু ঘটনার সঙ্গে আমরা জড়িয়ে পড়েছি তাই তাড়াতাড়ি এর সমাধান করতে হবে। কারণ ঢাকার কাজকর্ম ফেলে রেখে খুব বেশিদিন এখানে থাকা কিছুতেই আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।'

'বেশ, তুমি যা ভাল মনে করো তাই হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের করনীয় কি হওয়া উচিত?' জিজ্ঞেস করল জাফর।

'সন্দেহজনক সবার সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং যাদের ওপর সন্দেহটা বেশি পড়বে তাদের চোখে চোখে রাখা। কিন্তু আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে। এখন পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে কোন অঘটন ঘটেনি। তাই লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খেপিয়ে তোলা চলবে না।'

'ঠিকই বলেছো; তা হলে এখন কি করতে চাও?'

'ভাবছি দুপুরের খাওয়া সেরে চট্টগ্রাম যাব। কপাল ভাল হলে সেখানে আমাদের এক ''বন্ধু''র সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। জাফর, তোমার জীপটা কি পাওয়া যাবে?'

আসাদের কথায় সম্মতি জানাল জাফর। ওকে জোর করে সঙ্গে নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম আমরা। খেলাম তিনজন একসঙ্গে। আসাদের পীড়াপীড়িতে আমাদের সাথে চট্টগ্রাম যেতে রাজি হলো জাফর।

চট্টগ্রামে পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। লিজার মামাতো ভাই অ্যালবার্টকে পাওয়া গেল ওর অফিসেই। আসাদ নিজের ভিজিটিং কার্ডটা ভেতরে পাঠিয়ে দেয়ার মিনিট দুয়েক পর ডাক পড়ল আমাদের।

চট্টগ্রাম আসার পথে কথায় কথায় আসাদ বলল, এখানে আসার মূল কারণ লিজার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করা।

অ্যালবার্টের অফিস রুমে ঢুকলাম আমরা। সৌজন্য বিনিময়ের পর চট্ করে কাজের কথায় চলে গেল আসাদ। কালকের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল ওকে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মুখ খুলল অ্যালবার্ট, 'এভাবে একলা না থাকার জন্য লিজাকে অনেকবার বকাঝকা করেছি। কিন্তু কে কার কথা শোনে!'

'এ ব্যাপারে আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?'

'না, আসলে পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন আজগুবি মনে হচ্ছে।'

'কাল এ ঘটনার পর টেলিফোনে আপনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু লাইন পাইনি। হাজার হোক কাছের অভিভাবক বলতে আপনি ছাড়া আর তো কেউ নেই ওর।'

'কাল বিকেলে জরুরি একটা কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল। ওখান থেকে অফিসে না ফিরে সোজা বাসায় চলে গিয়েছিলাম। যাক, ঘটনা সত্যি-মিথ্যে যা-ই হোক না কেন, আমি আজকালের মধ্যে অবশ্যই লিজার ওখানে যাব।'

কাল সারাদিন আসাদ আর আমি তো একসঙ্গেই ছিলাম। কই, অ্যালবার্টকে টেলিফোন করার কথা তো শুনিনি! ডাহা গুল!

এতক্ষণ ওদের কথা চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল জাফর। এবারে মুখ খুলল সে, 'আমার কাছে পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে, আসাদ,' অ্যালবার্টের দিকে চেয়ে গম্ভীরভাবে বলল, 'চট্টগ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে আমাদের জানিয়ে তবে যাবেন।'

উঠে পড়লাম আমরা। অ্যালবার্ট আমাদের জীপ পর্যন্ত এগিয়ে দিল ঠিকই, কিন্তু চেহারায় আগের সেই হাসিখুশি ভাবটা নেই। কিছুটা যেন চিন্তিতও মনে হচ্ছে ওকে। জীপ স্টার্ট নেয়ার মুহূর্তে জিজ্ঞেস করল ও, 'লিজার আততায়ী হিসেবে আমাকেও কি সন্দেহ করেন নাকি আপনারা?'

'যদি করিই, তা হলে কি খুব অন্যায় হবে? লিজা মারা গেলে আর কারোর কোন লাভ না হলেও আপনার কিন্তু আর্থিক লাভ হবে,' বলল জাফর।

'কিন্তু আমিই যে ওর ওপর হামলা চালিয়েছি এমন কোন প্রমাণ আছে, আপনার হাতে?' চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল অ্যালবার্ট।

'প্রমাণ নেই, তবে আপনাকে সন্দেহ করার মত অনেক কারণ আছে।'

'যেমন?' আরও চড়লো অ্যালবার্টের গলা।

'আপাতত একটাই শুনে রাখুন, কাল ঐ ঘটনাটা যখন ঘটে সে সময় আপনি আপনার চেম্বারে ছিলেন না,' গম্ভীর গলায় বলল জাফর। আমাদের দুজনকে টেনে নিয়ে জীপে উঠাল ও। ড্রাইভার স্টার্ট দিল। পেছন ফিরে চাইলাম। অ্যালবার্ট তখনো দাঁড়িয়ে। জাফরের কথায় চেহারাটা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেছে বেচারার।

'দিলে তো লোকটাকে খামকা ভয় পাইয়ে!'

'একটু শিক্ষা হোক। ব্যাটা এমনিতেই উকিল। তার ওপর কথায় কথায় চোখ পাকাচ্ছিল। গা-টা জ্বলে যাচ্ছিল আমার। তাই দিলাম ঠাণ্ডা করে,' হাসতে হাসতে বলল জাফর।

যদিও নভেম্বর মাস তবু শীতের তীব্রতা তেমন নেই। তবে কুয়াশার জন্য দূরের কোনকিছু স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না। অসমতল পথের মাঝেমধ্যেই এবড়োথেবড়ো গর্ত। এগুলোর কোন কোনটায় পড়ে গিয়ে আবার লাফিয়ে উঠছে জীপ। সড়ক দুর্ঘটনার জন্য আদর্শ রাস্তা! কিন্তু ড্রাইভারের হাত পাকা এত বিপজ্জনক রাস্তাতেও তীরবেগে ছুটিয়েছে জীপ।

কক্সবাজার যখন পৌছলাম রাত তখন প্রায় এগারোটা। জাফর আমাদের হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেল থানায়।

ঘুম থেকে উঠতে বেশ বেলা হয়ে গেল। দুজনেই ঝটপট হাতমুখ ধুয়ে নাশতা সেরে নিলাম। কাপড় পরতে লাগল আর দশ মিনিট। আজ প্রথমেই যেতে হবে রিয়ার বাসায়। কাল রাতে শুতে যাবার আগে প্রোগ্রাম ঠিক করে রেখেছে আসাদ।

হোটেল থেকে বেরিয়ে রিয়ার বাড়ির পথ ধরেছি। সোমবারের সকাল। তাই কক্সবাজারের মত ছোট্ট শহরেও কর্মচাঞ্চল্যের কমতি নেই। পরিষ্কার আকাশ। রোদ উঠেছে তেতেমেতে। তবু সকালবেলার শীতের আমেজটা এখনো পুরোপরি মিলিয়ে যায়নি।

রিয়া বাড়িতেই ছিল। এত তাড়াতাড়ি আমাদের আবার আশা করেনি বোধহয়, চোখমুখ দেখে অন্তত সেরকমই মনে হলো। 'কি ব্যাপার, আসাদ সাহেব, আজ এত সকাল সকাল যে? কোন অঘটন ঘটল নাকি?'

'না, না, অঘটন ঠঘটন কিছু নয়। এদিক দিয়েই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে একটু দেখা করে যাই।'

'যাক, তা-ও ভাল। আমি ভেবেছিলাম লিজার ওপর নতুন করে আবার হামলা হলো নাকি! এখন বলুন, কি খাবেন, চা না কফি?'

'এ সময় কফি হলেই বোধহয় বেশি ভাল লাগবে,' বলল আসাদ।

কফি এল। সঙ্গে ঘরে তৈরি কেক। রিয়া বানিয়েছে। ওর কেকের খুব

তারিফ করল আসাদ-যদিও আমার কাছে কেকটা তেমন সুবিধের ঠেকল না। আসাদ কি সত্যিই প্রশংসা করল, নাকি রিয়াকে পটিয়ে কথা বের করার ফন্দি!

যা ভেবেছি, ঠিক তাই। কিছুক্ষণের মধ্যে নানারকম গল্পে মশগুল হয়ে গেল ওরা দুজন। কথা আর তুবড়ি ছুটেছে যেন রিয়ার মুখ দিয়ে। 'আসলে যা-ই বলুন না কেন, লিজার ঐ সমস্ত দুর্ঘটনা-গুলোকে কেমন যেন কাল্পনিক বলে মনে হয়।'

'কিন্তু পিস্তল থেকে গুলি ছোঁড়ার ঘটনাটা তো আরও কাল্পনিক নয়-ব্যাপারটা ঘটেছে আমাদের সামনেই।'

ওদের দুজনের আলাপের ফাঁকে টেবিলে রাখা 'দৈনিক জনবার্তা'টা হাতে নিয়ে চোখ বুলাতে লাগলাম। একটা খবরের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল। গ্লাইডারে চেপে রবার্ট সিনহা নামের যে ভদ্রলোক বঙ্গোপসাগরে চক্কর দিতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছেন, এখন পর্যন্ত তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। খবরটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রিয়াকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভদ্রলোককে আপনিও তো চেনেন?'

'চিনি মানে? খুব ভাল করেই চিনি। কোটিপতির দাদার বাইগুলে নাতি হলে যা হয়। দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে আর মেয়ে বন্ধুদের পেছনে টাকা খরচ করতে জুড়ি নেই ওর। মাঝে মধ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত সব খেয়াল চাপে ওর মাথায়। একবার একাই কক্সবাজার থেকে তেতুঁলিয়া পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়েছিল। কয়েক বছর আগে এক মোটর র‍্যালিতে অংশ নিয়েছিল। ইরান থেকে গাড়ি চালিয়ে কক্সবাজার এসেছিল। তবে এবারের পাগলামিটা ছিল বাড়াবাড়ি রকমের। সবাই বারণ করেছিল। কিন্তু কারো কথায় কান দেয়নি ও...।'

ক্রিং ক্রিং শব্দে কলিং বেল বেজে উঠল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল রিয়া। 'আরে, তোমরা হঠাৎ এ সময়ে!' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা দুজন আগন্তুককে দেখে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেল ও। দুজনেরই বয়স হবে ত্রিশের কিছু বেশি। আমাদের দিকে ফিরে লোক দুজনের উদ্দেশে বলল রিয়া, 'পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি আসাদ রহমান। উনি ওর বন্ধু, হাবিব আখন্দ। আর এ হচ্ছে আমার বন্ধু ফিরোজ নিজামী, ও হলো ক্যাপ্টেন হোবার্ট।'

পরিচয়-পর্ব শেষ হবার পর আরেক দফা কফি এল। বেশ আলাপ জমে উঠল রিয়ার বন্ধু দুজনের সঙ্গে। লিজার ঘটনাটা এরই মধ্যে বলা হয়ে গেছে। সবকিছু শোনার পর বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল ওরা। ফিরোজ

বলল, 'কিন্তু পুলিশ পাহারা ছাড়া লিজার একলা থাকা কি ঠিক হচ্ছে।?'

'কিংবা আরেক কাজ করলেও হয়। ওকে কয়েক দিনের জন্য চট্টগ্রামের ওর চাচাতো বোনের কাছে পাঠিয়ে দেয়া যেতে পারে,' পরামর্শ দিল হোবার্ট।

'আততায়ীকে পাকড়াও করতে হলে তাকে সুযোগ দিতে হবে। তা ছাড়া লিজাকে বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দিলে কিছুদিনের জন্য হয়তো নিস্তার পাওয়া যাবে। কিন্তু এতে করে সমস্যার সমাধান হচ্ছে কই? এখানে এলেই যে আমার ওর ওপর হামলা হবে এ আমি হলফ করে বলতে পারি। তাই লিজাকে পাহারা দেয়ার চেয়ে খুনীকে জলদি পাকড়াও করার চেষ্টা করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ,' বলল আসাদ।

'আপনি কি এ ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করেন?' জিজ্ঞেস করল হোবার্ট।

'না। এখনও তেমন কোন প্রমাণ জোগাড় করতে পারিনি। তবে এটা ঠিক, বাইরের কেউ নয়, আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই আততায়ী গা ঢাকা দিয়ে আছে।'

কথার ফাঁকে ওদের দুজনকে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। ফিরোজ নিজামীকে প্রথম দেখায় যে কারোর ভাল লাগতে বাধ্য। গায়ের রং ফর্সা। চেহারায় শিশু সুলভ সারল্য। কথাবার্তায় আগাগোড়াই মার্জিত। চট্টগ্রামে পেইন্টিংয়ের একটা দোকান আছে ওর। দোকানটা ও আর ওর বাবা চালায়।

চেহারা ও আচার-ব্যবহারে ফিরোজের সঙ্গে কোন মিলই নেই হোবার্টের। চেহারাটা রুক্ষ। কথাবার্তায় কিছুটা উদ্ধত। ওর বাবা এ-দেশী খৃষ্টান। বিয়ে করেছিল ইংল্যাণ্ডে গিয়ে। কিন্তু বেশিদিন টেকেনি বিয়েটা। ছাড়াছাড়ির পর দেশে ফিরে আসে ওর বাবা। তখন ওর বয়স মাত্র পাঁচ বছর। বাবা মারা গিয়েছে বছর তিনেক আগে। বর্তমানে একটা প্রাইভেট কোম্পানির জাহাজে ক্যাপ্টেন হিসেবে কাজ করছে হোবার্ট। কেন জানি না, ওকে বেশ ভাল লেগে গেল আমার।

এ-কথা সে-কথার পর প্রাসঙ্গিক আলাপে চলে এল আসাদ। 'আচ্ছা, আপনাদের কারও কি পিস্তল কিংবা রিভলবার আছে।?'

'না তো!' কণ্ঠে বিস্ময় প্রকাশ পেল ফিরোজের।

'আমার একটা মাউজার পিস্তল আছে,' একটু কেশে নিয়ে বলতে আরম্ভ করল হোবার্ট, 'জাহাজে মাঝেমধ্যে ওটার দরকার হয়ে পড়ে। অবাধ্য ক্রু-দের বশে আনতে বেশ কাজে দেয় জিনিসটা। এ-ব্যাপারে কোম্পানির

অনুমতি নেয়া আছে।'

'পিস্তলটা কি সঙ্গেই রাখেন সবসময়?'

'হ্যাঁ; দেখুন না!' বুশ শার্টের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে জিনিসটা বের করে আনল হোবার্ট।

কালো রঙের মাউজার। দেখে মনে হয় জিনিসটা নতুন। আসাদ পিস্তলটা নেড়েচেড়ে দেখতে দেখতে বলল, 'আপনার যদি অসুবিধা না হয় তাহলে কয়েকদিনের জন্য পিস্তলটা আমি সঙ্গে রাখতে চাই।'

ভ্রু কুঁচকে গেল হোবার্টের। বোঝা গেল বেশ বিরক্ত হয়েছে ও। তবু ভদ্রতা বজায় রেখে বলল, 'বেশ, কিন্তু কেন, বলুন তো?'

'ঢাকা থেকে আসার সময় ভুলে আমার রিভলবারটা ফেলে এসেছি। আততায়ী জানে, শেষ দেখা না দেখে এখান থেকে নড়ব না আমি। তাই আমার উপরও এক–আধটা হামলা এলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। নিরাপত্তার জন্য এটা নিয়ে রাখলাম আপনার কাছ থেকে।'

আসাদের কথায় হোবার্ট আশ্বস্ত হয়েছে বলে মনে হলো। কিন্তু আমি জানি, ডাঁহা গুল মেরেছে আসাদ। আসার সময় নিজহাতে ওর রিভলবারটা ব্রিফকেসে ঢুকিয়েছি। মাউজারটা হাত করার পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। একটু পর ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম। বাইরে এসে লিজার বাড়ির উদ্দেশে পা বাড়ালাম আমরা।

দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে ছিল লিজা। আমাদের দেখতে পেয়ে দৌড়ে নিচে এসে দরজা খুলে দিল। এই দু'দিনে যেন বয়স কয়েক বছর বেড়ে গিয়েছে ওর। 'কি ব্যাপার! আপনাকে এত শুকনো দেখাচ্ছে কেন?' জিজ্ঞেস করলাম।

'সেদিনের পর থেকে কোনকিছুই ভাল লাগছে না আর। বাইরেও তেমন একটা বেরুইনি। কেবলই ভয় হচ্ছে, আততায়ী এই বুঝি আবার হামলা চালাল!'

'মৃত্যুকে বুঝি ভীষণ ভয় পান আপনি!' হাসতে হাসতে বললাম।

'মৃত্যুকে যত না ভয় পাই, তার চেয়ে বেশি ভয় পাই মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে থাকাকে,' দার্শনিকের মত বলল লিজা।

পকেট থেকে হোবার্টের পিস্তলটা বের করে লিজার দিকে বাড়িয়ে ধরল আসাদ, 'দেখুন তো, এটা আপনার সেই পিস্তল কিনা?

'না, আমারটা আরও পুরনো। কোথায় পেলেন এটা?'

সত্যি কথা গোপন করে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল আসাদ, কিন্তু তার আর দরকার পড়ল না। সামান্য দূরে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল ক্রিং

ক্রিং শব্দে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল লিজা। মিনিট পাঁচেক কথা বলার পর ফিরে এল। 'আমার চাচাতো বোনের টেলিফোন। কাল সকালের মধ্যেই এখানে এসে যাবে ও। ঘটনাটা কি জানার জন্য সেদিনও খুব পীড়াপীড়ি করিছিল। আর আজ তো টেলিফোন ছাড়বেই না। শেষে বাধ্য হয়ে বললাম–তোকে একটা সারপ্রাইজ, দেব, তাই এখন কিছুই বলা যাবে না। ও অবশ্য কিছু একটা আঁচ করেছে বলে মনে হয়। বারবার জিজ্ঞেস করছিল–"তোর কোন বিপদ-আপদ হয়নি তো?"

'আসল কথা গোপন করে ভালই করেছেন। নইলে ভয় পেয়ে যেত ও,' মন্তব্য করল আসাদ।

'ও হ্যাঁ, আর একটা কথা। কাল সন্ধ্যার পর বাসায় ছোটখাটো একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। আপনারা কিন্তু অবশ্যই আসবেন। উপজাতিদের একটা দল নানারকম শারীরিক কসরত দেখাবে। তারপর আছে বাজি পোড়ানোর খেলা। ডিনার রাত ন'টায়। দাদার আমল থেকেই প্রতি বছর শীতের সময় এই অনুষ্ঠানের রেওয়াজ চলে আসছে। তখন তো শহরসুদ্ধ লোককে দাওয়াত দেয়া হত। আর এখন শুধু মাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধব আর দু-চারজন প্রতিবেশীকে ডেকে ঐতিহ্য রক্ষা করা আর কি! কাল সন্ধ্যায় অন্য কোথাও আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই তো?'

'না, তেমন কোন জরুরি কাজ নেই। আমরা সময় মতই পৌঁছে যাব। আজ তাহলে চলি।' উঠে দাঁড়াল আসাদ। সেই সঙ্গে আমিও।

লিজার বাড়ি ছেড়ে মাত্র কয়েক গজ এগিয়েছি, এমন সময় মাঝবয়সী একজন লোককে আসতে দেখা গেল। সারা শরীর ধুলোবালিতে মাখামাখি। এক হাতে কয়েকটা চারাগাছ, অন্য হাতে ছোট একটা টুকরি। এই লোকটাই বোধহয় লিজার বাগানের মালী। লোকটা কাছাকাছি আসতেই জিজ্ঞেস করল আসাদ, 'এই যে, বুড়া মিয়া, তুমি কি এই বাড়িতে কাজ কর?'

'হ, মালীর কাম করি।'

কথাবার্তায় বোঝা গেল, লোকটা নেহায়েতই সরল। লিজার ঘটনাটা আসাদ কেন ওকে বলতে গেল বুঝলাম না–হয়তো ওর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য। শুনে চোখ বড়বড় হয়ে গেল ওর। 'ইয়াল্লা, কন কি, ছার! আমার আফামণিরে কেডা খুন করবার চায়...সাহস তো ব্যাডার কম না...!'

লোকটার কথার ফুলঝুরি মাঝপথে থামিয়ে দিল আসাদ, 'গত পরশু বিকেলবেলা তুমি কোথায় কি করছিলে?'

'কি আর করুম,' নোংরা হাত দিয়ে মাথাটা একটু চুলকে নিল লোকটা,

'হেই সময় ফুলগাছে পানি দিবার লাগছিলাম।'

'ঐ সময় তুমি যে সত্যি সত্যিই বাগানে পানি দিচ্ছিলে তার প্রমাণ কি, তখন তোমার সঙ্গে কি কেউ ছিল?'

'হ।'

'তোমার সঙ্গে আর কে ছিল, ঐ সময়?'

'টমি। আফামণির খুব আদরের পোষা কুত্তা।'

বোঝা গেল, লোকটা শুধু সরলই নয়। সেই সঙ্গে মগজেরও কিছু ঘাটতি আছে। আর দেরি না করে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা থানার দিকে।

জাফর অফিসেই ছিল। আমাদের দেখে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল, 'এভাবে বড়শি ফেলে অপেক্ষা করতে ভাল লাগছে না আর। আচ্ছা, আসাদ, তুমি কি সত্যি মনে কর আততায়ী আবার হামলা চালাবে?'

'শুধু মনেই করি না, আমার স্থির বিশ্বাস, দু-এক দিনের মধ্যেই হামলা চালাবে আততায়ী। ও হ্যাঁ, যে জন্য তোমার কাছে আসা–একটা তালিকা দিচ্ছি। সন্দেহজনক অনেকের নাম আছে এতে। তোমাকে একটু কষ্ট করে বের করতে হবে, গত পরশু বিকেল পাঁচটা থেকে ছ'টার মধ্যে কে কোথায় ছিল,' পকেট থেকে একটা তালিকা বের করে জাফরের দিকে বাড়িয়ে ধরল আসাদ। একনজর দেখলাম সেটা। লিজার বন্ধু-বান্ধবী, পরিচিত ও আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবারই নাম রয়েছে এতে।

কাগজটা ভাঁজ করে শার্টের পকেটে রাখল জাফর। 'বেশ, কাল দুপুরের মধ্যেই এটা ফেরত পেয়ে যাবে। এখন বলো, কি খাবে, কফি আর সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ, চলবে তো?'

বিনয়ের সঙ্গে ওর আতিথেতা প্রত্যাখ্যান করে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম আমরা।

হোটেলে পৌঁছে চট করে গোসল সেরে নিলাম। তারপর খেয়ে-দেয়ে দুজনেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

ঘুম ভাঙল সন্ধ্যের একটু আগে। রুম সার্ভিসকে ডেকে হালকা নাশতা আনিয়ে নিলাম। এরপর এল চা। চা শেষ করে দুজন বেরিয়ে পড়লাম সান্ধ্যভ্রমণে।

সমুদ্রের তীর ঘেঁষে হাঁটছি। উল্টো দিক থেকে হোবার্টকে আসতে দেখা গেল। সঙ্গে একজন লোক। লোকটার হাঁটাচলা দেখে মনে হয় নেশাখোর। আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দূর থেকে মুচকি হেসে হাত নাড়ল। কিন্তু কাছে এল না। এড়িয়ে যাবার ভাব লক্ষ্য করলাম হোবার্টের আচরণে।

কথাটা বললাম আসাদকে। ও মাথা নেড়ে সায় দিল, 'দেখে মনে হচ্ছে লোকটা পুরোপুরি ড্রাগ অ্যাডিক্ট। হোবার্ট বেশ বুদ্ধিমান। আমাদের সামনে যাতে কোনরকম অঘটন না ঘটায় তাই লোকটাকে নিয়ে অন্যদিকে কেটে পড়েছে। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা.... ।'

'কি?'

'ভাবছি, এত সতর্কতা সত্ত্বেও প্রতি বছর প্রচুর ড্রাগস আসছে আমাদের দেশে। ভেবেই পাই না, এত কড়াকড়ির পরও লক্ষ লক্ষ টাকার হেরোইন কোকেন গাঁজা কিভাবে পাচার হয়ে আমাদের দেশে আসে?

'যে সমস্ত ব্যাপারে বাহ্যিকভাবে আইনের বেশি কড়াকড়ি, সেগুলোতেই ফাঁকি থেকে যায় বেশি।'

সন্ধ্যা নেমেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। তবে দিনের আলোর রেশটুকু একেবারে মিলিয়ে যায়নি। দূরে সমুদ্রের ঢেউগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে গজরাচ্ছে। আর তার উপর চাঁদের আলো পড়ে রেশমী চাদরের মত দেখাচ্ছে। আরও কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর হোটেলের পথ ধরলাম। আমাদের থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ সামনে দুজন পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। জ্যোৎস্না থাকায় দূর থেকেও চিনতে অসুবিধা হলো না–ফিরোজ আর রিয়া।

চার

আসাদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘড়ি দেখলাম। মাত্র সাড়ে ছ'টা। এত ভোরে বিছানা ছাড়তে কার ইচ্ছে করে? কম্বলটা মাথা পর্যন্ত টেনে দিয়ে ঘাপটি মেরে পড়ে রইলাম। বিছানা ছাড়ছি না দেখে একটু পরে রেডিওর ভলিউম বাড়িয়ে দিয়ে বাথরুমে ঢুকল আসাদ। বেশ কিছুক্ষণ পর সাতটার খবর শুরু হলো। হঠাৎ একটা খবরে কান খাড়া হয়ে গেল আমার। গভীর সমুদ্রে গ্লাইডারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। কিন্তু রবার্ট সিনহার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। কর্তৃপক্ষের ধারণা, সমুদ্রেই ডুবে মারা গেছে সে। অনুসন্ধানকারী দলকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে।

'শেষ পর্যন্ত ডুবেই মারা গেল লোকটা!' চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মন্তব্য করল আসাদ।

'কিন্তু সেক্ষেত্রে মৃতদেহটা তো খুঁজে পাবার কথা!'

'হয়তো সামুদ্রিক প্রাণীর খোরাক হয়েছে।'

বেলা চড়ছে। উঠে পড়লাম বিছানা ছেড়ে। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নাশতা সেরে বেরিয়ে পড়লাম।

কিছু কেনাকাটা ছিল। সে সব সেরে থানার দিকে রওনা হলাম। ঘড়িতে বেলা প্রায় বারটা। থানায় পৌঁছে দেখি, কি একটা কাজে বাইরে গিয়েছে জাফর। প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষার পর জীপের আওয়াজ পাওয়া গেল। রুমে ঢুকে সৌজন্য বিনিময়ের পর কাজের কথায় চলে গেল জাফর। 'তুমি যে ক'জনের নাম দিয়েছো তাদের কারুরই ঐ এক ঘণ্টার কাজকর্মে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। তবু যদি শুনতে চাও তাহলে বলি।'

'বেশ, বলো,' চেয়ারে গা এলিয়ে দেয়ার মত করে বসে একটা সিগারেট ধরাল আসাদ।

'লিজার বাড়ির লোকজন দিয়েই শুরু করা যাক। ওর বাড়ির কাজের মেয়ে ঐ সময় রাতের রান্নার প্রস্তুতি শেষ করে নামাজের জন্য তৈরি

হচ্ছিল। ওর স্বামী বাগানের আগাছা সাফ করছিল। মি. ডি কষ্টা ঐদিন সন্ধ্যার আগে বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরোননি। আর মিসেস ডি কষ্টা তো আমাদের তালিকার বাইরেই থাকছেন। রিয়া ঐদিন বিকেলে সী-বীচে বেড়াতে গিয়েছিল। সঙ্গে ফিরোজ আর হোবার্টও ছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত একসাথে বেড়ানোর পর যে যার মত ফিরে এসেছিল। এছাড়া অ্যালবার্টের অ্যালিবাইটাও পরীক্ষা করে দেখেছি কিন্তু সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। কেস সংক্রান্ত ব্যাপারে এক মক্কেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেখান থেকে সোজা বাসায়।'

'তার মানে,' একটু যেন হতাশ হলো আসাদ, 'আমরা বোধহয় ভুল পথে এগোচ্ছি।'

'আমারও তাই মনে হয়। শুধু একটা ব্যাপারই তলিয়ে দেখ না! লোকে কেন খুন করতে যাবে লিজাকে? ধনসম্পত্তি তেমন কিছুই নেই মেয়েটার। উপরন্তু বাড়িটাও বন্ধক দেয়া তাই এ ব্যাপারে প্রথমত আর্থিক দিকটাকে সহজেই আমরা বাদ দিতে পারি। এছাড়া প্রেম, হিংসা কিংবা ব্যক্তিগত শত্রুতা–এক্ষেত্রে এগুলোর কোনটাকেই খুনের জন্যে জোরাল মোটিভ বলে মনে হয় না। অবশ্য যে ঘটনাটা তোমাদের চোখের সামনে ঘটেছে সেটাকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছি না আমি। কোন কাণ্ড হতে পারে সেটা।'

একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে আসাদকে। 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। তবু আরও দু–একদিন অপেক্ষা করে দেখতে চাই। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, কিছু একটা ঘটবেই।'

'তোমার অনুমান বড় একটা ভুল হতে দেখিনি কখনও। এবারেও আশ্চর্যরকমভাবে মিলে গেলে অবাক হব না মোটেও।'

চা খেয়ে উঠে পড়লাম আমরা। হোটেলে ফেরার পথে কোন কথা হলো না আসাদের সঙ্গে। কেমন যেন গম্ভীর দেখাচ্ছে ওকে।

সন্ধ্যার পরপরই লিজার ওখানে পৌঁছে গেলাম। মেহমানদের তেমন কেউ তখনও এসে পৌঁছেনি। দুপুরবেলা চট্টগ্রাম থেকে ওর চাচাতো বোন এলি এসেছে। ওর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিল লিজা। চালচলন আর কথাবার্তায় লিজার সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পেলাম না ওর। একটা ছাই রঙের শাড়িতে বেশ মানিয়েছে ওকে। খোঁপায় বেলী ফুলের মালা। কথাবার্তায় যেমন ভদ্র তেমনি আচার-ব্যবহারেও মার্জিত। চটকদার সুন্দরী না হলেও এমন একটা স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আছে মেয়েটার যা সহজেই অন্যকে আকৃষ্ট করে। বাবাকে ও হারিয়েছে যখন বয়স সাত কি আট। এরপর কক্সবাজারে

দাদার বাড়িতে ও আর লিজা একসঙ্গে বড় হয়েছে। দাদা মারা যাবার পর ও চট্টগ্রামে মা'র সঙ্গে থাকছে। এতে অবশ্য দুজনের বন্ধুত্ব কোনরকম ছেদ পড়েনি। বছরের বিভিন্ন ছুটিছাটায় এখানে বেড়াতে আসে ও। আর লিজাও মাঝেমধ্যে চট্টগ্রামে গিয়ে ওর ওখান থেকে বেড়িয়ে আসে।

আসাদ এরই মধ্যে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে এলির সঙ্গে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল এলি, 'এখানে এসে শুনতে পেলাম, লিজাকে নাকি কয়েকবার খুন করার চেষ্টা হয়েছে, কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ। তবে এ ব্যাপারে এখনও নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। ওগুলো খুনের চেষ্টাও হতে পারে কিংবা স্রেফ দুর্ঘটনাও হতে পারে।'

'দুর্ঘটনাই যেন হয়।' অস্ফুট কণ্ঠস্বর এলির, 'তবু কেমন যেন অমঙ্গলের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে কোথাও কিছু একটা ঘটতে চলেছে। কোন বিপদ-আপদ ঘটার আগে আমি ঠিক ঠিকই টের পেয়ে যাই। মনে হয়, লিজার আরও সাবধান হওয়া উচিত।'

'এ ক্ষেত্রে খুব বেশি সাবধান হবার তেমন একটা সুযোগ নেই। আততায়ী নিত্য-নতুন কৌশল খাটাচ্ছে। আর তাই তাকে পাকড়াও করতে হলে আঘাত এড়িয়ে যাবার চেয়ে আঘাতের মুখোমুখি হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনি শুধু ওর ব্যাপারে চোখ কান একটু খোলা রাখবেন। কোন কিছু খটকা লাগলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তা জানাতে ভুলবেন না কিন্তু!'

কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল এলির। 'এখানে এসে সবকিছু শোনার পর মাকে একটা চিঠি লিখেছি যেন মানসিকভাবে তৈরি থাকে। আপনি বললে এখানে আসার জন্য টেলিফোন করে দিতে পারি।'

'না, না, তার কোন প্রয়োজন হবে না। আপনি তো থাকছেনই। আর আমরাও ওর ওপর নজর রেখে চলেছি। এছাড়া স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তাকেও জানিয়ে রেখেছি।'

দূর থেকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র আর ঢোলের আওয়াজ ভেসে আসছে। একটু একটু করে নিকটবর্তী হচ্ছে আওয়াজটা। উপজাতিদের দলটা এসে পৌঁছেছে। বিচিত্র তাদের বেশভূষা। মাথায় পাখির পালক, কানে নানারকম ধাতুর তৈরি অলঙ্কার আর পরনে লুঙ্গির মত পেঁচানো কাপড়। কারও কারও শরীরের বিভিন্ন জায়গায় উলকি আঁকা। বাড়ির সামনের খোলা জায়গাটায় গোল হয়ে বসে পড়ল ওরা।

একে একে রিয়া, ফিরোজ আর হোবার্ট এল। এর একটু পর এল মি. ডি কস্টা। লিজা ওদের অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে চলে গেল রান্নাবান্নার

তদারক করতে। ও দিকে উপজাতিদের নাচ শুরু হয়েছে। কি বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি! নানারকম বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। একটু পর অ্যালবার্টকে ঢুকতে দেখা গেল। চট্টগ্রাম থেকে নিজেই ড্রাইভ করে এসেছে।

ঘন্টাখানেক পর নাচের পর্ব শেষ হলো। একটু পর বাজি পোড়ানোর খেলা শুরু হবে। দেখতে সুবিধে হবে বলে চেয়ারগুলো বের করে বাড়ির সামনের খোলা জায়গায় পেতে দেয়া হলো। এদিকে রাত বাড়ার সাথে সাথে শীতও বাড়ছে। এলি গরম কাপড় গায়ে দেয়নি। শীতে জড়োসড়ো হয়ে এক কোণে বসে আছে। লিজা ওকে লক্ষ্য করেছে। বলল, 'ওপরে গিয়ে আমার ওঁয়ার্ডরোবের প্রথম তাকে দেখবি কালো একটা শাল। ওটা গায়ে দে গিয়ে।'

অন্য পাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল রিয়া, 'এলি, লিজার রুমে আমার ওভারকোটটা আছে। ওটা একটু এনে দেবে, প্লিজ!'

উঠে গেল এলি। একটু পর বুয়া এসে লিজাকে ডাক দিল। কালো রঙের শাড়িতে চমৎকার মানিয়েছে লিজাকে। গায়ে দামী কালো পশমী শাল। অতিথি আর রান্নাঘর দু-দিকেই সমানভাবে সামলাচ্ছে ও। কিন্তু আজ সন্ধ্যা থেকেই কেমন যেন অস্থির দেখাচ্ছে ওকে। চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ...। প্রচণ্ড শব্দ করে বিস্ফোরিত হলো একটা হাউই। প্রথমে লাল, তারপর নীল, হলুদ এবং সবশেষে সবুজ রঙের আবীর ছড়িয়ে মিলিয়ে গেল সেটা আকাশে।

লিজা রান্নাঘর থেকে এক চক্কর দিয়ে এসে আবারও কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে গিয়েছিল ফোন ধরতে। এখন আবার আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আতসবাজিগুলো একেকটা একেক রকমের। কোনটা নানারকম রঙ ছড়িয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোনটা আবার বিভিন্ন রকমের নক্সা তৈরি করছে। রঙধনুর মত সাত রঙের বাহার ছড়াচ্ছে কোনকোনটা। কিছুক্ষণের মধ্যে বাজি পোড়ানো শেষ হবে। এদিকে ভীষণ শীত করছে আমার। ডিনারের আরও প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি। আসাদকে বললাম। ওরও একই অবস্থা। বেরোনোর সময় কেন গরম কাপড় সঙ্গে নিইনি, সেজন্য নিজের উপরই রাগ হচ্ছে আমার। ফিসফিস করে আসাদকে বললাম, 'চল, চট্ করে হোটেল থেকে গরম কাপড়গুলো নিয়ে আসি। নইলে শীতে জমে মরতে হবে।'

বাড়ির সামনের গেট জুড়ে উপজাতিদের দলটা গোল হয়ে বসে আছে। তাই বাড়ির পেছন দিকে যে গেটটা, আমরা সেদিকেই হাঁটতে শুরু

করলাম। ওঠার সময় লিজার চোখাচোখি হয়ে গেল। কথাটা খুলে বললাম ওকে। মুচকি হেসে সম্মতি জানাল ও। আর কেউ লক্ষ্য করল না আমাদের। পেছনে খানিকটা খোলা জায়গা। তারপর গেট। গেটের কাছাকাছি চলে এসেছি, এমন সময় বিশ-পঁচিশ গজ দূরের একটা জিনিসের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল আমার। মনে হচ্ছে, কেউ শুয়ে আছে ওখানটায়। অন্ধকারে ভাল করে দেখাও যাচ্ছে না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম আমরা।

কালো শাল জড়িয়ে থাকা দেহটাকে চিনতে কষ্ট হলো না-এলি। হাঁটু গেড়ে বসে ওর কপালে হাত রাখল আসাদ। পর মুহূর্তের সরিয়ে আনল হাতটা। 'ও আর বেঁচে নেই, হাবিব!'

লক্ষ্য করলাম, বুকের কাছটা রক্তে ভিজে রয়েছে। খুব সম্ভবত বুকেই গুলি করেছে আততায়ী।

যেন বোবা বনে গেছে আসাদ। কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না ও। একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে এলির নিথর দেহটার দিকে। আরও কিছুক্ষণ পর কথা ফুটল আসাদের মুখে, 'এলির মৃত্যুর জন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে তবে সে একমাত্র আমি। বেচারিকে আমার পরামর্শেই এখানে আনা হয়েছিল। আর তাই মরতে হলো ওকে...' বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল আসাদের কণ্ঠস্বর।

আমাদের কথাবার্তার আওয়াজ আরও কেউ কেউ শুনে থাকবে বোধহয়। একটু পর ফিরোজ আর হোবার্টকে দেখা গেল আসতে। কাছে এসে যখন দেখাতে পেল এলি পড়ে রয়েছে মাটিতে তখন দুজনেই বিকট চিৎকারে আশপাশে কাঁপিয়ে তুলল প্রায়। আসাদ ওদের দুজনকে একরকম ধমক দিয়ে চুপ করাল। ওদিকে লিজাকেও আসতে দেখা গেল। ওকে আসতে দেখে এগিয়ে গেল আসাদ। কাঁপাকাঁপা গলায় বলল, 'দারুণ একটা দুঃসংবাদ সবার জন্য অপেক্ষা করছে, লিজা... ।'

'কি? কারো কোন দুর্ঘটনা...' দৃষ্টি চলে গেল একটু দূরে পড়ে থাকা এলির দিকে। ছুটে গিয়ে হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতেই বুঝতে পারল, কি হয়েছে। হঠাৎ অপ্রকৃতিস্থের মত হেসে উঠল ও-ঠিক যেন হিস্টেরিয়ার রোগী। আমাদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে আচমকা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লিজা।

ঘটনাটা ততক্ষণে জানাজানি হয়ে গেছে। চারপাশে ভিড় জমাচ্ছে সবাই। কেউ যেন মৃতদেহ স্পর্শ না করে সেজন্য অ্যালবার্টকে ওখানে বসিয়ে রেখে আমরা কয়েকজন লিজাকে ধরাধরি করে ড্রইং রুমে নিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এল লিজার। এই ফাঁকে জাফর আর

স্থানীয় ডাক্তার লতিফ শিকদারকে টেলিফোন করে ঘটনাটা জানানো হয়েছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে ওরা।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে অঝোর ধারায় কেঁদে চলেছে লিজা। কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'আমি...এই আমিই যত নষ্টের মূল। নইলে আমাকে পাহারা দিতে এসে কেন মরতে হবে ওকে...।'

ভয় হচ্ছিল, যেভাবে কান্নাকাটি করছে তাতে আবার না জ্ঞান হারিয়ে ফেলে! ওর মাথায় হাত রাখল আসাদ। স্নেহের সুরে বলল, 'লিজা, এ ঘটনার জন্য দোষ যদি কাউকে দিতেই হয় তবে সে একমাত্র আমি। আমার কথাতেই ওকে এখানে আসতে বলেছিলেন আপনি। আততায়ীকে ধরতে তো পারলামই না, উপরন্তু আমার অসাবধানতার জন্য প্রাণ দিতে হলো বেচারিকে।'

'কিন্তু কেন? আততায়ী কেন খুন করল ওকে? খুন তো হবার কথা আমার। আমাকে রক্ষা করতে এসে নিজের প্রাণ দিয়ে গেল! উহ্, ভাবতে পারছি না আর...'আবারও ফুঁপিয়ে উঠল লিজা। সান্ত্বনা দেয়ার কোন ভাষা খুঁজে পেলাম না।

বাইরে হর্ন শোনা গেল। জাফরের জীপ। একটু পর লতিফ শিকদারকে আসতে দেখা গেল। লিজাকে বুয়ার জিম্মায় রেখে ওদের দুজনকে এলির মৃতদেহের কাছে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার শিকদার লাশ পরীক্ষা করে বললেন, 'বড়জোর ঘণ্টাখানেক আগে মৃত্যু হয়েছে ওর।'

দেহটাকে জাফরও ভালভাবে পরখ করল। কোন সূত্র পেল কিনা কে জানে! আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হলো ওর। তারপর পোস্ট মর্টেমের জন্য লাশ সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিল কনস্টেবলদের।

আমরা আবার ড্রইংরুমে এসে বসলাম। ততক্ষণে লিজা খানিকটা স্বাভাবিক হয়েছে বলে মনে হলো। জাফর আর আসাদ নিজেদের মধ্যে কি যেন ইঙ্গিত বিনিময় করল। তারপর জাফরই কথা শুরু করল, 'এর আগেও তো আপনার উপর হামলা হয়েছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ,' ছোট্ট করে জবাব দিল লিজা।

জাফর বিস্তারিত শুনতে চাইল না। আমাদের কাছ থেকে ওগুলো আগেই শুনেছে ও। 'এ ব্যাপারে আপনার কি কাউকে সন্দেহ হয়?'

'না। আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধব সবার সঙ্গেই আমার সম্পর্ক ভাল। এদের কেউ এ কাজ করতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। তা ছাড়া বাইরের কেউ কেনই বা আমাকে খুন করতে চাইবে?'

'হুঁ,' চিন্তিত দেখাচ্ছে জাফরকে, 'আচ্ছা, আজ রাতে এলির সঙ্গে

আপনার শেষ কখন দেখা হয়?'

'প্রায় আটটার দিকে। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিল। তাই দেখে আমি বললাম, দোতলায় গিয়ে ওয়ার্ডরোব খুলে আমার শালটা বের করে নিয়ে গায়ে দিতে। রিয়ার ওভারকোটটাও ওখানেই রাখা ছিল। ওখান থেকে ওভারকোটটা ওকে এনে দিতে বলেছিল রিয়া। ও ওপরে যাবার পর ওর সঙ্গে আর দেখা হয়নি আমার।'

'ও ঠিক ঠিকই শালটা খুঁজে পেল কিনা তা খোঁজ নেননি?'

'আসলে রান্নার তদারকি নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে কথাটা পরে আর মনেই হয়নি আমার।'

'স্বাভাবিক,' আসাদের দিকে ফিরল জাফর, 'মনে হচ্ছে,এলির মৃত্যুর ব্যাপারটা আততায়ীর ভুলের ফল। আততায়ী এলিকে লিজা ভেবে গুলি করেছে। এ রকম ভুল হবার কারণ, দুজনেরই পরনে কালো পোশাক। তুমি কি বলো, আসাদ?'

'হুঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'উহ্, কি ভয়ানক...' দুহাতে মুখ ঢেকে আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল লিজা। ওকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রিয়া। তবু অনুতাপে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে ও। এই দুর্ঘটনার জন্য নিজেকেই দোষী ঠাওরাচ্ছে। রিয়ার কাঁধে মাথা রেখে নিজেকে সোফায় এলিয়ে দিল লিজা। চোখদুটো বোজা। আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলল কিনা কে জানে। ডাক্তার শিকদারও মনে মনে বোধহয় এই আশঙ্কাই করছিলেন। কিন্তু পরীক্ষা করে বললেন, 'না, ও জ্ঞান হারায়নি। একটু তন্দ্রার ভাব হয়েছে।'

ফিসফিস করে আসাদের সঙ্গে কি যেন আলাপ করল জাফর। তারপর ডাক্তার শিকদারকে বলল, 'আচ্ছা, লিজাকে কয়েকদিনের জন্য কোন নার্সিং হোমে ভর্তি করিয়ে দিলে কেমন হয়? বেচারির যা অবস্থা তাতে পুরোপুরি বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু বাড়িতে থাকলে লোকজনের ভিড় লেগেই থাকবে।'

'আমিও এই একই কথা বলতে চাচ্ছিলাম,' সায় দিলেন ডাক্তার, 'এ ধরনের ঘটনা থেকে অনেক সময় মানসিক বিকারের সৃষ্টি হয়। সে জন্য পরিপূর্ণ বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন। শর্মিলা নার্সিং হোমের সঙ্গে আমার ভাল জানাশোনা আছে। আপনারা বললে ওখানে ওর ভর্তির ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

'বেশ, তাই করুন।'

সবরকম আধুনিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় এরকম নার্সিং হোম

গোটা কক্সবাজারে মাত্র দুটো কি তিনটে। শর্মিলা নার্সিং হোম এগুলোরই একটা। ডাক্তার শিকদার টেলিফোন করার দশ মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স চলে এল। আমরা কয়েকজন মিলে ধরাধরি করে লিজাকে তুলে দিলাম অ্যাম্বুলেন্সে। সঙ্গে রইলেন ডাক্তার শিকদার। অ্যাম্বুলেন্স ছাড়ার আগে ডাক্তারের উদ্দেশে বলল জাফর, 'ওর সঙ্গে বন্ধু-বান্ধব কিংবা আত্মীয়-স্বজন কেউ যাতে দেখা করতে না পারে, সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ওদেরকে বিশেষভাবে বলে দেবেন। আর একটা কথা, ওদের নিজস্ব খাবার ছাড়া অন্য কোন বাইরের খাবার লিজাকে যেন না দেয়া হয়।'

অ্যাম্বুলেন্স চলে গেল। আমরাও উঠে পড়লাম জাফরের জীপে। যাবার আগে সবার উদ্দেশে বলল জাফর, 'আপনারা যারা আজ এখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের কেউই স্থানীয় থানা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কক্সবাজার ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবেন না।'–অতিথিদের মধ্যে মৃদু আপত্তির গুঞ্জন উঠল। চেঁচিয়ে কিছু একটা বলতে চাচ্ছিল অ্যালবার্ট। কিন্তু ততক্ষণে আমাদের জীপ বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে।

পাঁচ

হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত প্রায় এগারোটা। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। রুম সার্ভিসকে ডেকে কিছু খাবার আনিয়ে নিলাম। আসাদ খাবারের কিছুই মুখে তুলছে না। এলির মৃত্যুটাকে এখানো সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না ও। জানালা দিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উঠে গিয়ে কাঁধে হাত রাখলাম ওর। বললাম, 'কেন মিছেমিছি নিজেকে দোষী ঠাওরাচ্ছো? যা হবার হয়েছে। এ নিয়ে মন খারাপ করে লাভ নেই। আমরা তো লিজার উপর দৃষ্টি রেখেই চলেছিলাম। আচমকা যদি অন্য কেউ খুন হয়েই যায় তা হলে কী-ই বা করতে পারি? আমরা তো আর সর্বজ্ঞ নই!'

'তাই বলে তুমি বলতে চাও, আমার চোখের সামনে একজন খুন হয়ে যাবে আর চুপচাপ আমি তা দেখে যাব? আজ লিজার বেঁচে যাওয়াটা অনেকটা দৈবাৎ ঘটনাই বলতে পারো। আততায়ী লিজাকে খুন করতে গিয়ে ভুল করে এলিকে খুন করেছে। এখানে লিজা কিংবা এলির মধ্যে কে খুন হলো সেটা বড় কথা নয়; আসল কথা হলো, আততায়ী আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সফল হয়েছে। কে জানে, আগামীতে হয়তো সে ভুল না-ও করতে পারে,' চিন্তিত স্বরে বলল আসাদ।

'যা-ই বলো না কেন, লিজার ওপর আঘাত হানা এবারে আর তত সহজ হবে না। চব্বিশ ঘণ্টা ওকে নার্সদের পাহারায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ছাড়া দারোয়ান, বয় চাপরাশী এরা তো আছেই।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে আততায়ী ভীষণ চালাক। নতুন কোন কৌশলে আঘাত সে হানবেই।'

'তার মানে, বলতে চাচ্ছো নার্সিং হোমেও লিজা নিরাপদ নয়?'

'অবশ্যই নিরাপদ। তবু সাবধানের মার নেই। আগের চেয়ে অনেক বেশি সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হবে আমাদের। কোনরকম সুযোগ দেয়া চলবে না। এতে করে খুনী আমাদের হাতে ধরা পড়ুক বা না-ই পড়ুক।'

'কিন্তু এভাবে কতদিন? একসময় তো ওকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনতেই হবে।'

'তা ঠিক। কিন্তু কিছুদিনের জন্য হলেও নিরাপদ থাকছে ও। আর আমরাও দম ফেলার ফুরসত পাচ্ছি।'

'তোমার কি মনে হয়, অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিল তাদেরই কেউ খুনটা করেছে? কোন খেপার কাণ্ড নয় তো? কারণ মনে রাখতে হবে, খুন হয়েছে এলি, লিজা নয়।'

'কোন খেপার কাজ নয় এটা, একেবারেই ঠাণ্ডা মাথায় খুন। যারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল তাদেরই কেউ একজন খুনী-এ ব্যাপারে আমি প্রায় নিশ্চিত। এখানে এলির খুন হওয়াটা দৈবাৎ দুর্ঘটনা মাত্র। আততায়ী এলিকেই লিজা ভেবে গুলি করেছে। দুজনেরই গায়ে কালো শাল থাকায় এমনটা ঘটেছে।'

'আচ্ছা, পিস্তলটা গেল কোথায়?'

'মনে হয় সমুদ্রের পানিতেই ঠাঁই পেয়েছে ওটা।'

'আচ্ছা, খুনের ব্যাপারে তোমার কাকে বেশি সন্দেহ হয়?'

'সবাইকেই,' কেশে গলাটা পরিষ্কার করল আসাদ, 'আচ্ছা, একটু ভেবে বলো তো, অনুষ্ঠানে অতিথিরা কি সারাক্ষণ যে যার আসনে ঠায় বসে থেকেছে? আমি বলব, থাকেনি। প্রায় সবাই কোন না কোন ছুতোয় একবারের জন্য হলেও আসন ছেড়ে উঠেছে।'

'তবু মোটিভের প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। লিজাকে খুন করে সবাই তো আর লাভবান হচ্ছে না। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অ্যালবার্টকেই আমাদের সন্দেহ তালিকায় সবার উপরে স্থান দিতে হয়।'

'রিয়ার ব্যাপারেও সেই একই কথা। অপারেশনের সময় উইলে রিয়ার নামেও সম্পত্তি লিখে দিয়েছিল লিজা'।'

'এ তো গেল সরাসরি আর্থিক লাভের ব্যাপার। এ ছাড়া অন্য কোন মোটিভেও থাকতে পারে। যেমন ধরো, প্রতিহিংসা কিংবা...'

'হ্যাঁ, মোটিভ হিসেবে আরও অনেক কিছুকেই ধরা যেতে পারে,' আমার কথায় বাধা দিয়ে বলল আসাদ, 'যেমন, আমাদের জানতে হবে বাড়িটা বিক্রির কোন প্রস্তাব কারো কাছ থেকে এসেছিল কিনা। বাড়ির মাটির নিচে গুপ্তধন কিংবা ঐ জাতীয় কোন কিছু লুকানো আছে কিনা কে জানে!' হো হো করে হেসে উঠল আসাদ। 'তা ছাড়া জেলাসির কথা বললেও অনেককেই সন্দেহের তালিকায় ধরতে হয়। কারণ, শোনা যায়, লিজার সঙ্গে অনেকেরই প্রেম-প্রেম সম্পর্ক ছিল বা আছে।'

'এমনও তো হতে পারে, লিজা কারো সম্বন্ধে এমন কোন গোপন কথা জানে যা প্রকাশ পেলে ঐ লোককে নাস্তানাবুদ হতে হবে।'

'কি জানি!' আড়মোরা ভেঙে উঠে দাঁড়াল আসাদ। সাইড টেবিলে রাখা রাইটিং প্যাডটা টেনে নিয়ে কি যেন লিখতে শুরু করল। প্রায় ঘন্টাখানেক কোন কথা না বলে একটানা লিখে গেল। লেখা শেষ হলে পুরোটা একবার পড়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল ও। কাগজে যা লেখা তা হুবহু এরকমঃ

১. বুয়া

২. বুয়ার স্বামী (বাগানের মালী)

৩. "এক" এবং "দুই" এর নাবালক সন্তান

৪. মি. ডি কস্টা

৫. মিসেস ডি কস্টা

৬. রিয়া

৭. ফিরোজ

৮. হোবার্ট

৯. অ্যালবার্ট

১০। ?

মন্তব্য ঃ

১. বুয়া : অয়েল-পেইন্টিংয়ের কর্ড কাটা কিংবা পাথরের চাঁই গড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে ওর হাত থাকতে পারে। পিস্তল খোয়া যাওয়া কিংবা পিস্তল দিয়ে গুলি করাও ওর পক্ষে অসাধ্য কিছু নয়। তবে গাড়ির ব্রেক অকেজো করার ব্যাপারে ওর হাত না থাকাই স্বাভাবিক। এ কাজ ওর স্তরের কাউকে দিয়ে সম্ভব নয়।

মোটিভ : এখানে আর্থিক লাভছাড়া অন্য যে কোনকিছুই মোটিভ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

টীকা : বুয়া কিংবা বুয়ার কোন আত্মীয়ের সাথে অতীতে লিজার কোনরকম ঝগড়া-বিবাদ হয়েছিল কিনা জানতে হবে।

২. মালী : ১-এর সমস্ত মোটিভ এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য.।

টীকা : ভালভাবে জেরা করতে হবে।

৩. বুয়া এবং মালীর নাবালক সন্তানঃ মোটিভ বিচার করলে সন্দেহ তালিকার বাইরে রাখা যেতে পারে।

টীকা : ভালভাবে জেরা করতে হবে। মূল্যবান কোন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।

৪. মি. ডি কস্টা : ওর বাসায় ঢোকার সময় শিসের শব্দ ভেসে

আসছিল। কেন?

মোটিভ : আপাত দৃষ্টিতে কিছুই না।

টীকা : লিজার বাবার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন ছিল জানতে হবে।

৫. মিসেস ডি কস্টা : শারীরিকভাবে পঙ্গু। তাই সন্দেহ তালিকার বাইরে রাখা যেতে পারে।

টীকা : ভালভাবে জেরা করতে হবে। মূল্যবান কোন তথ্য জানা যেতে পারে।

৬. রিয়া : লিজার ওপর হালমাগুলোকে বরাবরই ও "বানোয়াট" কিংবা "বাজে কথা" বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। কেন?

মোটিভ : আর্থিক লাভ কিংবা প্রতিহিংসা। কিংবা ভয়? জানার চেষ্টা করতে হবে।

টীকা : ওর ব্যাপারে লিজার সঙ্গে আলাপ করতে হবে। এ ছাড়া ওর বিয়ের ঘটনাটাও পুরোপুরি জানা দরকার।

৭. ফিরোজ : লিজার অয়েল পেইন্টিংগুলো কেনার ব্যাপারে ওর এত আগ্রহ কেন?

মোটিভ : অজ্ঞাত।

টীকা : ফিরোজের বর্তমান ব্যবসার অবস্থার কথা জানতে হবে।

৮. হোবার্ট : আপাতদৃষ্টিতে সন্দেহ করার মত কিছু নেই। তবে বেশ কিছুদিন থেকে এই এলাকায় আছে। তাই লিজার ওপর হামলার ব্যাপারে ওর হাত থাকার সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

মোটিভ : অজ্ঞাত।

টীকা : ভালভাবে জেরা করতে হবে।

৯. অ্যালবার্ট : হোটেলের লনে লিজাকে লক্ষ্য করে যখন গুলি ছোঁড়া হয়, ও তখন অফিসে ছিল না। অবশ্য এ ক্ষেত্রে অ্যালিবাই আছে। তবু তাতে ফাঁক থাকতে পারে।

মোটিভঃ আর্থিক প্রাপ্তিকেই এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য মোটিভ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

টীকাঃ অ্যালবার্টের বর্তমান আর্থিক অবস্থা কেমন, জানতে হবে। এ ছাড়া ওর অ্যালিবাইটা আর একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

১০.? পুরো ঘটনায় একজন দশ নম্বরী, অর্থাৎ বাইরের অপরিচিত কারো হাত থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে উপরের এক কিংবা একাধিকজনের সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগ থাকতে পারে। লোকটা (এ ক্ষেত্রে পুরুষ হবার সম্ভাবনা বেশি) পেশাদার খুনী, খেপা কিংবা লিজার গোপন শত্রুও

হতে পারে।

মোটিভ : অজ্ঞাত।

টীকা : পেশাদার খুনী হলে অন্যের হয়ে ভাড়া খাটতে পারে। সে ক্ষেত্রে উপরের যে-কারোর সঙ্গে যোগসাজশ থাকতে পারে। খেপা হলে অবশ্য অন্য কথা। গোপন শত্রুর ব্যাপারে লিজাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে।

'চমৎকার,' কাগজটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিলাম, 'কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না। তোমার তালিকাটা পড়লে বোঝা যায়, মোটিভ যার যা-ই থাকুক না কেন, সবার সমান সুযোগ ছিল।'

'তবু, এ ক্ষেত্রে মোটিভ এবং সুযোগ বিচার করলে কাকে তোমার বেশি সন্দেহ হয়?'

'অ্যালবার্টকে। ওর ক্ষেত্রে সুযোগ যা-ই থাকুক না কেন, মোটিভ কিন্তু অত্যন্ত জোরাল।'

আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে হঠাৎ কাগজটাকে দুমড়ে মুচড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ছুঁড়ে ফেলল আসাদ। কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই বাধা দিয়ে বলে উঠল ও, 'আসলে ওটা কিস্‌সু হয়নি। আমার মোটিভ আর সুযোগ নিয়েই এতক্ষণ মাথা ঘামিয়েছি। কিন্তু অপরাধের মনস্তাত্ত্বিক দিকটাই বাদ পড়ে গেছে।'

'মানে?'

'মানে, তুমি এখন শুয়ে পড়ো। আমি আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে মাথাটাকে খেলানোর চেষ্টা করব,' ইজি চেয়ারে গা এলিয়ে দিল আসাদ।

ঘুম আসছে না কিছুতেই। কেবল এপাশ ওপাশ করছি। ইজি চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় সিগারেট টানছে আসাদ। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, উঠে গিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট থেকে কাগজটা তুলে নিল। ওর ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি। এরপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি আমি।

সূর্যের আলো চোখে পড়ায় বিছানা ছেড়ে উঠতে হলো। ঘড়িতে প্রায় সাড়ে আটটা। আসাদকে দেখলাম কাল রাতের মত চোখ বন্ধ করে বসে আছে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, শেভ গোসল ইত্যাদি সেরে ফেলেছে আগেই। নাশতার ঝামেলাটাও চুকিয়ে ফেলেছে বোধহয়। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে আচমকা বলে উঠল, 'আমার তিনটে প্রশ্নের উত্তর আগে দাও। প্রথম প্রশ্ন: ইদানীং লিজাকে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না, ওর ঘুমের ব্যাঘাত

হচ্ছে–কেন? দুই: সাধারণত ও কালো কাপড় পরে না, কিন্তু কাল রাতে কালো কাপড় পরেছিল কেন? শেষ প্রশ্ন: ও কেন বলেছিল, 'এখন আর বেঁচে থেকে কি লাভ''?'

'কালরাতে লিজার ওখানে আমরা দুজন তো সব সময় এক সাথেই ছিলাম–কখন ও একথা বলল?'

'রান্নাঘর থেকে চক্কর দিয়ে আসার পর। ঐ সময় তুমি বাজি পোড়ানো দেখতেই ব্যস্ত ছিলে। তাই খেয়াল করোনি কথাটা। যাক এবারে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঝটপট।'

আসাদের কণ্ঠে কৌতুকের সুর থাকলেও বুঝলাম, প্রশ্নগুলো ওকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলেছে। 'বেশ, তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে–ইদানীং ও বেশ দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে।'

'ঠিক। কিন্তু কেন?'

ওর পাল্টা প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'আর কালো পোশাকের ব্যাপারে বলা যেতে পারে রুচি বদল। সবাই পোশাক–পরিচ্ছদের ব্যাপারে বৈচিত্র্য পছন্দ করে।'

'দূর! মেয়েদের মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তোমার খুবই কম। কোন মেয়ে একবার যদি জেনে যায়, অমুক রং তাকে মানায় না, তবে জীবনেও সে ঐ রঙের পোশাক পরবে না। তোমার বোধহয় মনে নেই, একদিন কথায় কথায় লিজা বলেছিল কালো রঙ ওর দু'চোখের বিষ।'

'তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর খুব সহজ। এত বড় একটা দুর্ঘটনার পর... ।'

'কিন্তু কথাটা লিজা বলেছিল দুর্ঘটনাটা ঘটবার আগে, পরে নয়,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল আসাদ। 'কাল রাতে দুর্ঘটনা ঘটবার আগে ওর সঙ্গে শেষ কখন আমাদের দেখা হয় বলতে পারো?'

'হ্যাঁ, রাত তখন প্রায় আটটা। এ সময় ও উঠে গিয়েছিল রান্নার তদারকি করতে এবং পরের বার গিয়েছিল টেলিফোন ধরতে।'

'ঠিক। টেলিফোন ধরতে গিয়ে প্রায় মিনিট বিশেক অর্থাৎ এলির মৃতদেহ চোখে পড়ার আগ পর্যন্ত ওর দেখা পাওয়া যায়নি। এখন প্রশ্ন হলো, ঐ সময় ও কি সত্যিই কারো সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলছিল, নাকি অন্য কোন ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল, আমাদের তা জানতে হবে। আমি প্রায় নিশ্চিত যে, ও কিছু একটা গোপন করে যাচেছ–আর সেটাই হত্যাকারীর মূল মোটিভ কিনা কে জানে!'

গোসল সেরে নাশতা শেষ করেছি, এমন সময় দরজায় টোকা

পড়ল–রিয়া। শুভেচ্ছ বিনিময়ের পর আসাদের খোঁজ করল ও। ব্যালকনি থেকে ডেকে আনলাম ওকে।

'মি. রহমান, কাল রাতের দুর্ঘটনাটা যে লিজার জন্যই ঘটেছে এ ব্যাপারে আপনি কি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, আততায়ী এলিকেই লিজা ভেবে গুলি করেছে। এতে কোন সন্দেহ নেই।'

'আসলে কি জানেন, কাল দুর্ঘটনাটা ঘটার আগ পর্যন্ত আমার বিশ্বাসই হয়নি, লিজার উপর সত্যি সত্যিই আক্রমণ আসতে যাচেছ। তবে একটা কথা, এ ঘটনার জন্য কিছুটা হলেও ও নিজেই দায়ী। সব সময় একগাদা বয়ফ্রেণ্ড নিয়ে হল্লা আর যার তার সাথে প্রেম প্রেম খেলার পরিণতিই হচ্ছে কালকের এই দুর্ঘটনা।'

'যাক যা হবার হয়েছে। এবারে, রিয়া, আপনার কথা কিছু বলুন তো? দেখা আমাদের বেশ কয়েকবারই হয়েছে কিন্তু তেমন আলাপের সুযোগ হয়নি।'

'কি আর বলব!' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রিয়া, 'বিয়ে করেছিলাম ভালবেসে। কিন্তু ভালবাসা দিয়ে সংসার টিকিয়ে রাখতে পারলাম না। নেশাখোর স্বামীর অত্যাচার সইতে না পেরে সংসারের মায়া ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে এসেছি। মাস ছয়েক হলো আইনগতভাবে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমাদের।'

'সত্যিই বড় দুঃখজনক ঘটনা। তবু বলব, সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে আপনার। নতুন করে কাউকে কি বেছে নেয়া যায় না?'

আসাদের কথায় কি যেন একটা ইঙ্গিত ছিল। রক্তিম হয়ে উঠল রিয়ার গালদুটো। 'ফিরোজের সঙ্গে আমার খুবই ভাল সম্পর্ক। জানি না ভবিষ্যতে কি আছে কপাল,' উঠে দাঁড়াল রিয়া। 'একবার লিজাকে দেখতে যেতে হবে। ফুল নিয়ে গেলে আপত্তি নেই তো?'

'মোটেই না। বরং এ সময় কারো কাছ থেকে একগুচ্ছ ফুল উপহার পেলে খুশিই হবে ও। তবে কোন খাবার নেয়া চলবে না।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রিয়া। ও চলে যাবার পর আসাদ বলল, 'আসলেই দারুণ চালাক মেয়ে এই রিয়া। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়ে গেল ফিরোজের সঙ্গে ওর বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে। আর ফিরোজের আর্থিক অবস্থা, ওর কথামত, ভাল। তাই সম্পত্তি কিংবা অন্য কোন কারণে ও যে লিজাকে খুন করতে চাইবে না, সেটাই প্রকাশ পেল ওর কথায়। অথচ ঘটনার শুরু থেকেই সন্দেহ তালিকায় রয়েছে ওর নাম।'

'ওকে নার্সিং হোমে না যেতে দেয়াই ভাল ছিল বোধহয়।'

'সেটা করতে গেলে ও আরও সতর্ক হয়ে যাবে। আর এ নিয়ে ভাবনার কোন কারণ নেই। ওখানকার নার্স কিংবা ডাক্তারদের কেউই লিজার সঙ্গে ওকে দেখা করতে দেবে না।'

রুমে আরেকবার টোকা পড়ল–ক্যাপ্টেন হোবার্ট। ঢুকেই চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এসব কার বুদ্ধি, মি. রহমান? নার্সিং হোমে রীতিমত কথা কাটাকাটি হয়েছে ডাক্তার আর নার্সদের সঙ্গে। ওরা কাউকেই লিজার সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না। এই অহেতুক হয়রানির মানে কি?' 'এই নির্দেশ নিশ্চয়ই ডা. শিকদার দিয়েছেন। রোগীকে নিরাপদে রাখার দায়িত্ব তাঁর।'

'কিন্তু তাই বলে কি লিজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবরাও ওকে দেখতে পাবে না?'

'একটা ব্যাপার কেন বুঝছেন না!' কণ্ঠে বিরক্তি প্রকাশ পেল আসাদের, 'একজনকে অনুমতি দিলে সবাইকেই দিতে হবে। আর সেক্ষেত্রে রোগীর জীবনের উপর হামলা হবার নতুন সুযোগ যেমন সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ারও সম্ভাবনা আছে।'

একটু গজগজ করলেও ঘটনার গুরুত্ব বোধহয় বুঝতে পারল হোবার্ট। 'দেখা না হয় না-ই হলো কিন্তু ফুল কিংবা অন্য কিছু পাঠানো যাবে তো?'

'খাবার জিনিস ছাড়া অন্য কোনকিছুতেই আপত্তি নেই।'

হোবার্ট চলে যাবার পর আমরাও উঠে পড়লাম। হাঁটতে শুরু করলাম নার্সিং হোমের উদ্দেশে।

ছয়

যেতে যেতে কথা হচ্ছিল। বললাম, 'ব্যাপার কি বলো তো? লিজার ওখানে এখন যাচ্ছো, কোন মতলব নেই তো আবার?'

'মতলব অবশ্যই আছে; কিন্তু মনে হয় যা জানার জন্য যাচ্ছি, ইতিমধ্যেই সেটা জানা হয়ে গেছে।'

আমি এ ব্যাপারে আরও কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সম্পূর্ণ ভিন্ন এক প্রসঙ্গে চলে গেল ও। 'লিজার দাদার অয়েল পেইন্টিংটা বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছিলাম। ওটার দাম হাজার দুয়েকের বেশি হবে না।'

'কিন্তু হঠাৎ করে এ ব্যাপারে তুমি এত আগ্রহ দেখাচ্ছো কেন?'

'ফিরোজ ওটা পাঁচ হাজার টাকায় কিনতে চেয়েছিল। ঝানু ব্যবসায়ীরা কোনকিছু কিনতে গেলে ন্যায্য দামের চেয়েও কম বলে। কিন্তু এক্ষেত্রে ফিরোজের বেশি বলার কারণ কি? আর একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে; ফিরোজও এই লাইনে একজন বিশেষজ্ঞ।'

নার্সিং হোমের একজন নার্স আমাদের স্বাগত জানাল। সম্ভবত ডা. শিকদার আগেভাগে আমাদের ব্যাপারে ওকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। 'মিস লিজার রাতের ঘুমটা ভালই হয়েছিল,' দোতলায় ওঠার সময় বলল ও।

লিজার কেবিনে ঢুকলাম। দোতলার একেবারে কোণের দিককার কেবিনে–ছিমছাম এবং নিরিবিলি। আমাদের দেখতে পেয়ে মলিন হাসি ফুটে উঠল ওর চেহারায়। আসাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে দার্শনিকের মত ও বলল, 'এখনো বেঁচে আছি। তবে আগামী দিনগুলোর কথা জানি না। ঈশ্বরই জানেন, এই সুন্দর পৃথিবীতে আমার আয়ু আর কতক্ষণ–মাস, দিন না ঘণ্টা!'

'অতটা ভেঙে পড়লে চলবে কেন?' স্নেহের সুর আসাদের কণ্ঠে কয়েক মুহূর্ত কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুলো না। নীরবতা ভঙ্গ করল

আসাদই। 'লিজা, একটা কথা সত্যি করে বলবেন? বিষয়টা তদন্তের স্বার্থেই জানতে চাচ্ছি... ।'

'বেশ তো, বলুন না, কি জানতে চান?'

'যা জানতে চাই সেটা হয়তো ইতিমধ্যেই জেনে গেছি, তবুও আপনার মুখ থেকেই তা শুনতে চাই,' কৌতুক খেলা করছে আসাদের চোখের তারায়।

অন্যদিকে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেছে লিজার। 'ওহ্, তা হলে জেনেই ফেলেছেন ব্যাপারটা! না, আমি আর কোনকিছুই গোপন করব না। কিছুদিন আগে রবার্টের সঙ্গে বাগদান হয়েছিল আমার।'

মুখ থেকে কথা সরল না আমার। রবার্টের সঙ্গে লিজার বাগদান হয়েছিল! অথচ কেউই তা জানে না!

'রবার্টের মৃত্যু সম্পর্কে চূড়ান্ত সরকারী ঘোষণার কথা আপনি কখন শুনলেন?' জিজ্ঞেস করল আসাদ।

'কাল সকালে এ ব্যাপারে কে যেন বলাবলি করছিল। তবু বিশ্বাস হতে চায়নি। রাত আটটার খবরে নিজ কানে শোনার পর নিশ্চিত হলাম। কিন্তু মনকে শক্ত রেখেছিলাম যাতে অতিথিদের সামনে কোন কিছু প্রকাশ না পায়।'

'আচ্ছা, কতদিন আগে আপনাদের বাগদান হয়েছিল?'

'গত সেপ্টেম্বরে। আমরা চিটাগাং বেড়াতে গিয়েছিলাম। ঘটনাটা সেসময়ই ঘটে। বাগদান হলো ঠিকই কিন্তু পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখতে বলেছিল ও।'

'কেন?'

'ওর দাদা মেয়ে মানুষের নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারত না। তাই আমাদের ব্যাপারটা যাতে তাঁর কিংবা অন্য কারোর কানে না যায় সে ব্যাপারে বরাবরই সতর্ক ছিল ও।'

'কিন্তু তবু, এসব কথা কেউ না কেউ জেনেই যায়! আচ্ছা এ ব্যাপারে কখনও কি রিয়াকে কোনরকম আভাস দিয়েছিলেন?'

কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর লিজা বলল, 'না, কথাটা কাউকে বলেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'কিন্তু রবার্টের দাদা যখন মারা গেলেন তখনও কি কারো কাছে কথাটা খুলে বলার ইচ্ছে হয়নি?'

'না। একে তো রবার্টের দেশ জোড়া সুনাম। উপরন্তু কোটিপতির

একমাত্র নাতি। সেক্ষেত্রে ওর সাথে আমার বাগদানের ব্যাপারটা অনেকেই হয়তো খুব সহজভাবে নিত না।'

ঘড়ি দেখল আসাদ। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। 'তো, ওঠার আগে কয়েকটা ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক করে দিতে চাই। কোন বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করা চলবে না। বাইরে থেকে পাঠানো খাবার জিনিস ভুলেও মুখে দেবেন না। আর বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেবিনের বাইরে বেরোবেন না।'

আসাদের সাবধানবাণী শুনে চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল লিজার। 'আপনি কি এখনও আমার উপর হামলার আশঙ্কা করছেন?'

'না, ঠিক তা নয়। এখানে আপনি প্রায় সম্পূর্ণ নিরাপদ। তবু সাবধানের মার নেই।'

লিজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম আমরা। ওর কেবিন থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি প্রায়, হঠাৎ কি মনে করে কেবিনের দিকে ফিরে চলল আসাদ। পেছন পেছন আমিও। 'একটা জরুরী কথা মনে পড়ায় আবার বিরক্ত করতে এলাম। আপনি বলেছিলেন অপারেশনের সময় একটা উইল নাকি করা হয়েছিল, সেটা কোথায়?'

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল লিজা। 'খুব সম্ভবত বাড়িতেই আছে সেটা। মনে হয়, বিভিন্ন বিলের রসিদ যে ফাইলে রেখেছি সেখানেই আছে উইলটা। কিংবা বেডরুমেও থাকতে পারে।'

'আপনার বাড়িতে গিয়ে উইলটা বের করলে আপত্তি নেই তো?'

'না, না, আপত্তি কিসের! বরং ওটা খুঁজে পেলে আমারই উপকার হবে। কোথায় যে রেখেছি, কিছুতেই ঠিক মনে করতে পারছি না।'

'আততায়ীর বুদ্ধি আছে বলতে হবে,' নার্সিং হোম থেকে ফেরার পথে মন্তব্য করল আসাদ।

'তা ঠিক,' সায় দিয়ে বললাম, 'এ নিয়ে লিজার উপর কয়েকবার আক্রমণ হলো একটা খুনও হয়ে গেল। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার টিকিটিও স্পর্শ করতে পারলাম না।'

'আমি সেসব নিয়ে ভাবছি না। ভাবছি অন্য কথা। যা উদ্‌ঘাটিত হলে সমস্ত ঘটনার চেহারাই পাল্টে যেতে পারে।'

'অত ভণিতা না করে খুলেই বল না!'

'মাত্র কিছুদিন আগে রবার্টের দাদা মারা যান। তিনি দেশের হাতেগোনা ধনীদের একজন ছিলেন। একমাত্র উত্তরাধিকারী হিসেবে দাদার সম্পত্তি রবার্টের পাওয়ার কথা। পরের ঘটনা হলো, গ্লাইডারসুদ্ধ ও বঙ্গোপসাগরে নিখোঁজ। এবং এর পর পরই লিজার উপর আক্রমণ আসতে

শুরু হলো। ধরে নিই, গ্লাইডার-যাত্রার আগে একটা উইল করেছিল রবার্ট। যেহেতু ওর কোন নিকট-আত্মীয় নেই; তাই উইলে পুরো সম্পত্তিই লিজাকে লিখে দিয়েছিল–আর এটাই স্বাভাবিক।'

'এটা তো তোমার অনুমান মাত্র; কোন প্রমাণ হাজির করতে পারবে?'

'অনুমান হলেও সবকিছু কিন্তু খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে। আর তাই যদি না হবে তাহলে এ ক'দিনের ঘটনাগুলো কোন অর্থ দাঁড় করানো যাবে না।'

'কিন্তু লিজার সাথে ওর বাগদানের কথাটা তো কেউ জানে না।'

'ধ্যাত্! কেউ জানে না এমন কিছুর অস্তিত্ব নেই। সব কথাই আগে হোক আর পরেই হোক, কেউ না ঠিক ঠিকই জেনে যায়। লিজা না বললেও রবার্ট হয়তো কাউকে বলে থাকতে পারে। কিংবা এমনও হতে পারে, ওদের পরস্পরের কাছে লেখা কোন চিঠি থেকে ব্যাপারটা কেউ জেনে গেছে। আর এদিক দিয়ে বিচার করলে কথাটা রিয়ার জানার সুযোগ অন্য যে কারোর চেয়ে বেশি।'

'আচ্ছা, লিজার উইলের বিষয়বস্তু কি রিয়া জানত?'

'না জানার কোন কারণ তো দেখছি না। তো যে কথা বলছিলাম, কাল লিজা মারা গেলে ওর সম্পত্তির মালিকানা চলে যেত উইলে মনোনীত ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তিবর্গের হাতে। আর তাতে রিয়াই লাভবান হত সবচেয়ে বেশি। এ ছাড়া এখানে আরও একজনের কথা চলে আসে–অ্যালবার্ট।'

'কিন্তু ওকে দিয়েছে কেবল বাড়িটা, আর সব কিছুই তো রিয়ার নামে লিখে দিয়েছিল লিজা।'

'এ কথা অ্যালবার্টের জানা না-ও থাকতে পারে। আর তাই কাল রাতে লিজার মৃত্যু হলে ধারণামত, নিকট–আত্মীয় হিসেবে লিজার সমস্ত সম্পত্তির সিংহভাগ ওরই পাবার কথা।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে ঘুরে ফিরে দুটো নামই বারবার উঠে আসছে সন্দেহ তালিকার সবচেয়ে উপরে।'

আঁকাবাঁকা পথ ধরে কিছুক্ষণের মধ্যে লিজার বাড়ি পৌঁছে গেলাম। ওপর থেকে আমাদের দেখতে পেয়ে এসে দরজা খুলে দিল বুয়া। তার চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ। আসাদের এক প্রশ্নের উত্তরে মুখে যেন খই ফুটল তার, 'কি কৈতাম সাব, বাড়িটা বেশি ভালা না। দেয়ালে কান পাতলে আফনেও টের পাইবেন। আমার বয়স যখন ছয় বছর তখন থিকা এই বাড়িতে আছি। আফামণির দাদা আমারে নিজের মাইয়ার মতই দ্যাখতেন। বাড়িটা আসলেই খুব খারাপ। খারাপ লোকের আত্মা আর ভূত-পেত্নী আইসা রাতে আসর জমায়। আফামণিরে কত কইছি এই বাড়িটা ছাইড়া

দিয়া নতুন বাসা ভাড়া লইতে-হে কুনো কথা কানে লয় না.... ।'

ওর কথায় বাধা দিয়ে হঠাৎ বলে উঠল আসাদ, 'কাল রাতের বেলা কোন গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছিলে, এই ধর আটটার দিকে?'

'না তো, বাজির আওয়াজেই কান ফাইট্যা যাওনের জোগাড়, গুলির শব্দ হুননের সময় কই?'

'আচ্ছা, ভাল করে ভেবে বল তো, ঐ সময় কি করছিলে?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর মুখ দিয়ে কথা বেরুলো বুয়ার, 'তহন বাসন–পেয়ালা ধোওনের কামে ব্যস্ত আছিলাম ।'

'মানে, বাজি পোড়ানো দেখতে বাইরে যাওনি?'

'না, হাতে বহু কাম জইমা আছিল তাই সময় পাই নাই ।'

'ঐ সময় কি লিজার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?'

'হ, ফোন ধরনের লেইগা একবার এই দিকে আইছিল । তারপরে আর দেহি নাই । হেই সময় এলি আফামণির লগেও দেহা হইছিল একবার–গরম চাদর লওনের লেইগা উপরে যাইতে ছিলেন তহন ।'

'যাক, এবারে বল তো, এই বাড়িতে কি কোথাও তলকুঠুরি আছে?'

চোখ বড় বড় করে আসাদের দিকে চাইল বুয়া । বোধহয় কথাটার মানে বুঝতে পারেনি । আসাদ সহজ করে বুঝিয়ে দিতেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল ও । 'হ, আমি যখন খুব ছোট তখন যেমুন একদিন এই রকম ছোট একটা খুপরি কোথায় যেমুন দেখছিলাম । কিন্তু কোন্ ঘরে এই খুপটিটা আছে অহন তা মনে নাই ।'

'তুমি কি একেবারে নিশ্চিত, বাড়ির কোথাও এরকম একটা খুপরি আছে?'

'জ্বে ।'

বুয়া চলে যাবার পর আসাদকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, বাড়িতে কোন তলকুঠুরি কিংবা খুপরি আছে কিনা তা জানার জন্য এত আগ্রহ দেখাচ্ছ কেন?'

'মনে আছে আমাদের সেই তালিকাটার কথা? ঐ তালিকার দশ নম্বরী ভদ্রলোক কিংবা ভদ্রমহিলা যদি কাল রাতে তলকুঠুরিতে নিজেকে লুকিয়ে রেখে পরে সময়মত বের হয়ে আঘাত হেনে শটকে পড়ে তাহলে খুব একটা অবাক হবার কিছু থাকবে না । যাক, এবারে চল, লিজার রুমে গিয়ে উইলটার খোঁজ করি ।'

লিজার বেডরুম দোতলায় । কিছুটা অগোছাল । কাপড়-চোপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র রুমের চারদিকে ছড়ানো ছিটানো । ওর অনুপস্থিতিতে

কেউ রুমে ঢুকে জিনিসপত্র হাতড়েছিল কিনা কে জানে! কথাটা আসাদকে বললাম। সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল ও। একটা চেষ্ট অভ ড্রয়ারের ভেতরে বেশ কিছু কাপড়-চোপড় পাওয়া গেল। বেশির ভাগই মেয়েদের অন্তর্বাস। একটা কাগজের বাণ্ডিলও চোখে পড়ল। সেটায় নানারকম বিলের রসিদ। একটা চিঠিও পাওয়া গেল। তারিখ নেই। রিয়া লিখেছে ঃ

লিজা,

শুভেচ্ছা নিস। সেদিন আসরটা জমেছিল ভালই। না এসে ভাল করেছিস। এ এক সর্বনাশ নেশারে! জিনিস ফুরিয়ে গেলেই মাথা খারাপ হবার অবস্থা হয়। একজনকে বলেছি তাড়াতাড়ি কিছু যোগাড় করে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য। জীবনটাই এখন কেমন যেন দুঃসহ হয়ে উঠেছে।

ভাল থাকিস–

রিয়া।

বোঝা গেল, নেশা করে রিয়া। কিন্তু ওকে দেখে তো মনে হয় না। হয়তো চূড়ান্ত সর্বনাশ এখনও হয়নি। চেষ্ট অভ ড্রয়ারে আর তেমন কিছু পাওয়া গেল না। পাশের টেবিলে রাখা লিজার ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্লু বুক ইত্যাদি উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল আসাদ। টেবিলের ড্রয়ারটা টান দিলাম। কয়েকটা খাতা আর রাইটিং প্যাড পাওয়া গেল। ওগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে গিয়ে ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ছোট একটা চিঠির বাণ্ডিল। চিঠিগুলো রবার্টের লেখা। চিঠিগুলো তুলে দিচ্ছিঃ

ডার্লিং জানুয়ারি,

১

ভালবাসা। আর সাথে রইল নববর্ষের শুভেচ্ছা। তোমার কথামত রুটিনমাফিক চলাফেরায় মন দিয়েছি। সত্যি, আমার এই ছন্নছাড়া জীবনে শুধু তোমার ভালবাসাই বাঁচিয়ে রেখেছে আমাকে। মাঝেমধ্যে নিজেই অবাক হয়ে যাই, সত্যি কি তুমি আমাকে এত ভালবাস? চট্টগ্রামের ঐ দিনগুলোর কথা চিরদিন মনে থাকবে আমার।

তোমারই–

রবার্ট।

এই,

ফেব্রুয়ারী, ৮

লক্ষ্মী মেয়ে, রাগ কর না। জানোই তো, তোমাকে দেখার জন্য আমি

কতটা উতলা হয়ে থাকি। আসলে বুড়ো দাদাটাই যত গণ্ডগোলের মূল। তোমার সঙ্গে আমাকে দেখতে পেলে নির্ঘাত বন্দুক নিয়ে তাড়া করবে বুড়ো। আশা, করি, পুরো ব্যাপারটা তুমি বুঝবে।

ভাল থেকো।
তোমারই–
রবার্ট।

লক্ষ্মী মেয়ে,

ভালবাসা নিও। তোমার অনুপ্রেরণাতেই তো সব কিছু এত সুন্দর ভাবে গুছিয়ে এনেছি। যদি গ্লাইডারে করে বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে ঠিক ঠিকই চক্কর দিয়ে আসতে পারি তা হলে আর পায় কে! তখন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বুক ফুলিয়ে বুড়োর সামনে দাঁড়ানো যাবে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করনা।

তোমারই–
রবার্ট।

ডার্লিং

ভালবাসা জেনো। তোমার বুদ্ধির কোন তুলনা হয় না। তোমার কথাই আসলে সত্যি। ঐ চিঠিটা আমি সব সময় যত্ন করে নিজের কাছে রাখি। কি বলব, অন্যসব মেয়েদের চেয়ে তুমি এতই আলাদা রকমের যে মাঝেমধ্যে ভাবনা এসে মনে ভিড় করে–তুমি কি সত্যিই মানুষ, নাকি দেবী?

ভাল থেকো–
রবার্ট।

শেষ চিঠিটাতে কোন তারিখ ছিল না।

লক্ষ্মীটি, কাল রওনা হচ্ছি। রোমাঞ্চ আর উত্তেজনায় ছেয়ে আছে মন। তুমি আবার এ ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না। এরকম কাজে ঝুঁকি তো কিছু থাকবেই। কিন্তু তোমার ভালবাসার জোরে সেই ঝুঁকিটুকু অনায়াসেই অতিক্রম করে যাবে।

ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই এক বন্ধু বলেছিল একটা উইল করতে। কিন্তু এখন আমি এত ব্যস্ত যে চট্টগ্রামে গিয়ে সলিসিটরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। তাই সাক্ষী রেখে সাদা কাগজেই উইলটা লিখে ওর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার পুরো নাম তো এলিজাবেথ গোমেজ, তাই না? কিন্তু বাবার নামটা মনে নেই। অবশ্য দাদার নাম মাইকেল গোমেজ ঠিক ঠিকই মনে আছে। যাক, এ শুধু বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার জন্যই

করা। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, কয়েকদিনের মধ্যেই দেখা হচ্ছে আমাদের।

তোমারই–
রবার্ট।

চিঠিগুলো পড়া শেষ করে জায়গামত রেখে দিল আসাদ। হঠাৎ করেই ওর চোখমুখ যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'দেখলে, যা আন্দাজ করেছিলাম, ঘটনাটা কিন্তু সেই পথেই এগুচ্ছে। রবার্টের উইলের ব্যাপারটা এখন আর অনুমান মাত্র নয়। যে-কোন অর্ধশিক্ষিত লোকও চিঠিটা পড়লে পরিষ্কার বুঝতে পারবে সবকিছু।'

'বুয়ার পক্ষে কি চিঠিটার মর্ম উদ্ধার করা সম্ভব?'

'খুবই সম্ভব! প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষাদীক্ষা না থাকলেও অক্ষরজ্ঞান নিশ্চয়ই আছে ওর।'

'আমরা কিন্তু আসল জিনিসটা এখনও খুঁজে পেলাম না–লিজার উইল।'

'হুঁ। লিজাকে এ ব্যাপারে আবার একটু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে। হয়তো অন্য কোথাও রেখেছে, মনে করতে পারছে না। ওর মত অগোছাল মেয়েদের স্বভাবই এই।'

আমরা নিচে নামতেই বুয়ার সঙ্গে আবারও দেখা হলো। কোনরকম রাখঢাক না করে সরাসরি ওকে জিজ্ঞেস করল আসাদ, 'তোমার আপামণির সঙ্গে নাকি রবার্টের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়েছিল?'

চোখ কপালে উঠল বুয়ার, 'কন কি! এমুন কথা তো কুনদিন কাউরে কইতে হুনি নাই?'

লিজার বাড়ি থেকে বের হয়ে একটা রিকশায় চাপলাম। নার্সিং হোমে গিয়ে উইলেল ব্যাপারে ওকে আবার জিজ্ঞেস করতে হবে।

আবার আমাদের দেখতে পেয়ে একটু যেন অবাকই হলো লিজা। চোখেমুখে একরাশ জিজ্ঞাসা। আসাদ ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, 'আপনার রুমটায় আমরা দুজনে মিলে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি কিন্তু উইলটার হদিস করা যায়নি!'

'বাদ দিন। ওটা না পেলেও কোন ক্ষতি নেই। আমি তো এখনো দিব্যি বেঁচেবর্তে আছি।'

'তা ঠিক। কিন্তু তদন্তের জন্য উইলটা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। আপনি আর একটু মনে করার চেষ্টা করুন তো, ওটা অন্য কোথাও

রেখেছেন কিনা!'

কয়েক মুহূর্ত কি যেন ভাবল লিজা। 'আমার তো কিছুতেই মাথায় আসছে না; গেল কোথায়, উইলটা!'

'বাড়ির গুপ্ত কুঠুরিতে রাখেননি তো আবার?'

'মানে?' ভ্রু কুঁচকে গেল লিজার।

'বুয়া বলছিল বাড়ির কোথায় যেন একটা গুপ্ত কুঠুরি আছে।'

'রাবিশ! বাড়িতে এ ধরনের কিছু একটা থাকলে আমি জানব না?'

'আমারও তো সেই একই প্রশ্ন। কিন্তু বুয়া এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত। ওর ছোটবেলায় আপনার দাদা নাকি ওকে কুঠুরিটা দেখিয়েও ছিলেন একদিন। কুঠুরিটা ঠিক কোথায়, এত বছর পরে সেটা আর মনে নেই ওর।'

'কি জানি! তবে যা-ই বলুন না কেন, গুপ্তকুঠুরির কথাটা আজই প্রথম শুনলাম।'

'যাক এবারে অন্য কথায় আসি। কাল রাতে বাজি পোড়ানো দেখার জন্য আপনি কি বুয়াকে ছুটি দিয়েছিলেন?'

'এ ব্যাপারে ছুটি দেয়ার কিছু নেই। বাড়ির কাজের লোকেরা ঐ সময় ইচ্ছে হলে উঠোনে বসে বাজি পোড়ানো দেখতে পারে। অনেকদিন আগে থেকেই এ নিয়ম চলে আসছে।'

'কিন্তু বুয়া কাল রাতে বাজি পোড়ানো দেখার জন্য ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোয়নি।'

'বাজি পোড়ানো দেখার ব্যাপারে বুয়া বরাবরই আগ্রহী। তা সে যত কাজই হাতে থাকুক না কেন। আর তাই তো ব্যাপারটা আমার কাছে কেমন যেন বেখাপ্পা মনে হচ্ছে।'

'বুয়া কিন্তু বাজি পোড়ানো না দেখার সত্যিকার কারণটা আমাদের বলেনি,' অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে, লিজার দিকে চাইল আসাদ।

'তা ছাড়া বাড়িতে গুপ্তকুঠুরি আছে–এরকম একটা কথা কেন ছড়াচ্ছে, সে?'

'যাক, যে জন্য আপনার বাড়িতে যাওয়া সেই কাজটাই কি হলো না। আচ্ছা, উইলটা লেখার সময় আপনি কি উইল ফর্ম ব্যবহার করেছিলেন?'

'না, খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে ওটা করা হয়েছিল। সাদা কাগজই ব্যবহার করেছিলাম। এ ছাড়া মি. ডি কস্টা বললেন ছাপানো ফরমে কখনো কখনো নাকি দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হয়; তার চেয়ে উপযুক্ত সাক্ষী রেখে সাদা কাগজে করলেই সুবিধে...ওহ্,' কি আশ্চর্য! এ রকম একটা কথা ভুলে গেলাম কি করে! আরে, উইলটা সেই সময়েই তো মি. ডি কস্টাকে

দিয়েছিলাম চট্টগ্রামে অ্যালবার্টের ঠিকানায় পোস্ট করার জন্য। আর এদিকে খামকাই হয়রানি করলাম আপনাদের। মনে হচ্ছে, স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছে আমার!'

'উইলে সাক্ষী কারা ছিল?'

'বুয়া ও তার স্বামী। আপনারা ইচ্ছে করলে চট্টগ্রামে অ্যালবার্টের অফিসে গিয়ে উইলটা দেখে আসতে পারেন।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনার অনুমতিরপত্র ছাড়া উইলটা দেখাতে উনি কি রাজি হবেন?'

ব্যাপারটা যেন মাথায় ঢুকল না লিজার। সাইড টেবিল থেকে কাগজ-কলম নিয়ে আসাদ যা যা বলল তাই-ই লিখে নিল ও। শেষে একটা সই দিয়ে কাগজটা বাড়িয়ে দিল আমাদের দিকে। এবারে উঠতে হবে। হঠাৎ নজর গেল পাশের টেবিলে রাখা একগুচ্ছ টাটকা রজনীগন্ধার দিকে। 'রিয়া পাঠিয়েছে,' বলল লিজা, 'আর ফিরোজ পাঠিয়েছে লাল গোলাপের তোড়া। আর এই দেখুন,' একটা চৌকো বাক্স বের করল ও, 'আপেলগুলো পাঠিয়েছেন মি. ডি কস্টা।'

মুহূর্তেই চেহারা পাল্টে গেল আসাদের, 'ওগুলো থেকে কি আপনি খেয়েছেন?'

'না, এখনো খাইনি, কেন বলুন তো?'

'আপনাকে আবারও সাবধান করে দিচ্ছি, বাইরে থেকে পাঠানো কোনকিছু মুখে দেয়া চলবে না।'

চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠল লিজার, 'আপনি কি মনে করেন চক্রান্ত এখনো শেষ হয়নি! আততায়ী কি শেষ পর্যন্ত নার্সিং হোমেও হামলা চালাবে?'

'না, আপনি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ,' অভয় দিল আসাদ, 'কিন্তু তবু, সাবধানের মার নেই।'

বিদায় নেয়ার সময় লিজার ফ্যাকাশে চেহারায় স্পষ্ট আতঙ্কের ছাপ দেখতে পেলাম।

সাত

চট্টগ্রাম পৌঁছোতে লেগে গেল ঝাড়া তিন ঘণ্টা। জাফরের জীপটা পাওয়া গিয়েছিল বলেই রক্ষা, বাসে কিংবা কোস্টারে গেলে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তার ঝাঁকুনির চোটে নাড়ীভুঁড়ি হজম হয়ে যেত।

অফিসেই পাওয়া গেল অ্যালবার্টকে। আমাদের দেখে খুব একটা খুশি হয়েছে বলে মনে হলো না। তবু ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'বলুন, আপনাদের জন্য কি করতে পারি?'

পকেট থেকে লিজার লেখা অনুমতিপত্রটা বের করে অ্যালবার্টের হাতে দিল আসাদ। সেটায় কয়েকবার চোখ বুলিয়ে বলল ও, 'কিন্তু আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'কেন, অনুমতিপত্রে লিজা কি সবকিছু পরিষ্কার করে লেখেনি?'

'না, না, বিষয়বস্তু ও খোলাসা করেই লিখেছে। আর সেখানেই হয়েছে সমস্যা। চিঠিতে আপনাদের কাছে লিজার উইলের কপি দিতে বলা হয়েছে, যা নাকি গত ফ্রেব্রুয়ারী থেকেই আমার কাছে আছে।'

'তা হলে, আপত্তিটা কোথায় আপনার?'

'মি. রহমান,' গলার স্বর খানিকটা চড়ল অ্যালবার্টের, 'এর কম কোন উইল আমার কাছে গচ্ছিত রাখতে দেয়া হয়নি।'

'আশ্চর্য!'

'হ্যাঁ, আশ্চর্যই বটে! আমি যতদূর জানি লিজা কখনোই কোন উইল করেনি।'

'কিন্তু ওর অপারেশনের ঠিক আগে সাদা কাগজে একটা উইল করেছিল বুয়া আর তার স্বামীকে সাক্ষী রেখে। সেটা ডাকযোগে আপনার কাছে পাঠানো হয়েছিল।'

'যদি তাই হয়ে থাকে তা হলে সেটা আমার ঠিকানায় পৌঁছেনি।'

'সেক্ষেত্রে আপনার কাছ থেকে আমাদের আর বিশেষ কিছু জানার নেই

বোধহয়।' উঠে দাঁড়াল আসাদ।

'মনে হয় পুরো ব্যাপারটায় কোথাও কোন ভুল হয়েছে,' আমাদের বিদায় জানানোর সময় মন্তব্য করল অ্যালবার্ট।

সেই এবড়োথেবড়ো পথে আমাদের জীপ ফিরে চলল কক্সবাজারের উদ্দেশে। উইলের ব্যাপারটা যে আসাদকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে তা ওর চেহারা দেখেই বেশ বোঝা যাচেছ। বললাম, 'তোমার কি মনে হয় অ্যালবার্ট এ ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেছে?'

'বলা মুশকিল। আর এ ধরনের মানুষ একবার কোনকিছু বলে ফেললে তা থেকে কিছুতেই তাকে টলানো যায় না। উইলের ব্যাপারটা একবার যখন অস্বীকার করেছে, তখন কিছুতেই তাকে দিয়ে আর অন্যরকম কিছু বলানো যাবে না।'

'লিজাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করলে হয়, উইলের প্রাপ্তি স্বীকারপত্র নিশ্চয়ই থাকবে ওর কাছে।'

'কি যে বলো, তার ঠিক নেই। যে উইলেরই কোন খোঁজ রাখে না, সে রাখবে প্রাপ্তিস্বীকার পত্র!'

জীপ আমাদের হোটেলের কাছাকাছি এসে পড়েছে। আসাদ ড্রাইভারকে লিজার বাড়ির দিকে যেতে বলল। 'ডি কস্টাদের সঙ্গে উইলের ব্যাপারে আলাপ করতে হবে,' বলল আসাদ, 'কারণ উইলটা করার জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি মি. ডি কস্টাই সম্পন্ন করেছিলেন।'

রাতের খাবারের আয়োজন করছিলেন মি. ডি কস্টা। আমাদের আসার খবর পেয়ে বেরিয়ে এলেন। নোংরা হাত। তাই করমর্দন না করে ভেতরে চলে গেলেন। হঠাৎ শিসের শব্দ শোনা গেল। একটু পর মি. ডি কস্টা আবার বেরিয়ে এসে ভেতরে নিয়ে গেল আমাদের। মিসেস ডি কস্টাকে দেখলাম আগের মতই হাস্যো-জ্জ্বল। আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে লিজার খবর এবং এলির খুনের অনুসন্ধানের ব্যাপারে একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন। যতটা সম্ভব সংক্ষেপে সেগুলোর উত্তর দিয়ে চলল আসাদ। এক সময় উনি একটু ক্ষান্ত হতেই চট্ করে কাজের কথায় চলে এলে ও, 'ভাল কথা, লিজার অপারেশনের আগে যে উইলটা করা হয়েছিল তাতে সাক্ষী কারা ছিল?'

'বুয়া আর তার স্বামী।'

'উইলটা লেখার পর অ্যালবার্টের ঠিকানায় পোস্ট করার জন্য আপনাদের কাছেই তো দেয়া হয়েছিল... ।'

'হ্যাঁ, আমি নিজে সেটা খামে ভরে অ্যালবার্টের ঠিকানায় পোস্ট

করেছিলাম,' এবারে জবাব দিলেন মি.ডি কস্টা।

'আজ বিকেলে চট্টগ্রামে গিয়ে অ্যালবার্টের সঙ্গে দেখা করেছি। উইলের কথা তুলতেই ও বলল এরকম কোন উইল ওর হাতে পৌঁছোয়নি।'

'আশ্চর্য! আমি তো ওর ঠিকানা লিখে, ডাকটিকেট লাগিয়ে রাস্তার ধারের ঐ ডাকবাক্সটায় নিজে গিয়ে পোস্ট করেছি!'

'আপনি নিশ্চিত, রাস্তার ধারের ঐ ডাকবাক্সতেই সেটা ফেলেছিলেন? কোন রকম ভুল ভ্রান্তি... ।'

'ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি ঐ ডাকবাক্সতেই উইলটা পোস্ট করেছিলাম,' অসুন্তুষ্ট গলায় উত্তর দিলেন ডি কস্টা।

'যাক এ নিয়ে খামকা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। লিজা তো বহাল তবিয়তে এখনো বেঁচেবর্তে আছে। আর তাই ঐ উইলের তেমন কোন মূল্য নেই।'

ডি কস্টাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলের পথে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। কথা হচ্ছিল উইলটার ব্যাপারেই। বললাম, 'এখানে মিথ্যে বলছে কে, অ্যালবার্ট নাকি ডি কস্টা?'

'ডি কস্টার মিথ্যে বলার পেছনে কোন কারণ দেখছি না। উইলটা লুকিয়ে রেখে তার কোন লাভ নেই। এ ছাড়া লিজার বক্তব্যের সঙ্গে ওর কথা পুরোপুরি মিলে যায়। উইলের ব্যাপারে ডি কস্টারা হয়তো সত্যি কথাই বলেছে, কিন্তু ওদের চালচলনে কেমন যেন একটা লুকোচুরির ব্যাপার আছে। আজ আমরা যখন ওদের ওখানে পৌঁছলাম তখনও সেদিনের মত শিসের শব্দ ভেসে আসছিল।'

'হ্যাঁ, আমিও শুনেছি।'

'আজ ডি কস্টা রান্না করার সময় তার তেল মাখানো হাত একটা কাগজে মুছেছিল। সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমি ঐ কাগজটা নিয়ে এসেছি। কাগজটা জাফরকে দিয়ে পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

রাতের খাওয়া সারতে সারতে প্রায় দশটা বেজে গেল। আসাদ বেশ যুত করে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। আমি শুয়ে পড়ব কিনা ভাবছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল, খুলে দিতেই ভেতরে ঢুকলেন কক্সবাজার থানার এসআই মি. ওয়াকার হাসান। এর আগেও দিন দুয়েক দেখা হয়েছে ভদ্রলোকের সঙ্গে। এই ক'দিনে আসাদের সঙ্গে বেশ অন্তরঙ্গতা জন্মেছে ওঁর। এলির হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কথা উঠতেই উনি বললেন, 'লিজাকে এভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে তো নার্সিং হোমে পাহারা দিয়ে রাখা যাবে না।'

'তা ঠিক,' সায় দিল আসাদ, 'কিন্তু আপাতত এ ছাড়া আমাদের তেমন কিছুই করার নেই।'

'আততায়ী যে পিস্তলটা ব্যবহার করেছে সেটারও কোন হদিস পাওয়া গেল না–পেলে সূত্র হিসেবে খুবই কাজে লাগত আমাদের।'

'ওটা আর খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। সমুদ্রের তলায় বরং খুঁজে পেতে পারেন!'

'আচ্ছা, খুনী হিসেবে আপনার কাকে বেশি সন্দেহ হয়?'

'তাৎক্ষণিক মোটিভ বিচার করলে অ্যালবার্ট আর রিয়াকেই সন্দেহ তালিকার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে রাখতে হয়।'

'আমারও তাই মনে হয়। তবে খুনী যদি অ্যালবার্ট হয় তা হলে খুব হিসেব করে এগুতে হবে আমাদের। লোকটা একেই তো উকিল তার উপর যথেষ্ট সাবধানী। আর রিয়া হলে জাল পাতা সহজ হবে। মেয়েমানুষের স্বভাব তো, সহজেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। হয়তো দুই একদিনের মধ্যে আবার হামলার পরিকল্পনা করতে পারে।'

'মি. হাসানের কথায় মাথা নেড়ে সায় দিল আসাদ। বিদায় নেয়ার জন্য উঠে দাঁড়িয়েও আবার বসে পড়লেন তিনি। পকেট থেকে একটা দোমড়ান কাগজ বের করে আসাদের দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। হাতের চেটো দিয়ে সেটা সমান করে চোখ বুলাল আসাদ। আমিও দেখলাম কাগজটা। তাতে লেখাঃ '...টাকা দিতেই হবে...যদি না দাও...বুঝবে মজা...এই শেষবারের মত... ।' কাগজটা মাঝ বরাবর দু-ভাগ হয়েছে, দেখলেই বোঝা যায়।

মৃতদেহের সামান্য দূরে কাগজটা পাওয়া গেছে,' বললেন মি. হাসান।

'এটা কি আমার কাছে রাখতে পারি?'

'অবশ্যই। যদিও এতে কোন আঙুলের ছাপ নেই। তবু দেখুন, তদন্তের কাজে হয়তো এটা কোনভাবে সাহায্য করতে পারে,' উঠে দাঁড়ালেন মি. হাসান।

কাগজটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করল আসাদ। আমিও আর একবার ভাল করে পরখ করলাম কাগজটা। হাতের লেখাটা এর আগে কোথাও যেন দেখেছি... । হ্যাঁ, এবারে মনে পড়েছে। রিয়ার বাড়িতে বাজে কাগজের স্তূপে এই হাতের লেখাটা যেন দেখতে পেয়েছিলাম। কিন্তু এটা রিয়ার হাতের লেখা নয়। কথাটা বললাম আসাদকে। সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল ও। কাগজটা পাশের টেবিলে পেপারওয়েট চাপা দিয়ে রাখল। সারাদিনের ধকলের পর দু'চোখ যেন

আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসছে। আর দেরি না করে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে নাশতা সেরে বাইরে বেরোনোর জন্য তৈরি হচ্ছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল ক্যাপ্টেন হোবার্ট। এই সাত সকালেই ক্যাপ্টেনের শ্রীমুখ দেখার জন্য আমরা কেউ তৈরি ছিলাম না। বোধহয় সে কথা বুঝতে পেরে কোনকিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সাফাই গাইতে শুরু করল সে, 'যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলাম, ভাবলাম লিজার ব্যাপারে নতুন কোন খবর থাকলে জেনেই যাই বরং...'

'না, এমুহূর্তে নতুন কোন খবর আপনাকে দিকে পারছি না। বলে দুঃখিত,' বলল আসাদ।

'তদন্তের কি কোনই অগ্রগতি হয়নি?'

'অগ্রগতি তো হয়ইনি, এখন মনে হচ্ছে, যেন পিছিয়ে পড়েছি আমরা। শেষ পর্যন্ত এর রহস্যের কিনারা করা যাবে কিনা সন্দেহ!'

'তবু আপনার উপর সবার আস্থা আছে। দৈনিক জনবার্তা তো প্রতিদিন আপনার অতীতের আশ্চর্য সব রহস্যভেদের কাহিনি প্রকাশ করে চলেছে। এখানকার পুলিশ কর্মকর্তারাও আপনার উপর ভরসা করে আছে। আপনি নিশ্চয় সবাইকে নিরাশ করবেন না?'

'আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি হবে না; তবে আততায়ীকে পাকড়াও করতে পারব কিনা জানি না।'

'কাউকে কি সন্দেহ হয় আপনার?'

'হলেও এ মুহূর্তে তা বলা উচিত হবে না।'

'আমার অ্যালিবাইতে নিশ্চয়ই কোন ফাঁক নেই, কি বলেন?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল হোবার্ট।

'সবার অ্যালিবাই-ই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে সবাইকে নির্দোষ বলে রায় দিতে হয়। কিন্তু এখানে অ্যালিবাইটা বড় কথা নয়। বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে পুরো ব্যাপারটা বিচার করতে হবে আমাদের। এবারে একটা কথার জবাব দিন তো, লিজার ব্যাপারে আপনার কি কোনরকম দুর্বলতা আছে?'

চেহারাটা রক্তিম হয়ে উঠল নাবিকের। 'লিজাকে আমি বরাবরই পছন্দ করি। সরাসরি না হলেও আকারে-ইঙ্গিতে কথাটা ওকে জানিয়েছিলাম। কিন্তু মনে হয়, ও কোন একজনের সঙ্গে জীবনকে জড়ানোর চেয়ে নিত্য নতুন বয়ফ্রেণ্ডের সঙ্গ বেশি পছন্দ করে।'

'কিন্তু, শুনেছেন বোধহয়, রবার্টের বাগদত্তা ছিল ও।'

'ও, কথাটা তা হলে সত্যি! অবশ্য এলির মৃত্যুর দিন দুয়েক আগে কথায় কথায় লিজা বলেছিল ও নাকি কোন একজনের বাগদত্তা। এর বেশি আর কিছু বলেনি, আমিও জানতে চাইনি।'

'রবার্টের বিরাট সম্পত্তির মালিক এখন লিজা,' বলল আসাদ, 'এখনই ওকে যে খুন করতে চাইবে সে একটা আস্ত গর্দভ। আর হ্যাঁ, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই বদলে যায়। লিজাও ভবিষ্যতে কখনো আর কারো সঙ্গে নিজেকে জড়াবে না তা কে বলতে পারে!'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল হোবার্ট, এমন সময় আবার টোকা পড়ল দরজায়-এবারে রিয়া। হোবার্টকে দেখতে পেয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল ও, 'সারা সকাল থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি কিনা এখানে! আমার ঘড়িটার কি করলে, যেটা সারাতে দিয়েছিলাম?'

'এই তো, ' পকেট থেকে বেঢপ সাইজের একটা হাতঘড়ি বের করে রিয়াকে দিল হোবার্ট। 'কালই দোকান থেকে ডেলিভারি নিয়েছি; কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি-জিনিসটা তাই পকেটে পকেটেই ঘুরছে কাল থেকে।'

বেঢপ সাইজের ঘড়িটা রিয়ার হাতে কেমন যেন বেমানান লাগছে। আজকাল ইলেকট্রনিক ঘড়ির দাপটে এগুলোর চল তেমন একটা নেই। ফ্যাশন হিসেবে আবার নতুন করে ফিরে আসছে কিনা কে জানে! হঠাৎই মনে পড়ল, লিজাও এরকম একটা ঘড়ি ব্যবহার করে।

আসাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল রিয়া, 'কি ব্যাপার! কোন গোপন শলা-পরামর্শ হচ্ছিল বুঝি? এসে বিরক্ত করলাম না তো?'

'মোটেই না, বরং প্রভাতী আড্ডাটা আরও জমজমাট হলো। বসুন না! বলছিলাম, খবর কত তাড়াতাড়ি ছড়ায়। রবার্টের সঙ্গে লিজার বাগদানের কথাটা শুনেছেন বোধহয়।'

দু-চোখ যেন কপালে উঠল রিয়ার। ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে আসাদ বলল, 'মনে হচ্ছে কথাটা শুনে বেশ অবাক হয়েছেন আপনি?'

'না, ঠিক তা নয়। বছর দেড়েক থেকেই ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু শেষবার যখন ওদের একসঙ্গে দেখি, তখন মনে হচ্ছিল সবকিছু বোধহয় চুকেবুকে গেছে, দুজনের মধ্যে কেমন যেন ছাড়াছাড়া একটা ভাব।'

'স্বাভাবিক। ব্যাপারটা ওরা আগাগোড়াই গোপন রাখতে চেয়েছিল রবার্টের দাদার ভয়ে। উনি একথা জানতে পারলে ওকে আর আস্ত রাখতেন না। একটা কথা ভেবে সত্যি ভীষণ অবাক হচ্ছি। আপনি লিজার এত

ঘনিষ্ঠ বান্ধবী হয়েও কথাটা আগে শোনেননি সত্যি অবাক কাণ্ড!'

'ওকে বোঝা বড় শক্ত,' মন্তব্য করল রিয়া, 'এমনিতে খোলামেলা স্বভাবের হলেও কিছু ব্যাপারে সাংঘাতিক চাপা...'

হঠাৎ টেবিলে রাখা কাগজটার উপর চোখ পড়তেই চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর। মূর্ছা যাওয়া রোগীর মত ঘেমে উঠেছে ও। দু-হাতে দিয়ে মুখ ঢাকল তাড়াতাড়ি।

'কী ব্যাপার! শরীর খারাপ লাগছে? পানি দেব?'

'না, না, কিছু হয়নি আমার,' আসাদকে আশ্বস্ত করল ও, 'হঠাৎ মাথাটা কেমন চক্কর দিয়ে উঠেছিল। যাক, এবারে বলুন, হত্যারহস্যের কতদূর কি হলো? নতুন কোন সূত্র পেলেন?'

'নাহ্, তদন্তের অগ্রগতি তেমন কিছুই হয়নি। আর নতুন যে সমস্ত সূত্র পাওয়া গেছে তদন্তের ব্যাপারে সেগুলো খুব একটা কাজে লাগবে বলে মনে হয় না।'

'তবু... ।'

'হ্যাঁ, যেটুকু এগিয়েছি তাতে বলতে পারি, খুনটা বাইরের কারো মাধ্যমে হয়নি।'খুনী আমাদের পরিচিতের মধ্যেই একজন।'

'আপনি কি এ ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ করছেন?'

'হ্যাঁ, জনা দুয়েকের নাম আমাদের সন্দেহ তালিকার শীর্ষে আছে–কিন্তু একেবারে নিশ্চিত না হয়ে কোনকিছু বলা উচিত হবে না।'

আসাদের কথায় রিয়া কি বুঝল কে জানে! হঠাৎ উঠে দাঁড়াল, 'চলি তা হলে' গটগট করে হেঁটে চলে গেল ও।

'মেয়েমানুষের মেজাজমর্জি বোঝা বড় কঠিন। এই ভাল তো এই খারাপ,' মন্তব্য করল হোবার্ট। 'আপনারা কি এখন বাইরে বেরোবেন?'

'হ্যাঁ, টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনতে হবে। অসুবিধা না থাকলে আপনিও চলুন না আমাদের সাথে!'

'না, অসুবিধা কিসের! বরং গল্পেসল্পে ভালই কেটে যাবে সময়টা।

হোটেল থেকে বেরিয়ে একটা ফুলের দোকান থেকে লিজার জন্য কিছু ফুল কিনল আসাদ। 'ভাবছি, ওর জন্য কিছু ফলমূল পাঠালে মন্দ হয় না,' হোবার্ট বলল।

'না, কোন খাবার জিনিস ওকে পাঠানো চলবে না,' আসাদ কঠিন কণ্ঠে বলল।

'আশ্চর্য! আপনি কি এখনো কোন অঘটন ঘটার আশঙ্কা করছেন নাকি?'

'এ কথার কোন উত্তর দিল না আসাদ। পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে তাতে খসখস করে লিখল, "প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ আসাদ রহমান"। কার্ডটা দোকানদারের হাতে দিল। ওদের হোম সার্ভিসের মাধ্যমে কিছুক্ষণের মধ্যেই তোড়াটা প্রাপকের কাছে পৌঁছে যাবে।

পরদিন সকালে দেখা হলো এলির বাবা-মা'র সঙ্গে। ওঁরা লাশ নিয়ে কিছুক্ষণ পর চট্টগ্রাম রওনা হবেন। এ ক'দিন পুলিশী ঝামেলার জন্য লাশ হস্তান্তর করা যায়নি। কথা হচ্ছিল ওঁদের সঙ্গে। আমতা আমতা করে আসাদ বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, আপনাদের সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা জানা নেই আমার। তবু অনুরোধ করব, কষ্ট হলেও মনকে এসময় শান্ত রাখুন। নইলে ওপার থেকে এলির আত্মা কষ্ট পাবে।'

'ঠিকই বলেছেন, আপনি। হাজার বিলাপ করলেও এলি তো আর ফিরে আসবে না। আপনি তো শুনেছি নামজাদা ডিটেকটিভ। খুনী কি ধরা পড়বে বলে মনে হয়?'

'আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না।'

'ধরা না পড়লেও আফসোস নেই। কারণ আমি বিশ্বাস করি, অন্যায়কারী শাস্তি পাবেই–তা প্রত্যক্ষ ভাবে হোক আর পরোক্ষ ভাবেই হোক।'

'ঠিক,' সায় দিল আসাদ, 'অন্যায়কারী শাস্তি পাবেই। তবে কখনো কখনো জনতার আদালত সে ফাঁকি দিতে পারলেও ঈশ্বরের আদালতে প্রাপ্য শাস্তি ঠিক ঠিকই তাকে মাথা পেতে নিতে হবে।'

'যাক, এবারে বলুন আমাদের লিজা মামণি কেমন আছে–শুনলাম কাউকেই নাকি দেখা করতে দিচ্ছে না?'

'এমনিতে ভালই আছে। তবে মানসিক দিক দিয়ে কিছুটা বিপর্যস্ত। ওর ধারণা এলি খুন হওয়ার জন্য ও-ই দায়ী। এসময় ওর দরকার পুরোপুরি বিশ্রাম। আর তাই ওর সঙ্গে কাউকেই দেখা করতে দিচ্ছে না কর্তৃপক্ষ।'

'তাই বলে নিকট-আত্মীয়রাও দেখা করতে পারবে না?'

'নার্সিং হোমের নিয়মকানুন বেশ কড়া। ওখানকার কর্তৃপক্ষ চান না, রোগী নিয়ে তাদের কোন ঝামেলায় পড়তে হোক। অবশ্য খুব শিগ্‌গিরই হয়তো ওখান থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে লিজা। অনেকদিন ওর সঙ্গে আপনাদের দেখা নেই নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, অনেকদিন,' উত্তর দিলেন এলির মা, 'গত বছর শীতের আগে আগে ও চট্টগ্রাম গিয়েছিল এলির সঙ্গে দেখা করার জন্য। সাথে রবার্ট

নামের সেই বাউণ্ডুলে ছোকরাটাও ছিল। আসলে কি জানেন, লিজা এমনিতে মেয়ে হিসেবে খারাপ নয়। তবে বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় পড়ে ইদানীং বখে গেছে ও। আর ওকেই বা দোষ দিয়ে লাভ কি, একে তো বাপ-মা হারা, তার উপর নেই কোন অভিভাবক।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। এ বয়েসে মেয়েদের বিশেষ করে, কোন অভিভাবক না থাকলে কিছুটা বখে যাওয়াই স্বাভাবিক,' সায় দিয়ে বলল আসাদ।

'আরি বাড়িটাও কেমন যেন ভূতুড়ে। লিজার ঐ বাড়িতে থাকাটা একদম পছন্দ হয় না আমার।'

'আপনারা কফিন নিয়ে রওনা হচ্ছেন?'

'দুপুরের পরপরই রওনা হব ভাবছি,' লিজার বাবা জবাব দিলেন।

ওঁদের সঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তার পর সোজা থানায় গেলাম আমরা। কিছুক্ষণ পরই চট্টগ্রাম রওনা হতে হবে আমাদের। রবার্ট সিনহার আইন উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করে জানতে হবে, আসলেই ও গ্লাইডার অভিযানের আগে কোন উইল করে গেছে কিনা।

থানায় পৌঁছে দেখি জীপ তৈরি। জাফর অবশ্য কি একটা কাজে আগেই চট্টগ্রাম রওনা হয়ে গেছে। আমরা চট্টগ্রামে পৌঁছে হাতের কাজ সেরে একটা নির্দিষ্ট স্থানে ওর সঙ্গে দেখা করব। আসাদ কিছু তথ্য জানতে চেয়েছে সেগুলো ও চট্টগ্রাম পৌঁছেই আগেভাগে জেনে রাখবে। ওর সহকারীর কাছে উইল দেখার ব্যাপারে একটা অনুমতিপত্র, যা ও আমাদের জন্য আগেই রেখে গিয়েছিল, সেটা নিয়ে আর দেরি না করে চট্টগ্রামের উদ্দেশে রওনা দিলাম।

আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকায় মেসার্স পিটার সরকার অ্যাণ্ড কোং-এর অফিস। কোং- এর অফিস। রবার্টের সলিসিটর। অফিসে ঢুকে মি. সরকারের সঙ্গে পরিচিত হলাম আমরা। পকেট থেকে অনুমতিপত্রটা বের করে তার হাতে দিল আসাদ। ওটায় বার দুই চোখ বুলিয়ে মি. সরকার বললেন, 'আসলে কি, জানেন, মক্কেলদের অনেক রকম সেবা আমাদের করতে হয়। তার একটা হচ্ছে, মক্কেলের দেয়া যাবতীয় তথ্যাদি গোপন রাখা। আর এসব ক্ষেত্রে সরকারের উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটির মাধ্যমে মক্কেল সম্বন্ধে কোন তথ্য চাওয়াটাও সচরাচর ঘটে না।'

'সেক্ষেত্রে,' খুক্‌খুক্ করে একটু কেশে নিল আসাদ, 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, মক্কেলের অপঘাতে মৃত্যুও কিন্তু খুব বেশি একটা ঘটে না।'

এরপর পুরো ঘটনাটাই মি. সরকারের কাছে বর্ণনা করল আসাদ। সব

শুনে মন্তব্য করলেন তিনি, 'কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই মাথায় ঢুকছে না; কক্সবাজারের সেই খুনের সঙ্গে আমার নিখোঁজ মক্কেলের যোগসূত্রটা কোথায়!'

'হ্যাঁ, এবারে সেটাই খোলাসা করছি। কিন্তু তার আগে বলুন তো, আপনার কোম্পানি কতদিন ধরে রবার্টদের সলিসিটার হিসেবে কাজ করছে?'

'রবার্টে দাদার আমল থেকেই আমরা ওদের আইন উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে আসছি।'

'বেশ, এবারে বলুন, রবার্টের দাদা ফিলিপ সিনহা মৃত্যুর আগে উইল করে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষিপ্ত উত্তর মি. সরকারের।

'সেই উইলে উনি সম্পত্তির বাটোয়ারা কিভাবে করেছিলেন?'

' ওর পুরো বিষয়-সম্পত্তি কয়েকটা খাতে ভাগ করা। জাতীয় জাদুঘরকে এক চতুর্থাংশ, পাবলিক লাইব্রেরীকেও তাই-বাদবাকি অর্ধেক সম্পত্তি তিনি রবার্টকে দিয়ে গিয়েছেন।'

'সেই সম্পত্তি পরিমাণে কি খুবই বেশি?'

'হ্যাঁ। একটা কথা মনে রাখতে হবে, ফিলিপ সিনহা দেশের হাতে গোনা কয়েকজন ধনীদের একজন ছিলেন।'

'শোনা যায়,' একটু ইতস্তত করল আসাদ, 'উনি নাকি একটু খেপাটে স্বভাবের ছিলেন?'

স্পষ্ট বিরক্তি প্রকাশ পেলো মি. সরকারের চেহারায়। 'একজন ধনকুবেরের একটু আধটু খেপাটে হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

'হঠাৎই উনি মারা গেলেন, তাই না?' কথার মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিল আসাদ।

'হ্যাঁ, একেবারে হঠাৎ। পেটে একটা টিউমার হয়েছিল। সেটা দিনকে দিন বিপজ্জনকভাবে বড় হয়ে উঠছিল। তাই অপারেশনটা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তারদের ভাষায় "সফল অস্ত্রোপ্রচার", কিন্তু তবু তিনি মারা গেলেন।'

'তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই-ফিলিপ সিনহা মারা যাবার পর তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি পেয়েছে রবার্ট। আচ্ছা, গ্লাইডার অভিযানে বেরুনোর আগে ও কি কোন উইল করে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা কি আইনসিদ্ধভাবে করা হয়েছে?'

'অবশ্যই,' জোর দিয়ে বললেন মি. সরকার, 'উইলকারীর ইচ্ছা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। এ ছাড়া নিয়মমাফিক সাক্ষীর সইও আছে।'

'তবু, মনে হচ্ছে, উইলটাকে মনে মনে অনুমোদন করতে পারছেন না, আপনি?' বোধহয় সলিসিটরের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যেই বলল আসাদ।

কড়া দৃষ্টিতে আসাদের দিকে চাইলেন মি. সরকার। 'মি. রহমান, আমাদের কাজই হলো মক্কেলের মর্জিমাফিক আইনগত সমস্যাদির সুরাহা করা। আমরা সবকিছু আইনের দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করি। এ কথা সত্যি যে, রবার্ট তার দাদার কাছ থেকে সামান্যই মাসোহারা পেত, উপরন্তু নিজের সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না তার। হয়তো সে বুঝতে পেরেছিল, ঐ অভিযানে অঘটন কিছু ঘটলেও ঘটতে পারে। নইলে তার মত মানুষের উইল করার কোন প্রয়োজন ছিল না।'

'যদি আপনার আপত্তি না থাকে তা হলে রবার্টের উইলের বিষয়বস্তুও সংক্ষেপে জানতে চাই।'

'না, না, আপত্তি কিসের! ওর উইলের বিষয়বস্তু খুবই সহজ। উইলে সমস্ত সম্পত্তি তার বাগদত্তা, বিখ্যাত মাইকেল গোমেজের পৌত্রী এলিজাবেথ গোমেজের নামে লিখে দেয়া হয়েছে।'

'তা হলে লিজা সত্যিসত্যিই রবার্টের সম্পত্তির মালিক হচ্ছে?'

'নিঃসন্দেহে!'

'আচ্ছা, ঘটনাচক্রে ঐদিন যদি লিজা মারা যেত তা হলে অবস্থা কি দাঁড়াত?'

একটু কেশে নিয়ে বলতে আরম্ভ করলেন মি. সরকার, 'ধরে নিই, ঐদিন লিজার মৃত্যু হয়েছে। সেক্ষেত্রে রবার্টের ওয়ারিস হিসেবে রবার্টের সম্পত্তি চলে আসবে লিজার নামে। আর লিজার মৃত্যুর পর তার উইলে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নামে চলে যাবে লিজার সম্পত্তি। আর যদি উইল করা না থাকে তবে আইন অনুসারে তা নিকট-আত্মীয় কিংবা আত্মীয়দের মধ্যে ভাগাভাগি হবে।'

'অনেক ধন্যবাদ, মি. সরকার।' করমর্দন করে জীপে উঠলাম আমরা।

সদরঘাটের কাছে হোটেল শাহজাহানে এসে থামল জীপ। কথামত জাফর আগে থেকেই সেখানে অপেক্ষা করছিল। আমরা তিনজন নিরিবিলি একটু জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়লাম। বেয়ারাকে খাবারের অর্ডার দিল জাফর।

খেতে খেতে কথা হচ্ছিল। বেশির ভাগই পুরনো দিনের স্মৃতিচারণ। কথায় কথায় মন্তব্য করল জাফর, 'একটা সময় আসে, যখন পুরনোদের

সরে গিয়ে নতুনদের জায়গা করে দিতে হয়।'

'কিন্তু নতুনদের মধ্যে সেরকম কেউ আসছে কই? অপরাধ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কত যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেছে ভাবতেও অবাক লাগে। অপরাধীকে সনাক্ত করার জন্য বিভিন্ন কমপিউটারাইজ যন্ত্রপাতিও ব্যবহৃত হচ্ছে আজকাল। কিন্তু সে তুলনায় আমাদের পর আর তেমন উল্লেখযোগ্য কেউ কি এসেছে?' খেদের সুরে বলল আসাদ। 'মাঝেমধ্যে ইচ্ছে হয়, অবসর নিয়ে বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটিয়ে দিই। কিন্তু, পারছি কই, বলো? ঐ যে কথায় বলে, ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে। আমার অবস্থাও হয়েছে তাই। এলাম হাওয়া বদল করতে, জড়িয়ে পড়লাম খুনের রহস্যে। কিন্তু কই, এমন একজন নতুন প্রতিভার খোঁজ দাও দেখি আসাদ রহমানের পরিবর্তে সে এসে হত্যা রহস্যের কিনারা করে দিয়ে যাক!' ওর কথার উত্তরে হাসতে হাসতে মন্তব্য করল জাফর, 'হাতি মরলেও লাখ টাকা, আর আসাদ রহমান বুড়ো হলেও এখনো গোয়েন্দাদের সেরা।'

তোষামুদে কথার কাজ হলো। আসাদের আত্মপ্রচার থেমে গিয়ে আলোচনার মোড় ঘুরে গেল অন্যদিকে। 'এবারে কাজের কথায় আসা যাক,' বলল জাফর, 'প্রথমে ফিরোজের কথায় আসি। যদিও ইদানীং বিভিন্ন কারণে ব্যবসায়ে কিছুটা মন্দা যাচ্ছে, তবু ব্যবসায়ী হিসেবে বাজারে ওর এবং ওর বাবার যথেষ্ট সুনাম আছে। দ্বিতীয়ত, 'ডা. কমল রডরিক্স সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজ নিয়েছি। উনি গাইনির ডাক্তার। নিজ পেশায় যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন, এ ছাড়া কোন রকম পেশাগত ছলচাতুরির রিপোর্ট তাঁর বিরুদ্ধে নেই।'

একটু অবাকই হলাম। ডা. কমল রডরিক্সের সঙ্গে আমাদের এই ঘটনার সম্পর্কে কি?'

'সম্পর্ক আছে–ভদ্রলোক ক্যাপ্টেন হোবার্টের দূর সম্পর্কের মামা।'

'তবে কি...তবে কি ফিলিপ সিনহার অপারেশন এই ভদ্রলোকই করেছেন?'

'না, মি. রডরিক্স সার্জন নন।'

'আচ্ছা, ঐ হাতের ছাপের ব্যাপারে কি কিছু জানতে পেরেছ?'

'না, আমাদের রেকর্ড বুকে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া গেল না। তবে এ ব্যাপারে আরও অনুসন্ধান চালিয়ে যাবার জন্য থানা কর্তৃপক্ষকে বলেছি। আশা আছে, খুব শিগরিই হয়তো নতুন কিছু জানা যাবে।'

'তুমি, দোস্ত, আসলেই একটা জিনিয়াস,' জাফরের পিঠ চাপড়ে বলল আসাদ, 'এই খুনের কিনারা করার ব্যাপারে তোমার সাহায্য না পেলে

অন্ধকারেই হাতড়ে মরতে হত আমাকে।'

আরও নানারকম কথাবার্তা হলো। একসময় সূর্যটা পশ্চিমে হেলে পড়ল। কক্সবাজারের পথে রওনা হলাম আমরা।

পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। হোটেলে আমাদের নামিয়ে দিয়ে জীপ নিয়ে চলে গেল জাফর। হোটেলের কাউন্টারে একটা চিরকুট পাওয়া গেল। সেটা পাঠিয়েছেন ডা. লতিফ শিকদার। বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে আসাদকে টেলিফোনে যোগাযোগ করতে বলেছেন তিনি। দেরি না করে শর্মিলা নার্সিং হোমে টেলিফোন করে ডা. শিকদারকে চাইল আসাদ। মিনিটখানেকের মধ্যেই ওপাশ থেকে ডাক্তারের কণ্ঠ শোনা গেল। একটু পর লক্ষ্য করলাম, চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আসাদের।

'কি? কি বললেন?' হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। চট্ করে সেটা ধরে ফেললাম; আসাদও ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। ধপ্ করে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল ও। আরও মিনিটখানেক পর রিসিভার নামিয়ে রাখল। লক্ষ্য করলাম, ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই বলতে শুরু করল ও, 'মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে লিজা। এবারে কোকেন পয়জনিং। উহ্ চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। নার্সিং হোমের উপর ওর নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরোপুরি ছেড়ে দেয়া মোটেই উচিত হয়নি।'

আর কথা না বাড়িয়ে নার্সিং হোমের দিকে পা বাড়ালাম আমরা।

আট

নার্সিং হোমে পৌঁছে ডা. শিকদারকে দেখতে পেলাম। এ ঘটনায় কিছুটা মুষড়ে পড়েছেন ভদ্রলোক।

'লিজার অবস্থা কি খুবই খারাপ? মানে.... ।'

'না, না, এখন আর ভয়ের কিছু নেই। সময়মত চোখে পড়েছিল বলেই অল্পের ওপর দিয়ে কেটে গেল বিপদটা,' আসাদকে আশ্বস্ত করলেন ডা. শিকদার।

'কিন্তু ভেবেই পাচ্ছি না, এত কড়া পাহারার ব্যবস্থা থাকার পরেও আততায়ী এখানে ঢোকার সুযোগ পেল কি করে?'

'দারোয়ান এবং নার্সরা কিন্তু বলছে কাউকেই ঢুকতে দেয়া হয়নি।'

'ওরা ওরকম বলেই থাকে। ভালভাবে জেরা করলেই সত্যি কথাটা বেরিয়ে আসবে।'

'আসলে এই অঘটনাটা ঘটেছে বাইরে থেকে পাঠানো চকোলেট খেয়ে। ওগুলোতে কোকেন মেশানো ছিল।'

'আশ্চর্য! এতটা অবুঝ হলে চলবে কী করে? বাইরের কোন জিনিস খাওয়া চলবে না, একথা তো বারবার বলেছি ওকে। যাক, সবগুলো চকোলেটেই কি কোকেন মেশানো ছিল?'

'না, মাত্র তিনটেই। ভাগ্য ভাল যে, ও খেয়েছে মাত্র একটা।'

'আততায়ী চকোলেটে কোকেন মেশালো কিভাবে?'

'খুবই সহজ উপায়ে। চকোলেটগুলো মাঝবরাবর ধারাল কিছু দিয়ে কেটে ভেতরের পুর খানিকটা ফেলে দিয়ে সে জায়গায় কোকেন ভরে দুটো অংশ আবার আগের মত জুড়ে দেয়া হয়েছে। একেবারে আনারি হাতের কাজ–লক্ষ্য করলে যে কেউ বুঝতে পারবে।'

'লিজার সঙ্গে কি এখন দেখা করা যাবে?'

'ইয়ে, মানে...' ইতস্তত করে বললেন ডা. শিকদার, 'এই মাত্র ওর

জ্ঞান ফিরেছে। কিছুক্ষণ পর দেখা করলে ভাল হয়।'

আর কথা না বাড়িয়ে সী-বীচের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম আমরা। ঘণ্টাখানেক পর আবার নার্সিং হোমে যাব।

সেই সন্ধ্যে থেকেই গুম হয়ে আছে আসাদ। এর মধ্যে দুই-একবার কথা বলার চেষ্টা করেও ওর মুখ থেকে কোন কথা বের করতে পারিনি। সাগর সৈকতে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে হেঁটে চলেছি আমরা। সমুদ্র এখন বেশ শান্ত। দূরে ছোট ছোট ডিঙি নৌকা কিংবা সাম্পানের আলো দেখা যাচ্ছে। চাঁদের আলো সমুদ্রের পানিতে বিচ্ছুরিত হয়ে রেশমী এক চাদরের আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে যেন। বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের মাঝে কেমন একটা মাদকতার আভাস, যেন পরিতৃপ্তির অবসাদ ছড়িয়ে দিচ্ছে সারা শরীরে।

আবার নার্সিং হোমের পথ ধরলাম।

ডা. শিকদার তাঁর ডিউটি শেষ করে ফিরে গেছেন। অবশ্য নার্সদের বলে রেখেছিলেন, তাই কোন অসুবিধা হলো না। ওদের একজন লিজার কেবিনে পৌঁছে দিল আমাদের। ভেতরে ঢুকলাম। পাতলা একটা চাদর গায়ে দিয়ে আধশোয়া অবস্থায় বসে রয়েছে ও। চোখমুখ ফ্যাকাশে। 'দেখা যাচ্ছে, নার্সিং হোমও তা হলে নিরাপদ নয়,' বিপর্যস্ত চেহারায় জোর করে হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল লিজা। কিন্তু চেহারাটা কেমন যেন কান্নামাখা দেখাচ্ছে ওর।

'নার্সিং হোম নিরাপদ ঠিকই, কিন্তু এখানেও কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলার আছে। আপনাকে বারংবার বলা সত্ত্বেও সেগুলো মনে চলেননি। আততায়ী সেই সুযোগটাই আবার কাজে লাগিয়েছে।'

'কিন্তু আমি তো কোন বিধিনিষেধ অমান্য করিনি। এমন কি, আপনার কথামত ভুলেও কেবিনের বাইরে যাচ্ছি না। এর পরেও কি বলবেন আমি বিধিনিষেধ মেনে চলিনি?'

'আপনাকে কি বলিনি, বাইরে থেকে পাঠানো কোন জিনিস মুখে দেয়া চলবে না?'

'হ্যাঁ, বলেছেন... ।'

'তবু, আপনি বাইরে থেকে পাঠানো চকোলেট খেয়েছেন!'

'কিন্তু ওগুলোতে যে কোকেন মেশানো আছে তা জানবো কেমন করে? কারণ চকোলেটগুলো তো পাঠিয়েছেন আপনিই!'

'কি? কি বললেন?'

'হ্যাঁ, চকোলেটগুলো তো আপনারই পাঠানো!'

'অসম্ভব! আপনার জন্য আমি চকোলেট পাঠাইনি।'

'তা কি করে হয়? বাক্সে তো আপনার সই করা কার্ড সাঁটা ছিল।'

'কী? আমার কার্ড সাঁটা ছিল ওই চকোলেটের বাক্সে?'

ইশারায় নার্সকে পাশের টেবিল থেকে বাক্সটা নিয়ে আসতে বলল লিজা। বাক্সটা আসাদের সামনে এনে রাখল সে। বাক্সে আসাদের স্বাক্ষর করা কার্ড সাঁটা! ঠিক এরকম আরেকটা গায়ে সেঁটে দিয়েছিল আসাদ। মুখে কোন কথা নেই ওর। শুধু ওর কেন, আমারও একই অবস্থা–বিস্ময়ে যেন বোবা বনে গেছি আমরা।

'আততায়ী একটা জিনিয়াস,' মুখে কথা ফুটল আসাদের 'কত সহজ, কিন্তু কি নিখুঁত পরিকল্পনা! ছোট একটা কার্ড তাতে লেখা প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ, আর নিচে আমার সই। ব্যস, কেল্লা ফতে। গুলিগোলার ঝামেলা নেই। কোনরকম খাটাখাটুনিও নেই, কিন্তু কাজ হাসিল। প্রতিপক্ষ আমাদের চেয়ে অ–নেক বেশি চালাক।'

'এবারে ওর শুয়ে পড়া উচিত,' চোখেমুখে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল নার্স। অনেকক্ষণ ধরেই উসখুস করছিল সে। আমাদের দেরি দেখে কথাটা মুখ ফুটে বলেই ফেলল সে।

লিজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিচে এলাম আমরা। সাধারণত চিঠি পার্সেল এবং রোগীর জন্য পাঠানো জিনিসপত্র যে পিয়নটা তদারকি করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করল আসাদ, 'আচ্ছা, বলো তো, চকোলেটের প্যাকেটটা লিজার কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য কে তোমাকে দিয়েছিল?'

'এক ভদ্রলোক। লম্বা–চওড়া দেখতে। উনি বিকেলের দিকে গাড়ি করে এসে প্যাকেটটা দিয়ে গিয়েছিলেন।'

'মনে হচ্ছে অ্যালবার্ট,' বলেই নিজের বোকামিটা বুঝতে পারলাম, অপরিচিত একজনের সামনে এভাবে নাম বলাটা ঠিক হয়নি।

কিন্তু ততক্ষণে কথাটা শুনে ফেলেছে সে। বলল, 'না, উনি না। ওনাকে আমি চিনি। এই ভদ্রলোক তো আরও একটু লম্বা।'

'তা হলে নিশ্চয়ই ফিরোজ,' এবারেও মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। আসাদের কড়া চাহনি দেখে সতর্ক হয়ে গেলাম।

'ভদ্রলোক কোন্ সময় প্যাকেটটা দিয়ে গিয়েছিলেন?'

'সময়টা নির্দিষ্ট করে বলতে পারব না। মনে হয়, বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে।'

'প্যাকেটটা আমি নিইনি, স্যার। নার্সই সেটা উপরে নিয়ে গিয়েছিল।'

'তা বুঝলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের হাত থেকে ওটা তো তুমিই নিয়েছিলে,

তাই না?'

'জ্বি। কিন্তু প্যাকেটটা ওনার হাত থেকে নিয়ে পাশের হলরুমের বড় টেবিলের রেখেছিলাম।'

'বেশ। কোথায় সেই টেবিল?'

পাশের হলরুমে ঢুকলাম আমরা। সেখানে বড় একটা শ্বেত-পাথরের টেবিল। রোগীদের আত্মীয় স্বজনেরা যে সমস্ত জিনিসপত্র পাঠায় সেগুলো এখানে জমা করা হয়।

'আচ্ছা, বলতে পারো, প্যাকেটটা ঠিক ক'টার সময় লিজার কেবিনে পাঠানো হয়েছিল?'

'তখন সন্ধ্যা প্রায় ছ'টা,' মাথা চুলকে বলল লোকটা।

'ঠিক আছে। তুমি এখন যাও, আর যার হাত দিয়ে প্যাকেটটা লিজার কেবিনে পৌঁছেছে তাকে পাঠিয়ে দাও।'

একটু পর মাঝবয়েসী এক নার্স এল। সে-ই প্যাকটটা লিজার রুমে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। তার কাছ থেকে আরও জানা গেল, অনেকেই বিভিন্ন জাতের ফুলের তোড়া আর কেউ কেউ খাবার জিনিসও পাঠিয়েছেন। যেমন ডি কস্টারা পাঠিয়েছেন ঘরে তৈরি পিঠা। এ ছাড়া হুবহু একই রকমের আরও একটা চকোলেটের বাক্স এসেছে। তাতে প্রেরকের নাম নেই। অবশ্য সেটা এসেছে ডাক মারফত।'

'কি, কি বললেন, আরও এক বাক্স চকোলেট?'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু আশ্চর্য ঠেকলেও আসলে ঘটেছে কিন্তু তা-ই। আমি দুটো বাক্সই ওনার কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি চকোলেটের একটা বাক্স রেখে অন্যটা আরও সব বাইরের খাবারের সঙ্গে ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, ঐ বাক্সটা আপনি পাঠিয়েছেন–তাই ওগুলো খেতে কোন আপত্তি নেই।'

'আচ্ছা, অন্য বাক্সটা কে পাঠিয়েছিল?'

'তাতে প্রেরকের নাম-ঠিকানা লেখা ছিল না।'

'আর যে বাক্সটা বলা হচ্ছে আমি পাঠিয়েছি, সেটা কিভাবে এসেছে, ডাকে নাকি লোক মারফত?'

একটু ইতস্তত করে বলল নার্স, 'ঠিক মনে পড়ছে না, যদি বলেন তো উপরে গিয়ে মিস গোমেজকে জিজ্ঞেস করে আসতে পারি।'

আসাদ সম্মতি দেয়ায় লিজার কেবিনে গেল নার্স। ফিরে এল আবার মিনিট পাঁচেক পর। 'উনি সঠিক করে কিছুই বলতে পারছেন না। তবে যতটুকু মনে পড়ে তা থেকে উনি বললেন, যে বাক্সটা লোক মারফত

এসেছে সেটাতে আপনার কার্ড ছিল।'

আপাতত জিজ্ঞেস করার মত তেমন কিছু নেই। নার্সকে তাই বিদায় জানিয়ে হোটেলের পথ ধরলাম।

হোটেলের কাছাকাছি এসে পড়েছি, দূরে পার্কিং লনে দেখা গেল ফিরোজের গাড়ি। তাড়াতাড়ি ওদিকেই এগিয়ে গেলাম। গাড়ির বনেটে ঝুঁকে পড়ে কি যেন করছে ফিরোজ। কোনরকম ভণিতা না করে সরাসরি জিজ্ঞেস করল আসাদ, 'আজ সন্ধ্যায় আপনি কি লিজার জন্য এক বাক্স চকোলেট নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাতে কি হয়েছে?'

'না, কিছু হয়নি। এমনি জিজ্ঞেস করলাম,' হালকাভাবে উত্তর দিল আসাদ।

'চকোলেটের বাক্সটা আসলে রিয়া পাঠিয়েছে। আমি শুধু নার্সিং হোমে পৌঁছে দিয়ে চলে এসেছি।'

'রিয়াকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে, বলতে পারেন?'

'হোটেলেই পাবেন। ডাইনিং হলে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ডিনার খাচ্ছে।'

ফিরোজের সঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে ভেতরে ঢুকলাম। রিয়াকে দেখা গেল। ডিনার সেরে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্পে মশগুল। আমরা একটু দূরে কোণের দিকের একটা টেবিল দখল করে বসলাম। ইশারায় ওকে ডাকল আসাদ। কয়েক মিনিট পর ও এল। 'ব্যাপার কি, বলুন তো, কিছুক্ষণ আগে শুনলাম লিজা নাকি সাংঘাতিক অসুস্থ?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর কণ্ঠ আসাদের, 'একটা কথার জবাব দিন তো, আজ বিকেলে আপনি কি লিজার জন্য এক বাক্স চকোলেট পাঠিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। ও-ই তো পাঠাতে বলল। তাই পাঠিয়েছিলাম।'

'কি বললেন! লিজা আপনাকে চকোলেট পাঠাতে বলেছিল?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওর সঙ্গে দেখা হলো কি করে আপনার?'

'আমি দেখা করিনি। ও-ই নার্সিং হোম থেকে টেলিফোন করে চকোলেট পাঠাতে বলেছে।'

বিস্ময় ফুটে উঠল আসাদের চেহারায়। 'লিজা আপনাকে টেলিফোন করেছিল? কি বলল ও টেলিফোনে?'

'ও বলল, আমি যেন আজ বিকেলে ওর জন্য দু-পাউণ্ড চকোলেট পাঠিয়ে দিই।'

'টেলিফোনে ওর গলার স্বর কি রকম শোনাচ্ছিল, ফ্যাঁসফেঁসে?'

'না, তবে কেমন যেন অন্যরকম। প্রথমটায় আমি বুঝতেই পারিনি যে ও কথা বলছে।'

'আপনি কি নিশ্চিত যে টেলিফোনে লিজার গলাই শুনতে পেয়েছেন?'

'আমি, মানে...ঠিক...কিন্তু কেন, ও ছাড়া আর কে-ই বা হবে?'

'প্রশ্ন তো সেখানেই।'

'তার মানে? আপনি কি বলতে চাচ্ছেন...?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তা ছাড়া আপনি নিজেও তো নিশ্চিত নন যে টেলিফোনে লিজাই কথা বলেছে।'

'আচ্ছা, এবারে বলুন তো কি হয়েছে?'

'লিজা সাংঘাতিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঐ চকোলেটগুলোতে কোকেন মেশানো ছিল।'

'অসম্ভব! এ হতেই পারে না... ।'

'অসম্ভব নয়, এটাই সত্যি। আপনার পাঠানো চকোলেট খেয়ে ও এখন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।'

দুই হাতে মুখ ঢাকল রিয়া। রীতিমত ফোঁপাতে শুরু করল সে। 'না, না, এ কিছুতেই হতে পারে না। অন্য কারোর পাঠানোটা খেয়ে এরকম হলে কথা ছিল না।'

'কিন্তু হয়েছে তো তাই-ই।'

'তা কি করে হয়! আমার পাঠানো বাক্সটা আমি আর ফিরোজ ছাড়া অন্য কেউ ছোঁয়নি। না, না, মি. রহমান, আপনার ভুল হচ্ছে কোথাও।'

'এখানে ভুল হবার কিছু নেই; যদিও আততায়ী বেশ বুদ্ধি খরচ করে আমার নামের একটা কার্ড ঐ বাক্সে সেঁটে দিয়েছিল।'

অবাক চোখে আসাদের দিকে চাইল রিয়া।

'যদি সত্যি সত্যিই লিজার কিছু একটা ঘটে তা হলে কিন্তু—' শাসানোর ভঙ্গিতে তর্জনী তুলে কঠিন দৃষ্টিতে রিয়ার দিকে চাইল আসাদ।

রুমে ফিরে এসে কিছুক্ষণ গুম হয়ে রইল আসাদ। তারপর শুরু হলো ঘরময় অস্থিরভাবে পায়চারি। এদিকে রাত গভীর হয়েছে। শুতে যাব কিনা ভাবছি। হঠাৎ মুখ খুলল ও, 'কিন্তু তা কি করে হয়! রিয়া খুব ভাল করেই জানে, লিজা মারা গেলে কিছু সম্পত্তি ছাড়া পুরোটাই ওর দখলে চলে যাবে। কিন্তু তাই বলে চকোলেটে বিষ মেশানো কিংবা কাল্পনিক টেলিফোনের গল্প ফাঁদার মত কাঁচা মেয়ে সে নয়। এ সবের পেছনে অন্য কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। অবশ্য এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে।

রিয়া কোকেনের নেশা করে। ও ভাল করেই জানে, একসঙ্গে কতটা কোকেন নিলে জীবন বিপন্ন হতে পারে। এ ছাড়া ওর ঐ কথাটা "অন্য কারো পাঠানোটা খেয়ে..." আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। ডাকে যে বাক্সটা এসেছে সে ব্যাপারেও কি ওর হাত আছে?'

'অন্য বাক্সটার ব্যাপারেও ওর হাত থাকা অসম্ভব কিছু নয়। পরিস্থিতি ঘোলাটে করার কৌশল কিনা কে জানে!'

'আর একটা কথা, যদি ওর কাছে কেউ টেলিফোন করেও থাকে তা হলে কণ্ঠস্বরটা কার ছিল? হাবিব, মনে হয় আমরা এখনো গাঢ় অন্ধকারেই হাতড়ে মরছি।'

'প্রভাতের আলো ফুটে বেরুনোর আগেই সবচেয়ে বেশি অন্ধকার থাকে,' আসাদকে শান্ত করার জন্য দার্শনিকের মত মন্তব্য ঝেড়ে দিলাম।

আরও কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর ওর চেহারায় এক ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে যাচিছলাম কিন্তু ইশারায় কথা বলতে নিষেধ করল ও। 'আর একটা কথাও নয়। যদি আমাকে সাহায্য করতে চাও তা হলে জলদি কোথাও থেকে এক প্যাকেট তাস যোগাড় করে আনো।'

ওর এই কথায় অবাক না হয়ে পারলাম না। এত রাতে তাস! তবু কথা না বাড়িয়ে তাসের সন্ধানে নিচে চলে এলাম। মনে হচ্ছে, হঠাৎ করে যেন মাথায় পাগলামি চেপেছে ওর। সবই বয়সের দোষ! অথচ এই আসাদই এক সময় আশ্চর্য সব রহস্যের কিনারা করে দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিল। এক প্যাকেট তাস জোগাড় করে ফিলে এলাম রুমে। সেটা ওর হাতে দিয়ে একটা উপন্যাসে মন বসাতে চেষ্টা করলাম। এমনিতেই চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়েছে। বেশি রাত হয়ে গেলে যা হয়। আড়চোখে লক্ষ্য করলাম, সাইড টেবিলে একটার উপর আরেকটা তাস সাজিয়ে ঘর তৈরির খেলায় মগ্ন আসাদ। কোন জটিল সমস্যায় পড়লে মাথা ঠাণ্ডা রাখার এ এক নিজস্ব পদ্ধতি ওর। ওকে বিরক্ত না করে লম্বা হয়ে পড়লাম বিছানায়।

নয়

ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে আসাদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। মাথার কাছে ও দাঁড়িয়ে। চেহারায় একটা পরিতৃপ্তির ভাব। হেসে বলল, 'তোমার কথাই ঠিক, প্রভাতের আলো ফুটে বেরুনোর আগেই সবচেয়ে বেশি অন্ধকার থাকে। এ কদিন একেবারেই অন্ধকারে ছিলাম, কিন্তু আজ আলোর মুখ দেখতে পেয়েছি। ও হ্যাঁ, একটা কথা তো তোমাকে বলাই হয়নি,' চোখেমুখে কৌতুক খেলা করছে ওর, 'চকোলেটের বিষক্রিয়ায় লিজার মৃত্যু হয়েছে।'

'কি? লিজার মৃত্যু হয়েছে! উত্তেজনার বশে চিৎকার করে এমনভাবে লাফিয়ে উঠেছিলাম, আসাদ দরে না ফেললে হয়তো মেঝেতেই চিৎপটাং হয়ে পড়তাম।

'চুপ, আস্তে!' কিছু হয়নি লিজার। এতদিন তো আততায়ী আমাদের নিয়ে খেলেছে। এবার আমাদের পালা। মাত্র চব্বিশ ঘন্টার জন্য লিজার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে দিয়ে দেখতে চাই ঘটনায় এটা কি কি পরিবর্তন আনে। হত্যাকারী জানবে, পরপর চারবার ব্যর্থ হওয়ার পর পঞ্চমবারে সে সফল হয়েছে! আমার স্থির বিশ্বাস, চব্বিশ ঘন্টা পেরুনোর আগেই ঘটনা প্রবাহ নতুন মোড় নেবে। ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং হবে, কি বলো?'

সকাল হতেই কাজে নেমে পড়ল আসাদ। কিন্তু আমি রুমেই রয়ে গেলাম। শরীরে জ্বরজ্বর বোধ হচ্ছে। কিছুটা বমি বমি ভাবও আছে।

লিজার ব্যাপারে প্রথমেই টেলিফোনে ম্যানেজ করতে হলো ডাক্তার শিকদারকে। তাঁর উপর পুরো নার্সিং হোম সামাল দেয়ার দায়িত্ব দেয়া হলো। এরপর থানায় গিয়ে জাফরের সঙ্গে দেখা করল আসাদ। থানা থেকে সমন জারি করা হলো—পোস্ট মর্টেম ও অন্যান্য আইনগত বিধিনিষেধের কারণে চব্বিশ ঘন্টার আগে কাউকেই মৃতদেহ দেখতে দেয়া হবে না।

ঘণ্টা দেড়েক পর অল্প কিছুক্ষণের জন্য ফিরে এল আসাদ। বলল, 'লিজার বন্ধু-বান্ধবী থেকে শুরু করে দৈনিক জনবার্তার অফিস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে খবরটা। আর মৃতদেহ দেখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর করা হয়েছে। নার্সিং হোমের গেটে পুলিশ কাউকে ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না,' হো হো করে হেসে উঠল ও। বোঝা যাচ্ছে, লিজার মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দিয়ে দারুণ মজা পাচ্ছে। 'পথে দেখা হলো রিয়ার সঙ্গে,' আবার বলতে শুরু করল ও, 'বেচারির মুখচোখ ফোলা ফোলা। কোথায় যাচ্ছে, জানতে চাইলে বলল, লিজার স্মৃতির প্রতি শেষ শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ফুলের তোড়া কিনতে দোকানে যাচ্ছে। শুনে মাথায় একটা আইডিয়া উঁকি দিল। আমিও এরকম একটা তোড়া পাঠিয়ে দিই না কেন! সেদিনের ঐ তোড়াটায় লেখা ছিল–প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ আসাদ রহমান। আর আজ লিখতে হয়েছে–লিজার পূণ্য স্মৃতির উদ্দেশে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আসাদ রহমান,' আবার একচোট হাসল ও।

'বাহ! এক মিথ্যে নাটক সাজিয়ে বেশ মজা পাচ্ছো বলে মনে হচ্ছে?'

'নাটক বলছ কি! এ-তো রীতিমত এক কৌতুকের পালা। নিজ নিজ চরিত্রে ঠিকমত অভিনয় করতে না পারলে দর্শকের হাততালি জুটবে কি করে? ও হ্যাঁ, লিজাকে আমার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছি। পুরো ব্যাপারটায় দারুণ মজা পাচ্ছে–ভুলেও কেবিনের বাইরে পা দেবে না ও।'

'চকোলেটে বিষ মেশানোর ব্যাপারে কাকে বেশি সন্দেহ হয় তোমার?' প্রসঙ্গ পাল্টালাম আমি।

'এ ক্ষেত্রে তিনটে সম্ভাবনার কথা মাথায় উঁকি দিচ্ছে আমার। প্রথমত চকোলেটের বাক্সটা রিয়া ফিরোজের হাত দিয়েই নার্সিং হোমে পাঠিয়েছিল। তা হলে ওদের দুজনই, কিংবা দুজনের যে কোন একজন এ ব্যাপারে জড়িত থাকতে পারে। এটা একেবারে সহজ সমাধান।'

'তোমার দ্বিতীয় সমাধানটা কি শুনি!'

'চকোলেটের আরও একটা বাক্স যেটা ডাকে এসেছে ওটা পাঠিয়েছে কে? আমাদের সন্দেহ তালিকার যে কেউ হতে পারে। যদি ঐ বাক্সের চকোলেটে কোকেন মেশানো থাকে তা হলে টেলিফোনের ব্যাপারটা আসলে কি? এখানে এই দ্বিতীয় চকোলেটের বাক্সটা পুরো ঘটনাকে জটিল করে তুলেছে।'

'কিন্তু এতে করে কোন সমাধানে আসা যাচ্ছে না। যাক, তোমার তৃতীয় ব্যাখ্যা বলো।'

'ধরা যাক, ডাকে আসা বাক্সের চকোলেটে কোকেন মেশানো ছিল।

সেটা লিজার কাছে পাঠিয়ে কৌশলে অন্য বাক্সটা সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এটাও সন্দেহ তালিকার যে কেউই করে থাকতে পারে। আর যদি তা-ই হয়ে থাকে তা হলে টেলিফোনের কারণটা সহজেই অনুমান করা যায়- রিয়াকে এখানে বলির পাঠা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।'

'যাই বল, এই চকোলেটের ব্যাপারটা কিন্তু পুরো ঘটনাকে রীতিমত ঘোলাটে করে তুলেছে। যাক এ নিয়ে পরে আর ভাবা যাবে,' চোখ বুজলাম। শরীরে ঝিমুনি ভাব।

'একটা কথা না বলে আর পারছি না,' আসাদের কথায় তন্দ্রা-ভাব কেটে গেল, 'সেই ফুলের দোকানদারের ভাগ্য এই সুযোগে খুলে গেল। আমি তো দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি-ডি কস্টা, অ্যালবার্ট, ফিরোজ এরা সবাই লাইন দিয়ে ফুলের তোড়া কিনছে...' আসাদ আর কিছু বলতে গিয়েও বোধহয় থেমে গেল। কারণ ততক্ষণে আবার চোখ বুজেছি আমি-জ্বরটা বেশ বেড়ে উঠছে মনে হয়। আসাদ বাইরে চলে গেল। মোটা একটা কম্বল গায়ে চাপালাম আমি। এরপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

ঘুম যখন ভাঙল তখন বিকেল। জ্বর খুব একটা কমেছে বলে মনে হচ্ছে না। দেখলাম, পাশের টেবিলটায় ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখছে আসাদ। আমাকে জেগে উঠতে দেখে ও বলল, 'ক' দিন আগে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকায় যাদের নাম রেখেছিলাম, এখন ওই নামগুলোই নতুন ব্যাখ্যাসহ আবার লিখেছি। পড়ে শোনাবো?'

১. বুয়াঃ ঘটনার দিন প্রতি বছরের মত কেন সে বাজি পোড়ানো দেখার জন্য বাইরে যায়নি? (ব্যাপারটা আসলেই খটকা লাগার মত। কারণ লিজাও কথাটা শুনে বেশ অবাক হয়েছিল)। ঐ দিন কি বাড়িতে ও অপরিচিত কাউকে দেখতে পেয়েছিল, যাকে আমরা এ ঘটনায় "অজ্ঞাত ব্যক্তি" হিসেবে চিহ্নিত করছি? বাড়িতে কোন গুপ্তকুঠুরি থাকার কথাটা কি সত্যি? ওর কথামত যদি তা থেকেই থাকে তা হলে সেটার অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে না কেন? কিন্তু লিজা এরকম নিশ্চিত যে বাড়িতে এ ধরনের কোন গুপ্তকুঠুরি নেই যদি এটা বুয়ার উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনা হয়ে থাকে তবে এর পেছনে কারণটা কি? লিজাকে লেখা অ্যাল-বার্টের প্রেম পত্রগুলো কি ওর চোখে পড়েছে। লিজার বাগদানের কথা শুনে ও যেন একটু অবাকই হলো কিন্তু কেন?

২.মালীঃ লোকটাকে যতটা বোকা বলে মনে হয়, আসলেই কি তাই? বুয়া এবং মালীর যৌথ প্রচেষ্টায় কোন ষড়যন্ত্র সফল হওয়া কি খুবই অসম্ভব? এখানে মনে রাখতে হবে, লিজার উইলের সাক্ষী ছিল এরাই।

৩. বুয়া এবং মালীর নাবালক সন্তানঃ একে সন্দেহ তালিকার বাইরে রাখা যেতে পারে।

৪. মি. ডি কষ্টাঃ এই ডি কষ্টা ভদ্রলোকটি সন্দেহজনক। ও কি লিজার কথামত অ্যালবার্টের ঠিকানায় ওর উইলটা পোস্ট করেছিল? আর যদি সে পোস্ট না করে থাকে তা হলে এর পেছনে যুক্তি কি?

৫. মিসেস ডি কস্টাঃ শারীরিকভাবে পঙ্গু। তবে উইল সংক্রান্ত কোন চক্রান্তের ব্যাপারে ওর অবদান থাকা বিচিত্র কিছু নয়।

৬. রিয়া: বরাবরই আমাদের সন্দেহের তালিকায় অবস্থান করছে সে। লিজার বাগদানের ব্যাপার কি সে আগে থেকে জানত? রবার্টের লেখা চিঠিগুলো কি সে কখনো দেখেছে? (যদি তাই হয় সে ক্ষেত্রে তার মত চালাক মেয়ে ঠিকই বুঝেছিল, লিজাই রবার্টের সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হতে যাচ্ছে) এ ছাড়া সে কি জানত লিজার উইল অনুসারে ওর সিংহভাগ সম্পত্তি সে-ই পেতে যাচ্ছে? ঐ চিরকুটটাই বা কিসের? তাতে যে একজন লোকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে সে-ই কি আমাদের সম্ভাব্য অজ্ঞাত ব্যক্তি? আর চকোলেটের ব্যাপারটা তো আর তার দিক থেকে মোটেই পরিষ্কার নয়। মনে হয়, গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য সে গোপন করে যাচ্ছে?

দেখ, ঘটনাকে যতই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করি না কেন, বারবার ঘুরে ফিরে রিয়ার প্রসঙ্গ চলে আসছে। সে-ই কি পুরো ঘটনার সঙ্গে জড়িত, নাকি ঘটনার সঙ্গে জড়িত এমন কাউকে সে আড়াল করার চেষ্টা করছে? যেভাবেই হোক , তাকে দিয়ে কথা বলাতে হবে। যাক, বাদ বাকিটুকুও তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি-

৭. ফিরোজঃ চকোলেটের ব্যাপারে ওকে সন্দেহ করার অবকাশ আছে। ও-ই কি কোকেন মেশান চকোলেট লিজার ওখানে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল? যদিও অপ্রাসঙ্গিক, তবু এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করতে হবে, একজন পাকা ব্যবসায়ী হয়ে লিজার বাড়ির একটা অয়েল পেইন্টিং ও ন্যায্য দামের চেয়ে অনেক বেশি দিয়ে কেন কিনতে চেয়েছিল?

৮.ক্যাপ্টেন হোবার্টঃ লিজা বাগদানের কথা শুধুমাত্র ওর কাছে কেন বলেছিল? ও কি লিজাকে কোনরকম প্রস্তাব দিয়েছিল? এ ছাড়া ডাক্তার মামার সঙ্গে ওর সম্পর্ক কেমন? ওরা কি পরস্পরের খুবই ঘনিষ্ঠ?

৯.অ্যালবার্টঃ লিজার উইলের ব্যাপারে ওকে সন্দেহ না করে উপায় নেই আপাতদৃষ্টিতে লোকটাকে সৎ এবং বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। কিন্তু এই একটা ব্যাপারেই ওর সততা সম্বন্ধে মনে সন্দেহ জাগে-লোকটা কি আসলেই সৎ ও নীতি পরায়ণ, নাকি চতুর এক ভণ্ড?

১০.অজ্ঞাত ব্যক্তিঃ আগাগোড়াই আমার একটা ধারণা যে, পুরো ঘটনার মধ্যে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির ভূমিকা আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, এমন একজন ব্যক্তি সত্যি কি আছে, নাকি...!

'ঐ যে, দেখ, জানালা দিয়ে কে যেন উঁকি দিচ্ছে...!'

আমার কথা শেষ হবার আগেই লাফ দিয়ে জানালার ধারে পৌঁছে গেল আসাদ। ভাল করে চারদিক চেয়ে বলল, 'কোথায় কে উঁকি দিচ্ছে! ওসব কিছু না, তোমার জ্বরটা বেড়েছে বোধ হয়। কি দেখতে কি দেখেছ, কে জানে!'

'সত্যি বলছি। একটা কঙ্কালসার ফ্যাকাশে মুখ দেখলাম। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই চট্ করে সরে গেল।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে আসাদকে। 'এখানে আসার পর ঐ মুখ আর কখন দেখছ?'

'না চেহারাটা যেন কোন মানুষের নয়! এক কথায় বীভৎস।'

আসাদ কাগজগুলো গুছিয়ে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'যাক, ভালই হয়েছে। আগন্তুক আমাদের কথা আড়ি পেতে যদি শুনেও থাকে লিজার মৃত্যুর ব্যাপারটা যে সাজানো তা জানতে পারেনি। ভাগ্যিস, আমরা এতক্ষণ এ নিয়ে কোন কথা বলিনি!'

'ভাল কথা, তোমার কতদূর অগ্রগতি হলো? বেশ কয়েক ঘণ্টা তো পেরিয়ে গেছে।'

'এত অধৈর্য হলে চলবে কেন, মাত্র তো কয়েক ঘণ্টা পেরিয়েছে। আমার সর্বোচ্চ সময়সীমা চব্বিশ ঘণ্টা। অবশ্য এর কিছুটা হেরফেরও হতে পারে। তবে আমার স্থির বিশ্বাস, কাল বেলা বারোটার মধ্যে ঘটনার অগ্রগতি হবেই।'

পরদিন ভোরেই ঘুম ভাঙল। জ্বর ছেড়েছে। শরীরের ম্যাজম্যাজে ভাবটাও দূর হয়েছে। আসাদের হাতে দৈনিক জনবার্তার কপি। লিজার মৃত্যু সংবাদটা বেশ ফলাও করে ছেপেছে।

নাশতা সেরে ব্যালকনিতে বসে বিশ্রাম করছি। এর মধ্যেই আসাদ বার দুই বাইরে থেকে চক্কর দিয়ে এসেছে। আমাকে বলেছিল সঙ্গে যেতে, কিন্তু শরীর এখনো দুর্বল। তাই হোটেলেই বিশ্রাম নিচ্ছি। বসে বসে এ ক'দিনের ঘটনাগুলো কথা ভাবছি।

এমন সময় বেয়ারা একগাদা চিঠি বাছাই করে যেগুলো আমার নামে এসেছে সেগুলো আমার হাতে দিল। একে একে খুলে পড়তে শুরু

করলাম। প্রথম চিঠিটা এসেছে ঢাকার নামকরা এক প্রেতচর্চা ক্লাব থেকে। ওদের মাসিক সাধারণ সভায় যোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে লেখা। 'দেখো, যদি দু-একদিনে আততায়ীর ধরা না পড়ে শেষমেষ প্রেত সাধকদের সাহায্যই নিতে হবে কিন্তু! প্ল্যানচেটে এলির আত্মাকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলে ঠিক ঠিকই খুনীর নাম জানা যাবে।'

'মনে হয় না,' মন্তব্য করল আসাদ, 'এলি খুন হবার সময় আততায়ী চেহারা দেখতে পেয়েছে কিনা সে ব্যাপারে আমার ঘোর সন্দেহ আছে।'

'খুনীকে না দেখলেও নামটা ঠিক ঠিকই বলতে পারবে। আত্মারা পরপারে গিয়ে সবকিছু জেনে যায়।'

সবশেষ চিঠিটা খুলে পড়তে পড়তে হঠাৎ চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল আসাদের। পড়া শেষ করে সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। চিঠিটা এরকমঃ

মি. রহমান চট্টগ্রাম।

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা রইল। ঐ দিন কক্সবাজার থেকে এখানে ফেরার পর এলির লেখা একটা চিঠি পাই। লিজার ওখানে পৌঁছেই ও এই চিঠিটা আমাকে লিখেছিল। এতে আপনার তদন্তের সাহায্য হবে এমন কোন তথ্য নেই বলেই আমার বিশ্বাস। তবু চিঠিটা আপনি হয়তো দেখতে চাইতে পারেন, তাই এই সঙ্গে পাঠিয়ে দিলাম। কক্সবাজার থাকাকালীন আপনার সহানুভূতি ও সহৃদয়তার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।

শুভেচ্ছান্তে,
এলির মা।

এলির চিঠিঃ

কক্সবাজার।

আম্মা,

কেমন আছো তুমি? আমি ঠিকমতই এখানে এসে পৌঁছেছি। পথে কোন অসুবিধা হয়নি। কক্সবাজারের আবহাওয়া এখন চমৎকার। লিজাকে দেখে মনে হলো, কোন কারণে কিছুটা যেন দুশ্চিন্তা আছে। ভেবে পাচ্ছি না, আমাকে টেলিফোন করার এমন কি দরকার পড়ল? বধুবারের ব্যাপারে সবকিছু তো আগে থেকেই ঠিকঠাক ছিল। মি. ও মিসেস ডি কস্টার সঙ্গে

আলাপ হলো। ওরা এককথায় চমৎকার! রিয়া আর ওর বন্ধু ফিরোজের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। চিঠিটা এখনই বাড়ির কাছে, রাস্তার ওপারে যে ডাকবাক্স আছে তাতে ফেলছি–যাতে কালই তুমি পেয়ে যাও। আজ আর না।

তোমারই
এলি।

'দেখো, তোমার প্ল্যানচেটের আগেই মৃতের সঙ্গে যোগাযোগ হলো আমাদের। আর তার ফলাফল হচ্ছে–বিরাট একটা শূন্য। এলির চিঠিতে যে ডাকবাক্সের উল্লেখ আছে, মি. ডি কস্টা ঐ বাক্সেই লিজার উইলটা অ্যালবার্টের ঠিকানায় পোষ্ট করেছিলেন।'

'উইলটা সত্যি সত্যিই তিনি পোষ্ট করেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে আমার কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ আছে।'

'আমারও। তবে এ ব্যাপারে সত্যি-মিথ্যা সময়েই প্রমাণিত হবে।'

'যাক, বাদবাকি চিঠিগুলোতে কি কিছু পেলে?'

'নাহ্, একদম ফাঁকা। এখন মনে হচ্ছে, পরিকল্পনায় কিছু ভুল ছিল আমাদের... ।'

ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল আসাদ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে চেহারায় পরিবর্তন দেখা গেল ওর। খুশিতে চোখমুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। মিনিট দুয়েক আলাপের পর নামিয়ে রাখল রিসিভার। 'কি, বলিনি, কোন না কোন দিক দিয়ে ঘটনায় অগ্রগতি হবেই! কে টেলিফোন করেছিল, জানো?'

'কে?'

'অ্যালবার্ট। আজকের ডাকে লিজার উইলটা ওর কাছে এসেছে উইলে অবশ্য গত ২৫ ফেব্রুয়ারির তারিখ দেয়া।'

'যাক, তা হলে দেখা যাচ্ছে, পুরো ঘটনায় কিছুটা হলেও অগ্রগতি হয়েছে।'

'হ্যাঁ, এবং আশা আছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আরও অগ্রগতি হবে।'

'তোমার কি মনে হয়, উইলের ব্যাপারে অ্যালবার্ট সত্যি কথা বলছে?'

আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে ও বলল, 'তুমি কি বলতে চাচ্ছো, বুঝতে পেরেছি। আগাগোড়া উইলটা ওর কাছেই ছিল, লিজার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর সেটা সবার কাছে প্রকাশ করতে চাইছে–এই তো? এরকমটা হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।'

'উইল বাটোয়ারার ব্যাপারে কি বলল অ্যালবার্ট?'

'এ ব্যাপারে আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি, এ ছাড়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আগে তা বলা হয়তো আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে উচিতও হবে না। অ্যালবার্ট অবশ্য বলেছে, লিজার অপারেশনের সময় যে উইলটা করা হয়–এটা সেই উইল। সাক্ষী হিসেবে বুয়া ও তার স্বামীর স্বাক্ষর আছে এতে।'

'তা হলে দেখা যাচ্ছে, রবার্টের সম্পত্তি লিজার অধিকারে আসার পর এই উইল অনুসারে রিয়ারই সবচেয়ে লাভবান হবার কথা।'

'হ্যাঁ, এই নামটিই ঘুরেফিরে আসছে বারবার। ফারিয়া ইসলাম, ওরফে রিয়া। চালচলন, আচার-ব্যবহার সবই ওর ভাল। তবু সন্দেহ তালিকায় সবার উপরে স্থান দিতে হচ্ছে ওকে।'

পরিবেশটা হালকা করার জন্য বললাম, 'রিয়া এমনিতে ঠাণ্ডা স্বভাবের হলেও মাঝেমধ্যে ভীষণ রেগে যায়, যখন ফিরোজ ওকে মিস ফা বলে ডাকে।'

'রেগে যাবারই কথা। ফারিয়া থেকে সংক্ষেপ করে রিয়া পর্যন্ত চলতে পারে। কিন্তু শুধু ফা মোটেই শ্রুতিমধুর নয়। আর এই অদ্ভুত শব্দটি যদি প্রেমিক প্রবরের মুখ দিয়ে বেরোয় তা হলে তো রাগ হবারই কথা।'

'এদিক দিয়ে এলিজাবেথ নামটার কিন্তু অনেক সুবিধা। লিজ, লিজা, এলিজা, এলি এরকম আধ ডজন আদুরে নাম বানানো যায় এ থেকে। যাক, এখন বলো তো, তুমি কি আগে থেকেই নিশ্চিত ছিলে যে এরকম একটা ঘটনা ঘটালে উইলটা বেরিয়ে আসবে?'

'না,নির্দিষ্ট কোনকিছু মাথায় ছিল না আমার, তবে বিশ্বাস ছিল, এটা পুরো ঘটনায় যে কোন দিক থেকে পরিবর্তন আনবে। আচ্ছা, এলির চিঠিটা দাও তো, একটা ব্যাপারে কেমন যেন খটকা লাগছে।'

চিঠিটা ওর হাতে দিয়ে আমার চিঠিগুলোয় মনোনিবেশ করলাম। হঠাৎ চিৎকার করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আসাদ। 'উহ্, আস্ত একটা গর্দভ আমি! এবারে সত্যি সত্যি গোয়েন্দাগিরি থেকে আমার ইস্তফা দেয়া উচিত।'

'কি ব্যাপার! এভাবে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছো কেন? হয়েছেটা কি?'

'কি হয়নি, তাই বলো! নাহ্, বুদ্ধি আমার সত্যি সত্যিই ভোঁতা হয়ে গেছে। নইলে... ।'

'আচ্ছা, কি হয়েছে খুলে বলবে তো, নতুন কোন জটিলতার সৃষ্টি হলো নাকি?'

'জটিল? বলছো কি তুমি! ঘটনা তো এখন সরল অংকের চেয়েও সহজ! কিন্তু না, আর একটা কথাও নয়। আমাকে সবকিছু আবার গোড়া

থেকে ভাবতে হবে।' সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকাটায় দ্রুত চোখ বুলাচ্ছে ও। উত্তেজনায় মাঝে মাঝে ঠোঁট কামড়ে ধরছে। আর কথা না বাড়িয়ে আড়চোখে ওকে করতে লাগলাম। একসময় ধপাস্ করে পাশের ইজি চেয়ারটায় বসে পড়ল ও। দু'চোখ বুজে নিঃশব্দে সিগারেট টানছে। চোখ বোজা অবস্থাতেই বিড়বিড় করে কি যেন বলছে আর থেকে থেকে সিগারেটে লম্বা টান দিচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ পর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল ও। চেহারায় পরিতৃপ্তির ছাপ। 'হ্যাঁ, সবকিছু একেবারে খাপে খাপে মিলে গেছে। এ ক'দিন যে ঘটনাগুলো আমাকে ধাঁধায় রেখেছিল সেগুলোর উত্তর পাওয়া গেছে।'

'মানে? তুমি কি এই কিছুক্ষণের মধ্যে রহস্যের কিনারা করে ফেললে নাকি?'

'হ্যাঁ, পুরোপুরি না হলেও নব্বুই ভাগ তো বটেই। একটা কথা জানার জন্য চট্টগ্রামে টেলিফোন করতে হবে-অবশ্য আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে তা হলে ধরে নাও সেটাও ইতি মধ্যেই আমি জেনে গেছি তবু...'

'টেলিফোনের উত্তর পেয়ে নিশ্চিত হবার সাথে সাথেই কি রহস্যের যবনিকাপাত হবে?'

আমার কথা উত্তর না দিয়ে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল আসাদ, 'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, বুয়া থেকে শুরু করে অনেকেরই ধারণা, লিজার বাড়িতে অশরীরী প্রেতাত্মার আনাগোনো আছে। আজ রাতেও ঐ বাড়িতে অশরীরী প্রেতাত্মার আগমন ঘটবে। লিজার প্রেতাত্মা!'

'না,' আমি কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু বাধা দিয়ে বলে উঠল ও, 'এখন আর কোনে কথা নয়। শুধু একটা কথা জেনে রাখো-আজ রাতেই সমস্ত রহস্যের যবনিকাপাত হবে। এখনো অনেক আয়োজন বাকি তুমি বরং বিশ্রাম নাও,' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ও।

দশ

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। জেগে দেখি, অনেকক্ষণ আগেই সন্ধ্যে হয়েছে। আসাদ এর মধ্যে রুমে এসেছিল নিশ্চয়ই। একটা চিরকুট লিখে রেখে গেছে। তাতে রাত আটটার সময় লিজার বাড়িতে উপস্থিত থাকতে বলেছে।

হাতমুখ ধুয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে তৈরি হয়ে নিলাম। লিজার বাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় আটটা বেজে গেল। ডাইনিং হলের গোল টেবিলটা ঘিরে সবার বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসাদের সেই তালিকার প্রায় সবাই উপস্থিত আছে। বুয়ার নাবালক সন্তানকে সন্দেহ করার মত কিছু পাওয়া যায়নি। তাই সম্ভবত এখানে তাকে ডাকা হয়নি। মিসেস ডি কস্টা এসেছেন হুইল চেয়ারে করে। সবার চেহারায় কিছুটা উৎকণ্ঠা। কৌতূহলী চোখগুলো আসাদকে জরিপ করছে যেন।

সবাই যে যার মত আসন গ্রহণ করেছে। ভাল করে সবাইকে একনজর দেখে নিল আসাদ। তারপর অ্যালবার্টকে ইশারা করতেই উঠে দাঁড়াল সে। গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে আরম্ভ করল, 'এখানে আজ কোন প্রথামাফিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিনি আমরা। লিজার আকস্মিক মৃত্যুই আমাদের সবাইকে এখানে জমায়েত করেছে। আর আমরা এ-ও জানি, মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়। কোকেন প্রয়োগের ফলে মৃত্যু হয়েছে ওর। সেটা অবশ্য পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকে আরও ভালভাবে জানা যাবে। কিন্তু সে সব পুলিশী ব্যাপার। তাই আমি সেদিকে যাচ্ছি না।

'এবারে মূল বক্তব্যে আসা যাক। সাধারণত মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরই উইলের বিষয়বস্তু সাধারণ্যে প্রকাশের নিয়ম। কিন্তু লিজার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। উপরন্তু প্রখ্যাত ডিটেকটিভ জনাব আসাদ রহমানের অনুরোধে একটু পরেই উইলটা পড়ে শোনানো হবে। এখানে আর একটা কথা উল্লেখ করতে চাই। যদিও উইলে তারিখ উল্লেখ আছে ২৫ শে

ফেব্রুয়ারি, কিন্তু এটা আজ সকালে ডাকে আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। যাহোক, উইলে হাতের লেখাটা নিঃসন্দেহে আমার ফুফাতো বোন লিজার–এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এ ছাড়া সাক্ষী হিসেবে বুয়া এবং মালীর স্বাক্ষর আছে।'

পাশের ছোট টেবিলের উপর রাখা ব্রিফকেস খুলে লম্বা একটা খাম বের করল অ্যালবার্ট। একটু কেশে গলাটা আরেকবার পরিষ্কার করে নিল সে। এতক্ষণে যারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিসিয়ে কথাবার্তা বলছিল, এবার তারাও চুপ হয়ে গেছে। সবার দৃষ্টি এখন ওই লম্বা খামের দিকে নিবদ্ধ। খামটা খুলে ভেতর থেকে লম্বা একটা কাগজ বের করে মেলে ধরল সেটা। এবারে উইলটা পড়তে শুরু করল অ্যালটবার্টঃ

মিস এলিজাবেথ গোমেজের সর্বশেষ উইল

আমি, এলিজাবেথ গোমেজ, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যয়ভার আমার সম্পত্তি হইতে বহনের জন্য আমি আমার মামাতো ভাই অ্যালবার্ট গোমেজ–যিনি আমার আইন বিষয়ক উপদেষ্টা, তাঁহাকে নির্দেশ প্রধান করিতেছি। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত খরচাদি মিটাইবার পর অবশিষ্ট যাবতীয় সম্পত্তি আমার পিতার প্রতি অসীম আনুগত্য ও অশেষ উপকার সাধনের কারণে কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মিসেস ডি কস্টার নামে এই উইলের মাধ্যমে প্রদান করিলাম।

স্বাক্ষর–

এলিজাবেথ গোমেজ

সাক্ষী

১. সাহেরা খাতুন (বুয়া)

২. আবদুল খালেক (মালী)

কারো মুখে কোন কথা নেই। উইলের বিষয়বস্তু পড়ে শোনানোর পর বিস্ময়ে সবাই যেন বোবা বনে গেছে। হতবিহ্বল ভাব কাটিয়ে প্রথমে কথা বলে উঠলেন মিসেস ডি কস্টাই। 'দেখো দেখি, কি কাণ্ড! এমন কী বা করেছি যার জন্য সম্পত্তি লিখে দিতে হবে? আসলে যেমন বাপ তার তেমনি মেয়ে। পুরনো শুভাকাঙ্ক্ষীকে যেন ভুলে যায়নি এই-ই তার প্রমাণ। লিজা প্রমাণ করে গেল, কৃতজ্ঞতাবোধ জিনিসটা পৃথিবী থেকে উবে যায়নি–' দার্শনিকের মত শোনাল মিসেস ডি কস্টার কণ্ঠস্বর।

এত কথার পরেও উপস্থিত সকলের ইতস্তত ভাবটা কাটল না। একটা চাপা অবিশ্বাসের গুঞ্জন ঘরময় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর

পরিস্থিতিতে অ্যালবার্টের উদ্দেশে বলল আসাদ, 'মনে হয়, নিকট আত্মীয় হিসেবে উইলের বৈধতা নিয়ে আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারেন, তাই না?'

কড়া দৃষ্টিতে আসাদের দিকে চাইল অ্যালবার্ট। 'আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে উইলটা একদম ঠিক আছে। তা ছাড়া আমার ফুফাতো বোনের শেষ ইচ্ছার বৈধতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করব, এরকম ছোট লোক অন্তত আমি নই।'

'আপনার ন্যায়পরায়ণতা দেখে সত্যিই আমি মুগ্ধ। উইলে যা-ই থাক না কেন, আপনি যাতে বঞ্চিত না হন সে দিকটা অবশ্যই আমি দেখব,' বললেন মিসেস ডি কস্টা।

'পুরো ব্যাপারটাই আশ্চর্য ঠেকছে! লিজা কিন্তু এ ব্যাপারে সামান্য আভাসটুকুও কোনদিন দেয়নি,' মন্তব্য করলেন মি. ডি কস্টা।

'কে জানে ওপার থেকে আগ্রহভরা দৃষ্টি নিয়ে হয়তো দেখছে আমাদের,' ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখের কোণে জমে থাকা অশ্রু মুছলেন মিসেস ডি কস্টা। এক পর্যায়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি, 'আজ যদি ওর আত্মা আমাদের মাঝে নেমে আসত তা হলে বলতাম, "লিজা, চাইনা তোমার সম্পত্তি। তুমি আবার আমাদের মাঝে ফিরে এসো"।' দু-হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন মিসেস ডি কস্টা।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল আসাদ। চেহারায় উত্তেজনা। 'আমরা সবাই চাই, লিজা আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসুক। কিন্তু বাস্তবে তো তা হবার নয়,' আমার দিকে নির্দেশ করে বলল, 'এক কাজ করা যাক; হাবিব মিডিয়াম হিসেবে তুলনাহীন। যে কোন আত্মাকেই ইচ্ছে করলে ও ডেকে নামাতে পারে। আমরা যখন সবাই উপস্থিত আছি, তখন প্ল্যানচেটে লিজার আত্মাকে ডেকে আনার চেষ্টা করি না কেন!'

কারো সম্মতি কিংবা অসম্মতির তোয়াক্কা না করে রুমের বাতি নিবিয়ে দিল ও। তবু একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার হলো না। ডাইনিং হল আর ড্রইংরুমের মাঝখানে ভারী পর্দা টানানো। তবু পর্দার ফাঁক দিয়ে আলোর অস্পষ্ট আভা নজরে আসছিল। আর জানালা খোলা থাকায় বাইরে থেকেও খানিকটা আলোর ছটা উঁকি দিচ্ছিল।

আসাদের নির্দেশ সবাই লিজার চেহারা মনে মনে কল্পনা করতে লাগল। একটু পর আমার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে উঠল আসাদ, 'ধৈর্য ধরে আর একটু অপেক্ষা করো। কিছুক্ষণ পরেই শুরু হবে নাটক।'

সময় যেন আর কাটতে চায় না। অন্ধকারে এভাবে বসে থাকতে থাকতে মনের মাঝে কেমন যেন একটা অতিপ্রাকৃত ভাবের সৃষ্টি হয়। স্নায়ুগুলো অতিলৌকিক কল্পনার কাছে তখন পুরোপুরি সমর্পিত হয়ে পড়ে

যদিও আজকের আসরে যারা উপস্থিত তাদের কেউই জানে না, যা আমি আর আসাদ জানি। কিন্তু তবু...। ভাবনার স্রোতে বাধা পড়ল। একটা হিমেল হাওয়ার ঝাপটা রুমের সবাইকে যেন এক অশরীর পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল। দুলে উঠল ড্রইং রুম এবং ডাইনিং হলের মাঝখানের ভারী পর্দা। বাতাসের ঝাপটায় পর্দার মাখখান থেকে দুই অংশে বিভক্ত হয়ে বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁক হলো যেন। ড্রইংরুমের আলো পর্দার সেই ফাঁক দিয়ে ডাইনিং হলেও ঢুকে পড়ল। আর তাই আমাদের সবার দৃষ্টি অজান্তেই চলে যাচ্ছিল ড্রইংরুমের দিকে। আর ঠিক তখনই আরম্ভ হলো নাটক!

কোন্ মন্ত্রবলে যেন খুলে যেতে লাগল ড্রংইরুমে ঢোকার দরজা। সবার দৃষ্টি এখন সেই দিকে। একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে দরজাটা। দরজার বাইরে আলো ও অন্ধকারের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে এক মানবীর প্রতিমূর্তি। বাইরের অন্ধকারে চেহারাটা ঠিক নজরে আসছে না। সমস্ত শরীর সাদা কাপড়ে মোড়া। ধীরে ধীরে মূর্তিটা ড্রইংরুমে ঢুকল–লিজা! ধীর পায়ে ডাইনিং হলের দিকেই এগিয়ে আসছে। অসাধারণ ছন্দোময় ওর প্রতিটি পদক্ষেপ। এক অশরীরী প্রেতাত্মা, বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে আসছে যেন।

পর্দার ফাঁকটাকে হাত দিয়ে টেনে বড় করে এবার ডাইনিং হলে ঢুকল লিজা। 'হায় ঈশ্বর, হায় ঈশ্বর,' বলে চিৎকার করে উঠলেন মিসেস ডি কস্টা। মি.ডি কস্টাও বোধহয় কিছু একটা বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু গলা দিয়ে গর্র্ শব্দ ছাড়া আর কিছু বেরুলো না। ঘটনার আকস্মিকতায় উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে চেয়ার থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে কোনমতে সামলে নিল হোবার্ট। অন্ধকারেও লক্ষ্য করলাম, ভীতচকিত হয়ে ফিরোজের একটা হাত চেপে ধরেছে রিয়া। বুয়া ও তার স্বামী বিড়বিড় করে দোয়া-দরূদ পড়ছে বলে মনে হলো। 'ঐ তো, ঐ তো, লিজা!'–অন্ধকারে কে যেন বলে উঠল। 'আমাদের ভালবাসার, টানে আমাদের মাঝেই আবার ফিরে এসেছে ও'–পাশে থেকে কাঁপাকাঁপা গলায় উচ্চারিত হলো কথাগুলো। কণ্ঠটা মিসেস ডি কস্টার।

হঠাৎ জ্বলে উঠল ডাইনিং হলের বাতিগুলো। সুইচ বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে আসাদ। চেহারায় পরিতৃপ্তির হাসি। মনে হচ্ছে, পুরো নাটকের সফল মঞ্চাভিনয় হওয়ায় বেজায় খুশি হয়েছে ও। কিন্তু তখন কি জানতাম, এটা নাটকের শুরু মাত্র?

বাতি জ্বলে ওঠার পর রিয়াই প্রথমে কথা বলে উঠল, 'লিজা, তুমি কি সত্যি সত্যিই...।'

'হ্যাঁ, আমিই তোমাদের আদি ও অকৃত্রিম লিজা। আর, হ্যাঁ,' মিসেস

ডি কস্টার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাইল ও, 'বাবার জন্য আপনি যা করেছেন সেজন্য আমি ও আমার চোদ্দ পুরুষ আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, উইলের সম্পত্তি ভোগ করার জন্য আরও কিছুদিন আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে,' চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলল লিজা।

'হায়, ঈশ্বর, কি দেখছি এসব?' বিলাপের মত শোনাল মিসেস ডি কস্টার কণ্ঠস্বর। 'লিজা, তুমি তো, মা আমাদের মেয়ের মত। ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই সিরিয়াস কিছু নয়–নিছুক একটা কৌতুক মাত্র।'

'হ্যাঁ, কৌতুকই বটে!' শ্লেষ মেশানো কণ্ঠে বলল লিজা।

আবার খুলে গেল ড্রইংরুমের দরজা। দরবলসহ ভেতরে ঢুকল জাফর। ডাইনিং হলের দিকে এগিয়ে এল ওরা। 'কি সৌভাগ্য আমার! কৌতুক মেশানো কণ্ঠে বলে উঠল জাফর, 'বহুদিন পর পুরনো এক শুভাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।' মিসেস ডি কস্টার দিকে তর্জনী উঁচিয়ে সবার উদ্দেশে বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই–মিলি রোজারিও, দেশের শ্রেষ্ঠ মহিলা জালিয়াত।' জাফরের ইঙ্গিত পেয়ে দুজন কনস্টেবল হুইল চেয়ারে বসা অবস্থাতেই হাতকড়া পরিয়ে দিল ওকে। সবার উৎসুক দৃষ্টিতে দিকে ফিরে জাফর বলল, 'অপরাধ জগতে মিলি রোজারিওর মত চতুর জালিয়াত আর আছে কিনা সন্দেহ! অ্যাক্সিডেন্টে পঙ্গু হবার পরেও তার ফন্দিবাজ মাথা কিন্তু সবসময়েই সক্রিয় ছিল। আর তার প্রমাণ হচ্ছে এই উইল।'

'উইলটা কি তা হলে জাল?' জিজ্ঞেস করল অ্যালবার্ট।

'অবশ্যই জাল,' উত্তর দিল লিজা। 'যদিও হাতের লেখাটা আমার মতই, কিন্তু যে উইলটা আমি লিখেছিলাম তাতে এই বাড়িটা তোমাকে আর বাদবাকি সম্পত্তি রিয়ার নামে লিখে দিয়েছিলাম। সম্ভবত সাক্ষীর সই দুটোও জাল।' অ্যালবার্টের হাত থেকে উইলটা নিয়ে তাতে চোখ বুলিয়ে কয়েকবার মাথা নাড়ল লিজা।

'শুধু আপনার উইলই নয়। আজ ওদের বাসায় গোপনে তল্লাশী চালিয়ে আরও কিছু জাল উইল, দলিল, হুণ্ডি ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। আসাদ, একদিন কথায় কথায় তুমি বলেছিলে, ওদের বাসায় ঢোকার সময় নাকি শিসের শব্দ শোনা যায়। এটা আর কিছু নয়, সঙ্কেতের আদান-প্রদান। কারণ হুট্ করে কেউ ঘরে ঢুকে গেলে জালিয়াতির নানারকম আলামত দেখে ফেলতে পারে, তাই এই সতর্কতা,' বলল জাফর।

আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম কি হবে, তা নিয়ে ভাবছি। এমন সময় ঘটল অঘটন। খোলা জানালা দিয়ে পিস্তলের নল দেখা গেল। আমরা কিছু

বুঝে ওঠার আগেই গর্জে উঠল সেটা। একই সঙ্গে বাইরে ভারী কিছু পতনের শব্দ শোনা গেল। এদিকে রিয়ার বাহুতে লেগে বুলেটটা দেয়ালে গিয়ে আঘাত করল। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হতবিহ্বল, কারো মুখে কোন কথা নেই। আসাদ দৌড়ে গেল জানালার দিকে। ঝুঁকে পড়ে কিছু একটা দেখার চেষ্টা করছে। পরমুহূর্তেই ড্রইংরুমের দরজা-খুলে বাগানের দিকে দৌড়ে গেল। পেছনে পেছনে ওকে অনুসরণ করল হোবার্ট।

মিনিট দুয়েক পর চ্যাংদোলা করে একটা লোককে নিয়ে এল ওরা। লোকটার চেহারার দিকে চেয়ে চমকে উঠলাম–সেই লোকটা! হোটেলের জানালায় উঁকি দিয়েছিল যে, কথা শুনছিল আড়িপেতে। সাদা ফ্যাকাশে একটা মুখ। চেহারায় বন্য জন্তুর হিংস্রতা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, শরীর অত্যন্ত দুর্বল। পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে লোকটার। অতিকষ্টে চোখ মেলে চাইল সে। ধীর পায়ে তার দিকে এগিয়ে এল রিয়া।

'আপনার কি খুব বেশি লেগেছে?'

'না। ডান বাহুর মাংস সামান্য ছড়ে গেছে,' আসাদের কথার জবাব দিল রিয়া।

লোকটার কাছে বসে তার মাথায় হাত রাখল রিয়া। কিছুক্ষণ পর মুখে কথা ফুটল লোকটার, 'বিশ্বাস করো, রিয়া, আমি সত্যি সত্যিই তোমায় খুন করতে চাইনি। আমার জন্য তুমি শুধু শুধু কষ্টই পেয়ে গেলে,' বোঝা যাচ্ছে, শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে লোকটার। নিঃশ্বাস নিতে এখন রীতিমত কষ্ট হচ্ছে তার। 'আমি তোমার কোন ক্ষতি...চাই...না...সুখে...থে...কো... ভা...লো...থে...' কথাটা পুরাপুরি শেষ করতে পারল না। একটা খিঁচুনি তুলে নিথর হয়ে গেল দেহটা।

দু–হাতে মুখ ঢাকল রিয়া। সবার দৃষ্টি এখন ওর দিকে নিবদ্ধ। 'হ্যাঁ, এই লোকটাই আমার প্রাক্তন স্বামী।'

'আমাদের সন্দেহ তালিকার সেই "অজ্ঞাত ব্যক্তি",' মন্তব্য করলাম।

'হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছো, তুমি,' সায় দিল আসাদ, 'শুরু থেকেই আমার মনে হয়েছে, ঘটনায় অদৃশ্য কারো হাত আছে। আজ তার প্রমাণ পাওয়া গেল।'

আবার কথা বলে উঠল রিয়া, 'গত কয়েক বছর ধরে কোকেনের নেশা করছে ও। আমাকেও এই পথে আনতে চেষ্টা করেছিল। ওর ফাঁদে পা দিয়ে প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। অনেক কষ্টে এই সর্বনাশা নেশার খপ্পর থেকে নিজেকে মুক্ত করেছি। ওদিকে ওর নেশার মাত্রা এমন চরমে গিয়ে ঠেকল

যে সংসার করাই একরকম অসম্ভব হয়ে পড়ল। ফিরে এলাম নিজের বাড়িতে। আর তখন থেকে শুরু হলো যন্ত্রণার আরেক অধ্যায়।

'আমাকে সামাজিকভাবে অপদস্থ করার ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইলিং করতে শুরু করল। প্রায়ই এসে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করত। বাধ্য হয়ে দিতে হত আমাকে। দিনকে দিন বেড়েই চলল ওর চাহিদা। আমার পক্ষে ওর খাঁই মেটানো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে শাসাতে লাগল, যদি টাকা না দিই তা হলে খুন করবে আমাকে। আসলে নেশার পাপচক্রে এমনই জড়িয়ে গিয়েছিল যে কোন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না। সর্বনাশা নেশাই শেষ পর্যন্ত কাল হয়ে দাঁড়াল ওর জীবনে।~

আমার প্রথম থেকেই মনে হচ্ছেল, হয়তো আসাদ সাহেব আরও ভাল বলতে পারবেন, এলিকে সম্ভবত ও-ই খুন করেছে। কারণ যেদিন এলি খুন হয় তার আগের দিন ওকে টাকা দেয়ার সময় সীমা পার হয়ে গিয়েছিল। ও আমাকে শাসিয়েছিল, যদি টাকা না দিই তা হলে গুলি করে মারবে আমাকে। ঐদিন সম্ভবত এলিকেই অন্ধকারে আমি ভেবে ভুল করেছিল। কথাটা অবশ্য আগেই বলা উচিত ছিল আমার। কিন্তু তখন পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না। এ ছাড়া লিজার উপর বেশ কয়েকবার হামলা হওয়ায় মনে সন্দেহ জন্মেছিল এতে অন্য কেউ জড়িত থাকলেও থাকতে পারে।

'তারপর হঠাৎ একদিন আসাদ সাহেবের রুমে ঢুকে দেখলাম, টেবিলে ছোটো একটা দোমড়ান চিরকুট। সেটা আর কিছুই নয়, আমার কাছে লেখা একটা হুমকিপত্রের অংশবিশেষ। বুঝলাম, আসাদ সাহেব ঠিক পথেই এগোচ্ছেন। জানতাম, একসময় ও ধরা পড়বেই–এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। কিন্তু একটা ব্যাপার এখনো মাথায় ঢুকছে না আমার। আমাকে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায়ের সঙ্গে লিজাকে কোকেন পয়জনিং করার কি সম্পর্ক থাকতে পারে? আমাকে বিপদে ফেলার এটাও ওর আরেকটা কৌশল ছিল কিনা কে জানে!' আবারও দু-হাতে মুখ ঢাকল রিয়া।

এগারো

ফিরোজ এগিয়ে এসে রিয়ার কাঁধে হাত রাখল। 'কি, খুব বেশি খারাপ লাগছে?'

'না, না, ঠিকই আছি আমি–মাথাটা সামান্য ধরেছে।'

ওকে ধরে পাশের ইজি চেয়ারটায় বসিয়ে দিল ফিরোজ। গ্লাসে করে পানি এগিয়ে দিল। ঢক্‌ঢক্‌ করে গ্লাসের পুরো পানিটুকু নিঃশেষ করল রিয়া। এখন একটু যেন ভাল মনে হচ্ছে ওকে।

'এখন আমাদের কি আর কিছু করণীয় আছে?' জাফরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল রিয়া।

'আজ এখানে যা-কিছুর আয়োজন, সবই আসাদের নির্দেশে। এ ব্যাপারে থানা কর্তৃপক্ষ ওকে পুরো ক্ষমতা দিয়েছে। আজ আমি এখানে একজন অতিথি বৈ কিছু না। আমাদের আর কিছু করণীয় আছে কি নেই, সে কথা ও-ই ভাল বলতে পারবে।

রিয়া এবার ফিরল আসাদের দিকে। 'আপনিই কি তা হলে আজ স্থানীয় থানার প্রতিনিধিত্ব করছেন?'

'কী যে বলেন! আমি কর্তৃপক্ষের একজন নগণ্য উপদেষ্টা মাত্র। তাদের নির্দেশেই আজ রাতে আমাদের সবাইকে এখানে জড়ো হতে হয়েছে। এখানে আমি নেহায়েত একজন সমন্বয়কারী ছাড়া আর কিছু না।'

'আচ্ছা, এবার তা হলে পুরো ব্যাপারটার ইতি টেনে ফেলা যায় না?' জিজ্ঞেস করল লিজা।

'আপনি কি তাই চান?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল আসাদ।

'হ্যাঁ, করণীয় আর কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। পুরো ঘটনাই ঘটেছে আমাকে নিয়ে। নিশ্চয়ই আমার উপর নতুন করে আর হামলা হবে না–হামলাকারী আইনকে ফাঁকি দিয়ে এখন পরপারে।'

'হুঁ,' গম্ভীর কণ্ঠ আসাদের। কপালে চিন্তার ভাঁজ।

ওর চিন্তাক্লিষ্ট চেহারার দিকে চেয়ে আবার বলল লিজা, 'আপনি হয়তো এলির কথা ভাবছেন। কিন্তু কোন কিছুই আর তাকে আমাদের মাঝে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। এছাড়া এসব নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে অনর্থক রিয়াকেই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলা হবে।'

'আপনার কি তাই-ই মনে হয়?'

'নয় তো কি? আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম ওর স্বামী মানুষ নয়, একটা পশু। আর নিজের চোখেই তো দেখলেন। যাক, মরে গিয়ে ও নিজে বেঁচেছে, সেই সাথে সবাইকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে যবনিকাপাত হয়েছে পুরো ব্যাপারটার। এখন পুলিশ কর্তৃপক্ষ যদি মনে করে, তদন্ত সম্পূর্ণ হয়নি, তা হলে তাদের কাজ তাদেরকেই করতে দিন। ওরা হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াক এলির হত্যাকারীকে। কিন্তু যেটা বলছিলাম, ব্যাপারটা নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করলে রিয়াকেই ঝামেলায় পড়তে হবে বেশি।'

'তো আপনি বলছেন, ঘটনার এখানেই ইতি টানতে?' চোখের তারায় কৌতুক খেলা করছে আসাদের।

'হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কী বা করার আছে! বলল রিয়া।

কঠিন দৃষ্টিতে সবার চেহারার দিকে একবার করে চোখ বুলিয়ে নিল আসাদ। 'আপনারা সবাই কি বলেন? সবকিছুর এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটানো উচিত, নাকি প্রথামাফিক তদন্ত চলতে থাকবে?'

প্রথমে আমার দিকে চাইল ও। 'ঝামেলার এখানেই ইতি হয়ে যাওয়া ভাল,' বললাম।

ফিরোজের দিকে চাইতে সে-ও আমার কথায় সায় দিল। একে একে সবার মতামত নেয়া হলো। প্রায় সবাই ঘটনার ইতি টানার পক্ষে মত দিল।

জাফর বলল, 'যেহেতু আমি আজ এখানে অতিথি-তাই কোন পক্ষ নেয়া আমার সাজে না। আর তাই এ ব্যাপারে আমি বরং নিরপেক্ষই রইলাম।'

'এরকম একটা ব্যাপার বিনা তদন্তে ইতি টানা আইনের দৃষ্টি-কোণ থেকে কিছুতেই উচিত হবে না,' জোরাল কণ্ঠে নিজের মতামত ব্যক্ত করল অ্যালবার্ট।

'শেষ পর্যন্ত তুমিও একথা বললে, অ্যালবার্ট? রিয়ার এবং আমাদের মান-সম্মানের কথা একবারও ভাবলে না?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লিজা।

'আমি খুবই দুঃখিত, লিজা। আইন নিয়েই কারবার আমার-আর তাই সবকিছুই আমাকে আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হয়।'

'আপনার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে সত্যিই আমি মুগ্ধ হয়েছি, অ্যালবার্ট। তা হলে দাঁড়াচ্ছে, একজন বনাম বাকিরা সবাই। বন্ধু জাফর নিয়েছে দর্শকের ভূমিকা। আমিও সেই একজনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সত্য উদ্‌ঘাটনের পক্ষে ভোট দিচ্ছি।'

'আসাদ সাহেব!' মিনতি ঝরে পড়ল লিজার কণ্ঠে।

'লিজা, আমি কিন্তু নিজে থেকে এই ঘটনায় জড়াইনি। পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে সক্রিয় ভূমিকা নিতে। আর তাই সত্য উদ্‌ঘাটিত না হওয়া পর্যন্ত কাজ শেষ হবে না আমার।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের সবার দিকে তর্জনী উঁচিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও, 'আপনারা সবাই যে যার আসনে চুপ করে বসুন। পুরো ঘটনা আসলে কি সেই সত্যটাই এখন আপনাদের কাছে বলব আমি,' পকেট থেকে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের তালিকাটা বের করে টেবিলে রাখল, 'এখানে এক থেকে দশ পর্যন্ত সন্দেহজনক ব্যক্তিদের একটি তালিকা তৈরি করেছি। এতে নয় জনের নাম অর্ন্তভুক্ত করার পর মনে হলো ঘটনায় এমন কেউ থাকতে পারে, যে পর্দার আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ছে। তাই ক্রমিক নম্বর দশ–এ একজন ''অজ্ঞাত ব্যক্তি'কে অর্ন্তভুক্ত করলাম। আর আমার অনুমান যে সত্যি, আজ রাতে তা টের পাওয়া গেল।

'কিন্তু আজ দুপুরের দিকে পুরো ঘটনাটা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম–মারাত্মক একটা ভুল হয়ে গেছে। ঐ তালিকায় আমি একজনকে বাদ দিয়ে গেছি। তারপর নতুন ক্রমিক নম্বর এগারো যোগ করলাম।'

'তা হলে কি পুরো ঘটনায় আরও একজন অজ্ঞাত ব্যক্তির হাত আছে?' জিজ্ঞেস করল অ্যালবার্ট।

'না ঠিক তা নয়। সেক্ষেত্রে প্রথম জনকে দশ (ক) এবং দ্বিতীয় জনকে দশ (খ) হিসেবে চিহ্নিত করা যেত। এখানে ক্রমিক নম্বর এগারোর আলাদা বৈশিষ্ট আছে। তার নাম এই তালিকায় আগেই অর্ন্তভুক্ত করা উচিত ছিল, অথচ সে আমাদের সবার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।' রিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল আসাদ, 'আপনি জেনে খুশি হবেন আপনার স্বামী কিন্তু এলিকে খুন করেনি। ওকে খুন করেছে আমাদের তালিকার সেই এগারো নম্বর ব্যক্তি।'

সন্দেহভরা দৃষ্টিতে আসাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল রিয়া, 'কিন্তু এই এগারো নম্বর ব্যক্তিটি কে?'

আসাদ এবার জাফরের দিকে ইঙ্গিত করতেই উঠে দাঁড়াল সে। 'আসাদের কাছ থেকে গোপনে খবর পেয়ে সন্ধ্যাবেলায় আপনারা এখানে

পৌঁছানোর আগেই সবার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে বিশেষ একটা জায়গায় লুকিয়ে থেকে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছিলাম।

'আপনারা এখানে জমায়েত হবার পর অ্যালবার্ট যখন লিজার উইল পড়তে শুরু করেছে, সে সময় লক্ষ্য করলাম আস্তে আস্তে খুলে যাচ্ছে ড্রইংরুমের দরজা। এক যুবতী খুব ধীর পায়ে ড্রইংরুমে প্রবেশ করল। রুমে বিছানো কার্পেটের একটা অংশ সরিয়ে ফেলল। তারপর দেয়ালে টাঙানো একটা অয়েল পেইন্টিং সরাল। সেখানে দেখা গেল একটা সুইচ। তাতে চাপ দিতেই কার্পেট সরানো অংশের মোজাইক সরে গিয়ে বেশ বড় একটা গর্তের সৃষ্টি হলো। সেই গর্তে হাত ঢুকিয়ে একটা পিস্তল বের করে আনল মেয়েটা। তারপর সবকিছু আবার ঠিকঠাক করে ড্রইংরুমের পাশেই যে ড্রেসিং রুমটা, সেখানে প্রবেশ করল সে। আজ যারা এখানে এসেছে তাদের অনেকেরই গরম কাপড়, ভ্যানিটি ব্যাগ, ছড়ি ও অন্যান্য জিনিস রাখা দেখলাম রুমটায়। মেয়েটা এবারে রুমাল দিয়ে পিস্তলটা ভালভাবেই মুছে সেটা চালান করে দিল একটা লেডিস কোটের পকেটে। কোটটা আর কারো নয়–রিয়ার!'

একটা আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল লিজার কণ্ঠ থেকে, 'মিথ্যে, সব মিথ্যে! এসবের একবর্ণও বিশ্বাস করি না আমি।'

সবার দিকে চেয়ে বলল আসাদ, 'আসুন, এবার এলির খুনীর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই। খুনী সেই তালিকার এগারো নম্বর ব্যক্তি। সে আর কেউ নয়, আমাদের সবার অতি পরিচিত মিস এলিজাবেথ গোমেজ ওরফে লিজা।'

কারো মুখে কোন কথা নেই। রুমে বজ্রপাত হলেও বোধহয় এতটা অবাক হত না কেউ।

ততক্ষণে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে লিজা। চিৎকার করে বলে উঠল সে, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে! এলিকে আমি খুন করতে যাব কেন?'

'সেটা আমার চেয়ে আপনিই ভাল জানেন। রবার্টের বিপুল সম্পত্তির লোভেই ওকে খুন করেছেন আপনি। ওর আসল নামও এলিজাবেথ গোমেজ। আপনি নন, এলিই ছিল রবার্টের বাদদত্তা।'

'আপনি...আপনি...' কিছু একটা বোধহয় বলতে চাচ্ছিল লিজা, কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

আসাদ জাফরের দিকে ইশারা করতেই হুইসল বাজাল সে। বাইরে

থেকে আর কয়েকজন কনস্টেবল এসে রুমে ঢুকল। লিজাকে ওদের সঙ্গে যেতে নির্দেশ দিল সে।

'আপনারা সবাই নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন,' অপ্রকৃতিস্থের মত শোনাল লিজার কণ্ঠ। 'কই, রিয়া, দাও দেখি তোমার ঘড়িটা। যেখানেই থাকি না কেন, সময় দেখতে এটা খুব কাজে লাগবে আমার।'

কয়েক মুহূর্ত বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে হাতের ঘড়িটা খুলে ওর হাতে দিল রিয়া। 'কিছু ভেবো না,' বলল লিজা 'এসব অবাস্তব ও আষাঢ়ে গল্প আদালতে টিকবে না। খুব শিগগিরই আমি আবার ফিরে আসব সবার মাঝে। কিন্তু, আসাদ সাহেব, আপনাকে তো সবাই নামজাদা গোয়েন্দা হিসেবেই জানে। আপনি এই কৌতুক নাটকের অবতারণা করতে গেলেন কেন?' আগের মেজাজ যেন ফিরে এসেছে লিজার কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, কৌতুক নাটকই বটে!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল আসাদ, 'আর এই কৌতুক নাটকের প্রধান চরিত্রে আমাকে অভিনয় করতে দেয়া কিছুতেই উচিত হয়নি আপনার। এই ভুলটাই মারাত্মক বিপদ ডেকে এনেছে আপনার জন্যে।'

বারো

জাফর এবং তার দলবল, লিজা, মিঃ ও মিসেস ডি কষ্টাসহ চলে যাবার পর বাদবাকি লোকজনের ভিড় কমে গেলে রিয়া, ফিরোজ হোবার্ট অ্যালবার্ট, আসাদ ও আমি ডাইনিং হল থেকে ড্রইংরুমে এসে বসলাম। সবার জিজ্ঞাসা দৃষ্টি তখন আসাদের দিকে।

'ওহ্ আমাকে কি বোকাটাই না বানিয়েছে মেয়েটা! এ ক'দিন ধরে কলের পুতুলের মত যেভাবে খুশি সেভাবে নাচিয়েছে। রিয়া, আপনাকে বলতে শুনলাম লিজা নাকি অহরহ মিথ্যা কথা বলে। কথাটা যে কত সত্যি তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি–তবে অনেক পরে।'

'হ্যাঁ, লিজা যখন তখন মিথ্যা কথা বলত,' সায় দিল রিয়া 'আর তাই ওর উপর হামলার ঘটনাগুলো আমার কেন যেন বিশ্বাস হতে চাইত না।'

'কিন্তু এর ঠিক উল্টোটা ঘটেছিল আমার ক্ষেত্রে। আর সে জন্যেই ও যা বলত ঠিক তাই-ই বিশ্বাস করতাম আমি–এমনকি ওর উপর হামলার কাল্পনিক কাহিনিগুলোও।'

'তার মানে? ওগুলো কি তা হলে সত্যি সত্যিই ঘটেনি?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না। খুব বুদ্ধি খাটিয়ে ওগুলো সাজানো হয়েছিল যাতে সত্যি সত্যিই মনে হয়, লিজার জীবন বিপন্ন। থাক সে কথা,' আমার দিকে ফিরল আসাদ, 'পুরো ঘটনাটা যেভাবে ধাপে ধাপে পরিণতির দিকে এগিয়েছে, এখন আমি সেটাই তোমাদের বলব। এগুলো কিন্তু একবারে চট্ করে মাথায় আসেনি। একটার সঙ্গে আরেকটা সূত্র জোড়া দিয়ে তবেই দাঁড় করাতে হয়েছে এর কাঠামো।

'লিজার সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হলো তখন আমরা কি দেখলাম? অভিভাবকহীন বখে যাওয়া এক যুবতী, যার সাধ আছে সাধ্য নেই। দেনার দায়ে পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া বাড়িটাও বন্ধক দেয়া।

'বছর দুয়েক আগে লিজার সঙ্গে রবার্টের পরিচয় হয়। ও জানত, রবার্টের দাদা দেশের হাতে গোনা কয়েকজন শিল্পপতিদের একজন। ও নিশ্চয়ই বুঝেছিল, তাঁর বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এই রবার্ট। কাজেই ওকে প্রেমের ফাঁদে ফেলতে পারলে বিরাট লাভ। অন্যদিকে, লিজার সঙ্গে রবার্টের মেলামেশাটা ছিল বন্ধুর মত। ঠিক প্রেম বলতে যা বোঝার তা ওদের মাঝে ছিল না।

'বছরখানেক আগের কথা। রবার্টের সঙ্গে চট্টগ্রাম বেড়াতে গেল লিজা। এসময় রবার্টের সঙ্গে পরিচয় হলো এলির। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা আর ঘনিষ্ঠতা থেকে প্রেমের জন্ম হলো। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল লিজার। রবার্ট যে এলির মত সাধারণ একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলবে, এটা ধারণাতেও ছিল না তার। যে মেয়ে সুন্দরীর তালিকায় বিশেষ স্থান পায় না, রবার্টের চোখে তাকেই মনে হলো অসামান্য। আরও দুর্যোগ অপেক্ষা করছিল লিজার জন্য। গোপনে বাগদান-পর্ব সম্পন্ন করল ওরা। একথা এলি আর কাউকে না বললেও লিজাকে নিশ্চয়ই বলেছিল। এবং পরবর্তী সময়ে রবার্টের লেখা প্রেমপত্রগুলোও সরল মনে ওকে দেখিয়েছিল। এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে। আত্মীয়তার দিক দিয়ে ওরা চাচাতো বোন। এ ছাড়া একে অপরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বান্ধবীও। এলিকে লেখা রবার্টের একটা চিঠি পড়ে লিজা বুঝতে পেরেছিল, রবার্টের কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেলে তার বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারীণী হবে এলিই। তাৎক্ষণিকভাবে ব্যাপারটাকে ততটা গুরুত্ব না দিলেও কথাটা কিন্তু ঠিক ঠিকই মাথায় রয়ে গিয়েছিল লিজার। এরপর ঘটে গেল পরপর দুটো দুর্ঘটনা। অপারেশন করাতে গিয়ে মারা গেলেন রবার্টের দাদা। এর কয়েক দিন পর গ্লাইডারসহ নিখোঁজ হলো রবার্ট। চট্ করে কূটবুদ্ধি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল লিজার।

'রবার্টের মত উড়নচণ্ডী মানুষ যে খুব সাধারণভাবে উইল করে যাবে-একথা বুঝতে বেশি বেগ পেতে হয়নি লিজার। এমনকি এলি এবং লিজা-দুজনের আসল নামই যে এলিজাবেথ গোমেজ, এটাও সম্ভবত রবার্টের জানা ছিল না। এদিকে পরিচিত মহল ও বন্ধু বান্ধব সবাই জানে রবার্টের সঙ্গে বন্ধুত্ব লিজার। উৎসাহী বন্ধু বান্ধবের কেউ কেউ এদের দুজনের সম্পর্কের মাঝে প্রেমের গন্ধ খুঁজে বেড়ালেও অবাক হবার কিছু নেই। অন্যদিকে এলির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারটা লিজা ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন রবার্ট মারা যাবার পর যদি সে দাবি করে যে, মৃত্যুর আগে তার সঙ্গেই ওর বাগদান হয়েছিল তা হলে অবাক হবে না কেউ। এ ছাড়া পরবর্তী সময়ে ওর উইল যখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে তখন উত্তরাধিকারিণী হিসেবে এলিজাবেথ গোমেজকেই (লিজা) স্বীকৃতি দেয়া

হবে। যদিও আমরা জানি, উইলের এলিজাবেথ গোমেজ আসলে এলি।

'কাজটা সাফল্যের সঙ্গে সমাধা করতে হলে এলিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে। ও তাড়াতাড়ি এলিকে খবর পাঠাল যাতে ওর এখানে এসে কয়েকদিন বেড়িয়ে যায়। আর এদিকে ওর মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার গল্পগুলো ও কায়দা করে সবার মাঝে প্রচার করতে আরম্ভ করল। অয়েল পেইন্টিংয়ের কর্ড ও নিজেই কেটেছিল, আর গাড়ির ব্রেক ফেল করার ব্যাপারটাও ওরই কারসাজি। এ ছাড়া ছোট ছোট টিবিগুলো থেকে পাথরের চাঁই গড়িয়ে দেয়ার গল্প বিশ্বাস করানোর জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না।

'এসব ঘটনার পরপরই পত্রিকায় কিংবা লোকমুখে আমার কক্সবাজার আসার কথা জানতে পারে ও। সত্যি সাহস আছে মেয়েটার। আমাকে দলে ভিড়িয়ে নিয়ে ওর কার্যোদ্ধার করার মত স্নায়ুর জোর দেখে সত্যি অবাক হয়েছি আমি। আর কি অদ্ভুত কৌশল প্রথম দিনেই আমাকে ওর দলে ভিড়িয়ে নিল! একটা হ্যাট আগে থেকে পিস্তল দিয়ে গুলি করে সেই ব্যবহৃত গুলিটা কৌশলে ফেলে আসা এবং স্বেচ্ছায় হ্যাটটা হোটেলের লনে রেখে দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা—এ সমস্তই অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছে সে। আর তখন থেকেই আমি হয়ে গেলাম ওর হাতের পুতুল। যেভাবে আমাকে খেলাতে চাইল, আমিও ঠিক সেবাবেই খেলে গেলাম। আর এতে সুবিধা হলো, ও যা-ই করুক না কেন, যেহেতু আমি ওর সঙ্গে সঙ্গেই আছি তাই ঘুণাক্ষরেও কেউ ওকে সন্দেহ করবে না। আমার তো সন্দেহ করার প্রশ্নই আসে না।

'হ্যাটের সেই ঘটনার পর আমি ওকে বললাম, কোন নিকট আত্মীয়কে কাছে এনে রাখতে। আমার কথায় সায় দিয়ে ও এলিকে নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগেই এখানে আসার জন্য টেলিফোন করল। যেদিন এলি এসে পৌঁছল ঐদিন রাতেই তাকে খুন করা হলো। আর কত সহজে যে ও খুনটা করল, ভাবতেও অবাক লাগে। এলি গায়ের শাল খুঁজতে যাওয়ার পরপরই লিজাও ভেতরে গেল। তখন রাত প্রায় আটটা। যদিও সকালের খবরেই রবার্টের পরিণতি সম্বন্ধে জানা গেছে, তবু আটটার খবরে সেকথা আরেকবার শুনে নিশ্চিত হয়ে নিল ও। তক্ষুনি পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে লেগে গেল। ড্রইংরুমের গুপ্ত কুঠুরি থেকে পিস্তলটা বের করা মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার। ঐ সময় বাজি পোড়ানো দেখতে ব্যস্ত ছিল সবাই। আর তখন দোতলা থেকে লাশটা খুঁজে বের করে নিচে নামছে এলি, এমন সময় সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হয়ে গেল দুজনের। কোন গোপন কথা বলবে বলে এলিকে বাড়ির পেছন দিকে নিয়ে গেল লিজা। তারপর

খুব সহজেই সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল দিয়ে সমাধা করল তার আরাধ্য কাজটা। পিস্তলটা জায়গামত রেখে সবার সঙ্গে আবার যোগ দিল বাজি পোড়ানো দেখতে।

'অল্প কিছুক্ষণ পর আমরা মৃতদেহটা দেখতে পেলাম। লিজাও একটু পরে সেখানে এসে উপস্থিত। ও এলির মৃতদেহ দেখতে পেয়ে যে অভিনয়টা করল তা রীতিমত তাক লাগিয়ে দেয়ার মত। সত্যিই, কুটবুদ্ধি আর অভিনয়–এ দুটো বিষয়ে তুলনা হয় না ওর। বুয়া একদিন কথায় কথায় বলছিল, এই বাড়ির দেয়ালে কান পাতলে নাকি যতসব অশুভ আর অতিলৌকিক শক্তির আনাগোনা টের পাওয়া যায়। অমঙ্গল যেন সবসময় হাতছানি দিয়ে ডাকে। আমিও তার কথার সঙ্গে একমত না হয়ে পারছি না। এই বাড়িতে থেকেই লিজা এরকম জঘন্য অপরাধ করার উৎসাহ পেয়েছে।'

'আচ্ছা, চকোলেটের ব্যাপারটা আসলে কি?' জিজ্ঞেস করল রিয়া।

'এটাও পুরো পরিকল্পনারই একটা অংশ। আমরা এমনিতে সবাই বলাবলি করতাম, আততায়ী ভুল করে এলিকে লিজা ভেবে খুন করেছে। এখন এলির মৃত্যুর পরও যদি ওর উপর হামলা হয় তা হলে সবার মনে এই ধারণাটাই পাকাপোক্ত হবে যে, এলির মৃত্যুটা দৈবাৎ আততায়ীর ভুলের জন্যই হয়েছে। যখন লিজা বুঝতে পারল, উপযুক্ত সময় এসেছে তখন আপনাকে ফোন করে এক বাক্স চকোলেট পাঠানোর কথা বলল।'

'টেলিফোন গলাটা কি ওরই ছিল?'

'নয়তো কার? কথা বলার সময় ও কণ্ঠস্বরটাকে একটু অন্যরকম করেছিল যাতে আপনাকে জেরা করলে দ্বিধায় পড়ে যান। এখানে কাকতালীয়ভাবে কারোর পাঠানো চকোলেটের দ্বিতীয় বাক্সটা পুরো ব্যাপারটাকে আরও ঘোলা করে তুলল। যখন আপনার পাঠানো চকোলেটগুলো ও হাতে পেল তক্ষুণি লেগে গেল কাজে। কোকেনের নেশা আছে লিজার। ও জানে, চকোলেটে কি পরিমাণ কোকেন মেশাতে তা খেয়ে একজন অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। সঙ্গে কোকেন রাখত ও। মোট তিনটে চকোলেটে কোকেন মেশানোর পর সেগুলো থেকে একটা খেয়েই এমন ভান করল, যেন জীবন বিপন্ন। আর ঐ কার্ডের ব্যাপারটা! ভেবে আশ্চর্য হই, কি শক্ত নার্ভ মেয়েটার! ফুলের তোড়ার সঙ্গে পাঠানো আমার কার্ডটাই ও চকোলেটের বাক্সে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে সেঁটে দিয়েছিল। সহজ ব্যাপার যদিও, তবু সময়মত ও বুদ্ধিটা কাজে লাগিয়েছিল দারুণ!'

'সবই না হয় বুঝলাম, কিন্তু আমার কোটের পকেটে ও পিস্তলটা রাখতে গেল কেন?'

'জানতাম, কথাটা একসময় আপনার মাথায় খেলবেই। আচ্ছা, একটু ভেবে বলুন তো, কখনো কি মনে হয়েছে যে লিজা আপনাকে আর তেমন একটা পছন্দ করে না? কিংবা এমন কি কখনো মনে হয়েছে, ও আপনাকে ঘৃণা করে?'

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বলল রিয়া, 'বলা খুবই কঠিন। তবে এটা ঠিক, বেশ কিছুদিন থেকে আমাদের আগের ঘনিষ্ঠতায় চিড় ধরেছে।'

'আচ্ছা, এবারে আপনি বলুন তো, ফিরোজ, আপনার সঙ্গে লিজার কি কখনো কোন হৃদয়ঘটিত ব্যাপার গড়ে উঠেছিল?'

'না, প্রেম বলতে যা বোঝায় ঠিক তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না,' বলল ফিরোজ, 'তবে একসময় ওর প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু কিছুদিন পর কি জানি কি হলো–ওর প্রতি আকর্ষণ গেল উবে।'

'আসলে এটাই লিজার জীবনের বড় একটা ট্র্যাজেডি-কৌশল খাটিয়ে মানুষের মনে অধিকার জন্মাতে পারে, কিন্তু ভালবাসা দিয়ে চিরদিনের জন্য কারো মন জয় করতে পারে না। আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তা হলে বলব, আপনি যখন থেকে রিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হলেন, তখন থেকেই ও রিয়াকে হিংসা করতে আরম্ভ করেছে।'

'অথচ একসময় আমরা একে অপরের কতই না ঘনিষ্ঠ ছিলাম! আর অপারেশনের সময় ও যখন উইল করল তাতে বাড়িটা ছাড়া আর সব সম্পত্তিই আমার নামে লিখে দিয়েছিল,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রিয়া।

'পরবর্তী সময়ে এটাকেই আপনার বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর অপচেষ্টা করেছিল ও। উইলের বিষয়বস্তু অনেকেই জানত। সেদিক থেকে বিচার করলে সবাই আপনাকে সন্দেহ করবে। ব্যাপারটা ও নিজেও বুঝেছিল। আর তাই আপনাকেই চকোলেট পাঠাতে বলেছিল, যাতে সাধারণ লোকের ধারণা হয়, আপনিই চকোলেটে কোকেন মিশিয়ে ওকে খুন করার চেষ্টা করছেন।

'এদিকে উইল নিয়ে আরও একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। লিজা ওর উইলটা ডি কস্টাদের দিয়েছিল অ্যালবার্টের ঠিকানায় পোস্ট করার জন্য। ওরা তা না করে মূল উইলটাকে নষ্ট করে ফেলে একটা জাল উইল তৈরি করল এবং সেটা নিজেদের কাছে রেখে দিল। তাতে লিজার সম্পত্তির স্বত্বাধিকারিণী হিসেবে মিসেস ডি কস্টার নাম উল্লেখ আছে।'

'তা হলে উইলটা কি আগাগোড়াই জাল?' জিজ্ঞেস করল ফিরোজ।

'অবশ্যই! ডি কস্টারা এর আগেও জালিয়াতির মাধ্যমে অসংখ্য লোককে ঠকিয়েছে। হাতের লেখা নকলে ওরা এতই দক্ষ যে লিজা, বুয়া ও মালীর স্বাক্ষর পর্যন্ত হুবহু নকল। এদিকে লিজার অপারেশন নিরাপদেই সম্পন্ন হলো, আর ওদের পরিকল্পনা সাময়িকভাবে ভেস্তে গেল। কিন্তু ওরা

আবার আশার আলো দেখতে পেল যখন লিজা তার উপর হামলার কাল্পনিক কাহিনিগুলো লোকজনের কাছে বলতে শুরু করল। আমরা লিজার মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা উইলটা পোস্ট করে দিল অ্যালবার্টের ঠিকানায়। এখানে আরেকটা কথা, ডি কস্টারা কিন্তু লিজাকে অনেক বেশি ধনী ঠাওরাতো আসলে যতটা সে নয়। খুব সম্ভবত বাড়ি বন্ধকের ব্যাপারটাও জানত না ওরা।'

'যে কথাটা আপনাকে অনেকক্ষণ থেকেই জিজ্ঞেস করব করব ভাবছি,' বলল ফিরোজ, 'তা হলো,আপনি ঠিক কখন থেকে লিজাকে সন্দেহ করতে শুরু করলেন?'

'ওহ্, সেকথা আর বলবেন না' এই লিজা আমাকে কি রকম ঘোল খাইয়েছে, ভাবতেও অবাক লাগে। ওকে সন্দেহ করা দূরে থাকুক, ওর প্রতিটি কথাই আমি অন্ধের মত বিশ্বাস করে গেছি। অবশ্য মাঝেমধ্যে একটা ব্যাপার মনের ভেতর খচ্‌খচ্ করত পুরো ঘটনাপ্রবাহে লিজার বক্তব্য আর ওর বন্ধু-বান্ধব কিংবা পরিচিতদের বক্তব্যের মাঝে বিস্তর ফারাক। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার। অন্যদের কথায় গুরুত্ব না দিয়ে আমি কেবল লিজার কথাকেই বিশ্বাস করে গেছি। কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপারে খটকা লাগল–সে কথায় পরে আসছি। যখন ওর ওপর কাল্পনিক হামলার গল্পগুলো বিশ্বাস করলাম, আমি তখন ওকে বললাম কোন নিকট আত্মীয়কে কাছে এনে রাখতে। ও এলিকে টেলিফোন করে এখানে আসতে বলল। এলি লিজার এখানে এল মঙ্গলবার বিকেলে। এদিকে এলির বাবা-মা মৃতদেহ নিয়ে চট্টগ্রাম পৌঁছে একটা চিঠি পান। চিঠিটা এলি এখানে এসেই লিখেছিল। এলির মা ঐ চিঠিটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উনি অবশ্য বিনয়ের সাথে ওঁর চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন, ঐ চিঠিতে হয়তো এমন কিছু নেই যা তদন্তের কাজে লাগতে পারে। সত্যিই তাই। কিন্তু দ্বিতীয়বার সেটা পড়তে গিয়ে এক জায়গায় এসে খটকা লাগল। এলি লিখেছে, '...ভেবে পাচিছ না, আমাকে টেলিফোন করার এমন কি দরকার পড়ল, বুধবারের ব্যাপারে আগে থেকেই তো সবকিছু ঠিকঠাক ছিল..." এখানে এই "বুধবার" কথাটার অর্থ কি? অর্থ একটাই–এলির এখানে আসার ব্যাপারে আগে থেকেই কথাবার্তা ঠিকঠাক ছিল। তা হলে দাঁড়াচ্ছে এই, যে কোন কারণেই হোক, কথাটা লিজা আমার কাছে বেমালুম চেপে গেছে, কিংবা সত্য গোপন করেছে।

'তখন থেকেই আমি পুরো ঘটনাটাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে লাগলাম। লিজার সমস্ত বক্তব্য সরাসরি বিশ্বাস না করে মনে মনে বললাম, যদি ওর একটা কথাও সত্যি না হয়? তারপর এপর্যন্ত যা ঘটেছে তার খুব সহজ বিশ্লেষণ করলাম। নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, এ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই কি ঘটেছে?

উত্তরঃ এলি খুন হয়েছে। এলিকে খুন করে কার লাভ?–কথাটা মাথায় আসতেই বিদ্যুৎচমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল। আজ দুপুরের দিকে কথায় কথায় হাবিব এলিজাবেথ নামটার কতগুলো সংক্ষেপে হয় সেকথা বলছিল। হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা, এলির আসল নাম কি? সেও তো গোমেজ পরিবারের মেয়ে। যদি ওর নামও এলিজাবেথ গোমেজ হয়ে থাকে, তা হলে? এলি তো এলিজাবেথেরই আরেকটা সংক্ষিপ্ত রূপ। দুই এলিজাবেথ গোমেজ...। দেরি না করে চট্টগ্রাম এলির মাকে টেলিফোন করলাম। আমার অনুমানই ঠিক। এলির আসল নামও এলিজাবেথ গোমেজ। তারপর আরেকটা কথা মনে হলো। লিজার চেষ্ট অভ ড্রয়ারে রবার্টের লেখা চিঠিগুলোর কথা। না, কিছুই অসম্ভব নয়। চিঠিগুলোর একটাতে চট্টগ্রামের উল্লেখ আছে। আর আমরা এ-ও জানি, লিজা আর রবার্ট যখন চট্টগ্রামে বেড়াতে যায় তখন রবার্টের সঙ্গে পরিচয় হয় এলির। এ ছাড়া চিঠিগুলোর ব্যাপারে আরেকটা খটকা লাগল। বাণ্ডিলটাতে মাত্র এই ক'টা চিঠি কেন? কোন মেয়ে তার সমস্ত প্রেমপত্র এক জায়গায় রাখবে–এটাই স্বাভাবিক। চিঠিগুলোর বিশেষত্ব কি এটা ভাবতে গিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করলাম। চিঠিগুলোতে কোন নামের উল্লেখ নেই–আছে আদুরে সম্বোধন। আরও একটা ব্যাপার যা তক্ষুণি বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু বুঝেছি অনেক পরে।'

'কি সেটা?' জিজ্ঞেস করল হোবার্ট।

'লিজার অপারেশন হয়েছিল ফেব্রুয়ারীর শেষদিকে। আর রবার্টের লেখা একটা চিঠির তারিখ ২ মার্চ। কিন্তু ঐ চিঠিতে অপারেশন সংক্রান্ত দুশ্চিন্তার কোন চিহ্নই নেই। এ থেকে একটা ব্যাপারই পরিষ্কার হয়–চিঠিগুলো অন্য কাউকে লেখা। এখানে আরও দু'টো ব্যাপার উল্লেখ করা দরকার। রবার্ট যে তার সম্পত্তি এলিকেই উইল করে দিয়েছে সেকথা লিজা বুঝেছিল এই চিঠিগুলো পড়ে। আর উইলে এলির বাবার নাম উল্লেখ ছিল না। ছিল দাদার নাম। এটাও এই চিঠিগুলো পড়ে জেনেছিল ও। আরও একটা কথা। ওকে উইলটা কোথায় রাখা আছে জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল–সম্ভবত বাড়ির চেষ্ট অভ ড্রয়ারে। কিন্তু আসলে তো উইলটা ডি কস্টাদের দিয়েছেল অ্যালবার্টের ঠিকানায় পোস্ট করার জন্য। অবশ্য পরে ও নিজে থেকেই কথাটা স্বীকার করেছিল। কিন্তু প্রথমবার ও চেষ্ট অভ ড্রয়ারের কথা বলল কেন? এখানেও উত্তর একটাই। আমরা যাতে চিঠিগুলো দেখতে পেয়ে ওর সঙ্গে রবার্টের বাগদানের ব্যাপারে নিশ্চিত হই। ও ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি, এই চিঠিগুলোই শেষ পর্যন্ত আমাদের রহস্য উদঘাটনে সাহায্য করবে।

'এ ছাড়াও আরও দু'একটা ছোট ছোট ঘটনা-সেগুলোকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলাম। একটা উদারহরণ দিই। ঐ দিন রাতে লিজা কালো কাপড় পরেছিল কেন? উত্তর খুব সহজ। ওকে আর এলিকে

যাতে অন্ধকারে একই রকম দেখায়–শুধু এটা প্রমাণের জন্য যে আততায়ী অন্ধকারে এলিকেই লিজা ভেবে ভুল করেছে। অথচ এর আগে মনে হয়েছিল, রবার্টের শোকেই বুঝি বা কালো কাপড় পরেছে ও। কারো মৃত্যু-সংবাদ সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে কেউ শোক প্রকাশের জন্য কালো কাপড় পরে না।

'এরপর আমি এই নাটকের অবতারণা করলাম। লিজা গুপ্ত কুঠুরির ব্যাপারটা জোর গলায় অস্বীকার করত। এর কারণ কি? অন্যদিকে বুয়া বলছে, এরকম একটা কুঠুরি আছে। কিন্তু সেটা ঠিক কোথায় এখন আর সেকথা তার মনে নেই। তা ছাড়া বুয়ার মিথ্যে কথা বলা প্রয়োজনই বা কি! তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে; বিশেষ কোন কারণে হয়তো লিজাই মিথ্যে কথা বলছে। সম্ভবত ঐ কুঠুরিতে পিস্তলটা লুকানো আছে। পিস্তলটা লুকিয়ে রাখার কারণ হচ্ছে পরবর্তী কোন সময় ওটার সাহায্য বিশেষ কারো উপর আমাদের সন্দেহ জাগিয়ে তোলা। ওকে আকার-ইঙ্গিতে বোঝালাম, পুরো ঘটনায় আমি রিয়াকেই জোর সন্দেহ করছি। আর তাই রিয়াকে ফাঁসানোর জন্য মনে মনে মতলব আঁটল ও। এ ছাড়া ওখান থেকে পিস্তলটা সরানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বলা তো যায় না, বুয়া কখন আবার কুঠুরিটা আবিষ্কার করে ফেলে!

'আমরা যখন ডাইনিং হলে সবাই জমায়েত, তখনি কাজটা সেরে ফেলল ও। ভেবেছিল, কেউ দেখতে পাবে না–কিন্তু জাফরকে আগে থেকেই নির্দেশ দেয়া ছিল, তাই শেষরক্ষা আর হলো না।'

'ঘড়িটা একরকম জোর করেই নিয়ে গেল ও,' স্বগতোক্তির মত শোনাল রিয়ার কথাগুলো।

'হ্যাঁ, জানি।' গম্ভীর কণ্ঠস্বর আসাদের।

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপচাপ–। হঠাৎ অ্যালবার্ট বলল, 'ভাবছি, লিজার আত্মপক্ষ সমর্থনের কি ব্যবস্থা করা যায়!'

'আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে, তা হলে তার আর দরকার হবে না,' বলল আসাদ। তারপর কঠোর দৃষ্টিতে চাইল হোবার্টের দিকে, 'ব্যবসাটা ভালই ফেঁদেছেন, তাই না? ঘড়ির ভেতরে করে জিনিসটা এনে ভাল খদ্দের জুটিয়েছেন আপনি!'

'আমি...আমি...।' কিছু একটা বলতে গিয়েও বাক্‌শক্তি যেন লোপ পেল ওর।

'আমার চোখে ধুলো দেয়ার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, হোবার্ট। আপনার ভালমানুষী চেহারা হাবিবকে মুগ্ধ করলেও এ ব্যাপারে আপনাকে আমি প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলাম। বিষয়টা যদি পুলিশের গোচরে

আনতে না চান, তা হলে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যান।'

আসাদের কথায় রাগে ফর্সা চেহারা লাল হয়ে উঠল হোবার্টের তবু কোন কথা না বাড়িয়ে ধীর পায়ে রুম ছেড়ে চলে গেল ও। ওর গমন পথের দিকে চেয়ে রইলাম–সত্যিই, চিনতে বোধহয় ভুলই করেছিলাম ওকে।

'তা হলে এভাবেই কোকেনের চোরাচালান হচ্ছিল এখানে?'

'হ্যাঁ, আর এসবের হোতা তোমার সেই ভালমানুষ ক্যাপ্টেন হোবার্ট। লিজা চকোলেটের সঙ্গে যে কোকেন মিশেয়েছিল সেটা ওরই সরবরাহ করা। ঐদিন চকোলেটে কোকেন মিশিয়েছিল সামান্যই। কিন্তু আজ অনেকটা কোকেনের দরকার হবে লিজার।'

'মানে? তুমি কি বলতে চাও...?'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। ফাঁসির রজ্জুর চেয়ে এই-ই ভাল। এই, আস্তে,' হেসে বলল আসাদ, 'আমাদের মাঝে অ্যালবার্ট আছেন। তাঁর মত একজন ন্যায়পরায়ণ লোকের সামনে এসব কথা বলা সাজে না। আসলে কি, জানেন, আমি এই কোকেনের ব্যাপারে সত্যি সত্যিই কিছু জানি না–এর সমস্তই আমার অনুমান মাত্র!'

'আপনার অনুমান কিন্তু সব সময়ই সঠিক হয়,' বলল অ্যালবার্ট। 'না, রাত অনেক হয়েছে। আর দেরি করা যায় না। আমাকে এবার উঠতে হবে,' সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল সে।

আসাদ এবার ফিরোজের দিকে চেয়ে বলল, 'শুভ কাজটি খুব তাড়াতাড়িই সেরে ফেলবেন বলে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, এ ব্যাপারে খুব বেশি দেরি করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তার আগে ব্যবসাটা আর একটু গুছিয়ে নিতে হবে।'

'একটা কথা আপনাকে না বলে শান্তি পাচ্ছি না, আসাদ সাহেব,' বলল রিয়া, 'আপনি হয়তো প্রথম থেকেই আমাকে নেশাখোর ঠাওরে আসছেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এক সময় স্বামীর প্ররোচনায় কিছুটা বিপথে পা বাড়ালেও এখন আর আসক্ত নই আমি। ডোজ কমিয়ে আনতে আনতে এখন একেবারে ছেড়ে দেয়ার শেষ পর্যায়ে আছি।'

'সে-ই ভাল। এ এক সর্বনাশা নেশা। একবার ধরলে সহজে কেউ ছাড়তে পারে না। আপনার প্রচণ্ড মনোবল এই অসাধ্য সাধনে সাহায্য করেছে। যাক, ভবিষ্যতের ব্যাপারে কি ভাবছেন?'

'এক সুন্দর অনাগত ভবিষ্যৎ হাতছানি দিয়ে ডাকছে আমায়,' আবেগপ্রবণ হয়ে উঠল রিয়া, 'সেই ভবিষ্যতের ডাককে অবহেলা কিংবা উপেক্ষা করতে চাই না আমি। কয়েকটা বছর তো কম যন্ত্রণা সহ্য করলাম না! এবার নিশ্চয়ই পরম করুণাময় আমার দিকে মুখ তুলে চাইবেন।'

'আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি, যাতে আপনারা সুখী হতে পারেন।'

'ইদানীং ব্যবসা বেশি ভাল যাচ্ছে না আমার,' বলল ফিরোজ, 'জানি না, এই গরীবী হালে ওকে কতটুকু সুখী করতে পারব। তবু, মনে হয় আমার এই অবস্থাটা হয়তো মেনে নেবে ও। কি, রিয়া, কিছু একটা বলো!'

মাথা নেড়ে ফিরোজের দিকে চেয়ে মুচকি হাসল রিয়া। ঘড়ি দেখল আসাদ। কথায় কথায় অনেক রাত হয়েছে। যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম সবাই। হঠাৎ লিজার দাদার অয়েল পেইন্টিংটার দিকে নজর গেল আসাদের। বেরুতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল ও। ফিরোজের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল অয়েল পেইন্টিংটার সামনে। 'শুধু একটা কথা জানতে বাকি আছে, আর সেটা আমি আপনার কাছ থেকেই জানতে চাই।'

'বেশ বলুন!'

'আচ্ছা, এই ছবিটা আপনি কেন পাঁচ হাজার টাকায় কিনতে চেয়েছিলেন? অথচ বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জানা গেছে ছবিটার দাম কোমতেই দু-হাজার টাকার বেশি হবে না।'

কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল ফিরোজ, 'মি. রহমান, আমি কিন্তু একজন জাত ব্যবসায়ী।'

'ঠিক। কিন্তু তা হলে...?'

'আপনি যেমন জেনেছেন, আমিও ঠিক তেমনিই ভাল করেই জানি, অয়েল পেইন্টিংটার দাম কোনমতেই দু-হাজারের বেশি হবে না। লিজার বরাবরের ধারণা, কোন কিছু বেচাকেনার সময় লোকজন ওকে ঠকাতে চায়। তাই সে-ও ওটার দাম নিশ্চয়ই যাচাই করে থাকবে। আর যখন জানবে যে আসল দামের অনেক বেশি দিয়ে ছবিটা আমি কিনতে চাইছি, তখন দ্বিতীয়বার এরকম আর একটা ছবি বিক্রির সময় ও আর দাম যাচাই করতে যাবে না।'

'বেশ। কিন্তু...।'

'ঐ যে দেখুন,' দূরে টাঙানো একটা অয়েল পেইন্টিংয়ের দিকে তর্জনী তুলল ফিরোজ, 'ঐ অয়েল পেইন্টিংটার দাম কম করে হলেও বিশ হাজার টাকা।'

'হ্যাঁ, এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো।'

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলের পথে পা বাড়ালাম আমরা।

মূল কাহিনি: *আগাথা ক্রিস্টির 'পেরিল অ্যাট এণ্ড হাউস'*

রূপান্তর: **কাজী সারওয়ার হোসেন**

রাত্রি অন্ধকার

অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন

এক

সোমবার, মধ্যরাত

শব্দটা জ্যাকস্ট্রই প্রথমে শুনতে পেল।

'এরোপ্লেন', ঘোষণার সুরে বলল সে।

'এরোপ্লেন?' অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করলাম আমি। 'আবার নিশ্চয় মদ খেয়েছ?'

'একদমই না, ড. ম্যাসন,' হাসল জ্যাকস্ট্র। আমরা দুজনেই জানি কড়া কফি ছাড়া আর কিছু পান করে না সে।

'আসুন। কান পেতে শুনুন।'

কিন্তু এ মুহূর্তে এ কাজটি করতে মোটেই আগ্রহবোধ করছিলাম না আমি। স্লিপিং ব্যাগে ঢুকেছি মাত্র মিনিট পনেরো আগে, শরীরটা সবে গরম হতে শুরু করেছে। শীতে জমাটবাঁধা আমার পদযুগল মাত্রই জীবন ফিরে পেতে শুরু করেছে, আর এ সময়ে এমন আরাম ছেড়ে হিমাঙ্কেরও অনেক নিচের তাপমাত্রায় কেবিন থেকে বাইরে যাওয়ার কথা ভাবতেই বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে গেল।

'প্লেনের শব্দ এখনো পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'হ্যাঁ। ক্রমে বাড়ছে আওয়াজ আর বাইরে আসছে।' আমি শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম কী ধরনের প্লেন ওটি।

'ড. ম্যাসন!' ওর কণ্ঠে জরুরি ভাব ফুটল। 'মনে হচ্ছে বিপদে পড়েছে প্লেনটি! নিচু দিয়ে উড়ে আসছে। মস্ত কোনো বিমান– অনেকগুলো ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

'ধ্যাত্তেরি!' বেজায় বিরক্ত হলাম আমি।

স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এলাম, দ্রুত গায়ে চাপিয়ে নিলাম অনেকগুলো গরম পোশাক। মাত্র আধঘণ্টা আগে কাপড়গুলো খুলেছি,

ইতিমধ্যে জমে প্রায় বরফ হওয়ার দাখিল। আমাদের রেডিওম্যান জসের কাছে গেলাম।

'ওঠো, জস। তোমাকে আমাদের দরকার।'

তিনজনে মিলে পশমি কাপড়গুলো পরতে শুরু করলাম– ট্রাউজার্স, জ্যাকেট, হ্যাট, বুট এবং গ্লাভস– বাইরের হিমঠাণ্ডার কামড় থেকে বাঁচতে মুখে আটকে নিলাম বরফ মুখোশ। তারপর সিলিংয়ের ট্রাপডোরের দিকে এগোলাম। কেবিন থেকে বেরুবার এটাই একমাত্র রাস্তা। দরজা আটকে রেখেছে বরফ। রীতিমতো শক্তি প্রয়োগ করতে হল দরজা খুলতে।

আজ রাতে বরফের গায়ে ফাটল ধরছে দ্রুত তাই আমরা কেবিন থেকে বেরুতে মোটেই দেরি করলাম না। বাইরে আসতেই ফুসফুসে কামড় বসাল ভয়াবহ ঠাণ্ডা। যা ভেবেছি তার চেয়ে অনেক বেশি জোরে বইছে বাতাস। হাওয়ার শব্দ শুনলে মনে হয় যেন ব্যথায় কাতরাচ্ছে কোনো মানবসন্তান, হাউমাউ গর্জন ছাড়ছে তবে বাতাসের হুঙ্কার ছাপিয়েও আমাদের কানে ভেসে এল প্লেনের ইঞ্জিনের আওয়াজ।

তারপর ওটাকে দেখতে পেলাম আমরা। দুই কিলোমিটার দূরেও নেই। আইস-ক্যাপ থেকে বড়জোর আড়াইশ মিটার উঁচু দিয়ে উড়ছে। মাত্র ৫ সেকেন্ড দেখতে পেলাম বিমানটি কিন্তু তাতেই তাজ্জব বনে গেলাম। আমি ছোটখাটো একটি বিমান দেখতে পাব ভেবেছিলাম। কিন্তু এ যে দেখছি প্রকাণ্ড যাত্রীবাহী এয়ারলাইনার। প্লেনটি জমিনে আছড়ে পড়তে যাচ্ছে, কল্পনায় ভয়ঙ্কর এ দৃশ্য দেখে শিউরে উঠলাম। মাইনাস ষাট ডিগ্রি টেম্পারেচারে বিমানের যাত্রীরা তো শীতেই জমে মারা যাবে।

পূর্ণ একটি বৃত্ত নিয়ে পাক খেল বিমান, এখন কমিয়ে আনছে গতি। কিন্তু গতি বিপজ্জনকরকম মন্থর মনে হল আমার কাছে। তারপর দেখতে পেলাম ওটির ল্যান্ডিং লাইট জ্বলছে।

'ওটা ল্যান্ড করতে যাচ্ছে!' জ্যাকস্ট্রকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'অবতরণ করার জন্য জায়গা খুঁজছে। কুকুরগুলোকে নিয়ে এস। স্লেজের সঙ্গে ওগুলোকে বেঁধে ফেল জলদি!'

আমি এক ছুটে ফিরে এলাম কেবিনে। জরুরি অবস্থায় কী কী জিনিস প্রয়োজন হতে পারে তার একটি হিসাব করছি।

'গরম জামাকাপড় যা পাও সব নিয়ে নাও, জস,' চেঁচালাম আমি। 'সে সঙ্গে স্লিপিং ব্যাগ, ব্ল্যাংকেট যা পাও নিয়ে এসো। আগুন নেভাবার যন্ত্র নিতে ভুলো না যেন আর স্নোস্টিক এবং অবশ্যই হোমিং স্পুল (এক ধরনের

রশি বা তার যা গোলাকার একটি জিনিসের সঙ্গে পেঁচানো থাকে, এ জিনিস ব্যবহার করা হয় 'বাড়ি' বা যেখান থেকে যাত্রা শুরু করা হয়েছিল সেখানে ফিরে আসার জন্য– অনুবাদক) নেবে। ওটি ছাড়া আমরা কেবিনে ফিরে আসার পথ চিনতে পারব না।"

বাল্টোর সাহায্যে কুকুরগুলোকে স্লেজের সঙ্গে বাঁধার তোড়জোড় করছিল। বাল্টো হল কুকুরদের সর্দার। কুকুরগুলো খুব মেজাজ খারাপ করে ঘেউ ঘেউ করলেও বাল্টোর দাবড়ানিতে সবগুলো শান্ত হয়ে গেল। বাল্টো তাদেরকে গর্জন ছেড়ে, কামড়ে লাইনে নিয়ে এল।

আমি দ্রুত চলে এলাম স্নো-ট্রাক্টরে। সার্চলাইটের গায়ে বরফ জমে গিয়েছিল। সার্চলাইট ছাড়া অন্ধকারে স্নো-ট্রাক্টর চালানো সম্ভব নয়। বহু কষ্টে সার্চলাইটের গা থেকে বরফ সরালাম। এমন সময় আবারো শুনতে পেলাম প্লেনের ইঞ্জিনের আওয়াজ। এবারে খুব নিচু হয়ে শব্দ হয়েছে এবং খুব কাছ থেকে শোনা গেছে। একটু পরে প্লেনটিকে দেখা গেল, আমাদের কাছ থেকে দুশ মিটার দূরে উড়ছে প্রকাণ্ড এবং ভয়ানক একটি পাখির মতো।

'ওটা উত্তরে, আমাদের দিকে আসছে', বললাম আমি।

'ঈশ্বর, ওটা তো আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে,' চেঁচিয়ে উঠল জস। ছোট ওই বরফ পাহাড়গুলোর গায়ে সোজা আছড়ে পড়বে।'

আমরা এগুতে শুরু করলাম। আমাদের গতি ধীর এবং যন্ত্রণাদায়ক। কারণ তীব্র শীতল বাতাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এগুতে হচ্ছে। রেডিও অ্যান্টেনার সারিতে চোখ রেখে এগোচ্ছি। উত্তরে আশি মিটার রাস্তা পর্যন্ত অ্যান্টেনাগুলোর বিস্তৃতি। চার মিটার উঁচু পোল বা খাম্বার গায়ে লাগানো অ্যান্টেনা। পোলগুলো একটু পর পর মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে।

অকস্মাৎ ইঞ্জিনের গর্জন আমাদের কান ফাটিয়ে দেওয়ার জোগাড় করল। আমি ঝাঁপ দিলাম মাটিতে, দেখলাম ঠিক আমাদের ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটি। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন, ভেসে এল হিসহিস শব্দ, সে সঙ্গে বয়ে নিয়ে এল বিকট একটি আওয়াজ, আর গোটা ধরিত্রী যেন কেঁপে উঠল থরথর করে, সবশেষে ধাতব ছেঁড়ার বিশ্রী এবং বিদঘুটে শব্দ। এরপর কেবলই নীরবতা।

দ্রুত কাজে নেমে পড়লাম আমরা। জসের দিকে ফিরে বললাম, 'হোমিংস্পুল কতটুকু লম্বা?'

'চারশ মিটার।'

'আমরা পুবে চারশ মিটার যাব তারপর মোড় নেব উত্তরে।'

সঙ্গে সঙ্গে শুরু করলাম যাত্রা। অ্যান্টেনার একটি খাম্বার সঙ্গে স্পুলের একটি প্রান্ত বেঁধে নিয়েছি। আমাদের বাঁচামরা এখন নির্ভর করছে হোমিংস্পুলের ওপর। এটি ছাড়া আমরা অ্যান্টেনা খুঁজে পাব না আর কেবিনেও ফিরতে পারব না। আঁধার এবং চোখ অন্ধ করে দেওয়া তীব্র বাতাসে এটিই আমাদের একমাত্র গাইড। আমরা লৌহ কঠিন বরফে পা ফেলে চলেছি। এ বরফে কখনো পদচিহ্ন ফুটে থাকে না যে পায়ের ছাপ দেখে ফিরতে পারব বাড়ি।

এখন আমরা ছুটতে শুরু করেছি। ছুটতে ছুটতে কত কথাই না ভাবছিলাম আমি। প্লেনের ভেতরে যাত্রীরা কি আটকে পড়েছে নাকি ছিটকে গেছে আইস-ক্যাপে? যদি তাই হয়, শীতে জমে পাঁচ মিনিটের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে তারা। আমরা যদি ওদেরকে কেবিনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি তাহলে এতগুলো লোককে রাখব কোথায়, খেতেই বা দেব কী?

লাইনের শেষ মাথায় এসে উত্তরে বাঁক নিলাম আমরা। এখন জমাটবাঁধা মাটিতে হাঁটার জন্য স্নো-স্টিক ব্যবহার করছি। হঠাৎ ওটাকে চোখে পড়ল আমাদের– প্রকাণ্ড একটি গর্ত। গর্তের মধ্যে নাক থুবড়ে পড়ে আছে প্লেনটি। আইস ক্যাপের উপরিভাগে তৈরি হয়েছে গর্তটি। ভাগ্যক্রমে আমরা প্লেনটি যেখানে ক্র্যাশ ল্যান্ড করেছে, সেখানে চলে এসেছি।

ঠাণ্ডা বাতাসের কামড় সহ্য করে প্লেনটির সামনে চলে এলাম সবাই। বিশাল আকৃতির বিমান। বিশাল এবং অসহায়। আমি প্লেনটির দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম এই বিরাট আহত পাখিটি আর কোনোদিনই উড়তে পারবে না।

দুই

সোমবার, রাত ১টা-২টা

আগুনের কোনো চিহ্ন নেই দেখে স্বস্তির মস্ত একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। ক্ষুদ্রতম অগ্নিশিখাও গোটা বিমান ধ্বংস করে ফেলত যদি পেট্রোলে ধরে যেত আগুন। সার্চলাইটের সুইচ অন করতেই দেখলাম প্লেনের লেজ এবং মূল শরীরের কোনো ক্ষতি হয়নি, তবে একটা ডানা এবং নাকটা ভেঙে তুবড়ে গেছে। প্লেনের একপাশে লেখা BRITISH AIRWAYS কথাটি আমার নজর কাড়ল। হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইলাম লেখাটির দিকে। পোলার আইস ক্যাপের মাঝখানে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের যাত্রীবাহী বিমান কী করছে? আমি খুব ভালো করে জানি ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের কোনো প্লেনই পৃথিবীর এই পাণ্ডববর্জিত এলাকায় কখনো আসে না। তাহলে সাধারণ রুট ছেড়ে এ বিমানটি কেন এতদূরে উড়ে এল?

পিচ্ছিল বরফের ওপর সাবধানে পা ফেলে প্লেনের সামনের দিকে চলে এলাম আমরা। ছোট একটি বরফ পাহাড় চোখে পড়ল। নির্ঘাত ওটার সঙ্গে সংঘর্ষে মাটিতে আছড়ে পড়েছিল বিমানটি। পুরো ধকলটা গেছে বিমানের নাকের ওপর দিয়ে। ফলে কন্ট্রোল কেবিন এবং উইন্ডস্ক্রিন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। পাইলটদের দশা কী হয়েছে ভাবতেই গাটা কেমন শিরশির করে উঠল আমার। তাদের দিকে হয়ত তাকাতেই পারব না।

কেবিনের ওপর সার্চলাইটের আলো ফেলে আমি উইন্ডস্ক্রিনের নিচের অংশে লাফ মেরে ওঠার চেষ্টা করলাম কিন্তু হাত দিয়ে ধরে রাখার মতো কোনো অবলম্বন খুঁজে পেলাম না। আমাকে ঝামেলায় পড়তে দেখে ছুটে এল জ্যাকস্ট্র, নিচ থেকে বাড়িয়ে দিল সাহায্যের হাত। আমি ওর কাঁধে পা রেখে খাড়া হলাম, বাড়ি মেরে ভেঙে ফেললাম উইন্ডস্ক্রিনের ভাঙা বাকি

কাচ। দুই মিনিটের মধ্যে মানুষ যাতায়াতের মতো বড় গর্ত তৈরি হয়ে গেল ওখানটায়।

আমি লাফ মেরে ঢুকে পড়লাম কেবিনে, পা পড়ল এক মরা মানুষের গায়ে– দ্বিতীয় পাইলট। কোনো মানুষের এমন ক্ষতবিক্ষত চেহারা জীবনে দেখিনি আমি। উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে মাথা বের করে জ্যাকস্ট্রর উদ্দেশে হাঁক ছাড়লাম, 'একটা কম্বল নিয়ে এসো। আর মেডিসিনের ব্যাগটা।'

প্লেনে লাফ মেরে ঢুকতে কারো সাহায্যের প্রয়োজন হল না জ্যাকস্ট্রর। ওর গায়ে যেমন জোর, বুকেও তেমন সাহস। সে উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে ঢুকে এক লাফে আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

মরা মানুষটিকে ঢেকে দিলাম কম্বল দিয়ে তারপর নজর দিলাম চিফ পাইলটের দিকে। তিনি নিজের আসনে বসে আছেন। তার শরীরে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই তবে গা ভীষণ ঠাণ্ডা– জীবিত মানুষের শরীর এত শীতল হয় না, এমনকি এই পোলার আইস ক্যাপেও নয়। এ মানুষটির জন্য আমার কিছুই করার নেই।

চিফ পাইলটের অদূরেই দেখতে পেলাম রেডিও অপারেটরকে অজ্ঞান, তবে এখনো নিঃশ্বাস নিচ্ছে, ভীষণ রক্তক্ষরণ হচ্ছে শরীর থেকে আমি খুব আস্তে তার মাথার পেছনে হাত রাখলাম, আতঙ্কিত হয়ে আবিষ্কার করলাম এ লোকটি যদি প্রাণে বেঁচেও যায় বাকি জীবনটা তাকে কাটাতে হবে অন্ধ হয়ে। তার মস্তিষ্কের যে অংশটা পৃথিবীর রূপ দেখে সে অংশটি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি তাকে শক্তিশালী পেইনকিলার ইনজেকশন দিয়ে, কম্বলে মুড়ে দিলাম গা।

রেডিও কম্পার্টমেন্টের পেছনে আরেকটি লাশ দেখতে পেলাম আমি এ হল থার্ড অফিসার, তারপর স্বল্প পরিসরের কিচেনে পেয়ে গেলাম স্টুয়ার্ডেসকে। সে এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে ব্যথায় গোঙাচ্ছে। দেখে মনে হল না খুব বেশি আহত হয়েছে। আমরা তার গায়ে একটা কম্বল দিয়ে কদম বাড়ালাম সামনে।

প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টটি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ। জ্যাকস্ট্রকে বললাম, 'স্টুয়ার্ডেসকে এখানে নিয়ে এসো। এখানে থাকলে ও সারভাইভ করে যাবে।'

তারপর ফিরলাম দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকটির দিকে। তার কাটা কপাল থেকে রক্ত ঝরছে, আমার দিকে কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে

রইল। হয়ত বোকার মতো হয়ে যাচ্ছে প্রশ্নটা, বলল সে, 'তবু জানতে চাইছি কী ঘটেছে?'

'আপনাদের প্লেন ক্র্যাশ করেছে,' জবাব দিলাম আমি। 'একটু বসুন। ঠিক হয়ে যাবেন।'

অবাক হয়ে দেখলাম বিমানে যাত্রীসংখ্যা সাকূল্যে নয়জন। কম্পার্টমেন্টের সামনে, আসনের মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে দুই লোক। একজন বিশালদেহী, কুচকুচে কালো, কোঁকড়া চুল; অপরজন বেঁটেখাটো, বয়সী পরনের জ্যাকেটটা শরীরের তুলনায় অনেক বড়। ওদের বামে একটি লোক নিজের আসনে শিরদাঁড়া টানটান করে বসে আছে। তার চেহারায় উদ্বেগ ফুটে থাকলেও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন বলেও মনে হল। এ লোকটি অক্ষত আছে। পরনে ধর্মযাজকের পোশাক।

বিমানের ডান দিকে বসেছে দুমহিলা এবং দুজন পুরুষ। মহিলাদের একজন বয়সী তবে দেখতে বেশ সুন্দরী। তার চেহারাটা আমার চেনা চেনা লাগল। তার পাশে বসা যুবতীর পরনে অত্যন্ত দামি ফ্যাশনেবল ড্রেস এবং ফারকোট। দুই মহিলার অবয়বেই ফুটে আছে বিহ্বলভাব, যেন তারা দীর্ঘ ক্লান্তিকর এক ঘুম থেকে জেগে উঠেছেন।

ডানদিকের পুরুষ দুজনের অবস্থাও তথৈবচ। তাকিয়ে আছে বটে তবে নিষ্প্রাণ চাউনি, কেমন ঢুলুঢুলু চোখ। একজনের বয়স প্রায় পঞ্চান্ন, বেশ লম্বা-চওড়া, ঘন সাদা চুল, ঠোঁটের ওপর গোঁফ তার চেহারায় টিপিকাল আর্মি অফিসারের ভাব এনে দিয়েছে। তার পাশের মানুষটি রোগা পাতলা, বয়সী, দেখলেই বোঝা যায় এ ইহুদি। এদের কেউই প্লেন ক্র্যাশে আঘাত পাননি।

তো, স্বস্তি নিয়ে ভাবলাম আমি, মাত্র একজন যাত্রী আহত হয়েছে–তাও শুধু কপাল কেটে গেছে তার। প্লেনের পেছনের অংশে আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে দুই আসনের মাঝখানে, মেঝেতে শুয়ে আছে। আমি তার বাহুর নিচে হাত ঢুকিয়ে দিলাম তাকে সিধে হতে সাহায্য করব বলে, মেয়েটি ব্যথায় চিৎকার দিল। 'আস্তে!' গুঙিয়ে উঠল সে, 'আমার কাঁধ!'

আমি দ্রুত পরীক্ষা করে দেখলাম বাম দিকের কলার বোন ভেঙে গেছে। 'চিন্তা করো না', মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিলাম আমি। 'আমি যত শিগগিরই সম্ভব তোমার কাছে আবার ফিরে আসছি।

প্লেনের পেছনের শেষ দুই সারি আসনে আরেকটি লোককে দেখতে

পেলাম। তার মাথাটা এমন অস্বাভাবিকভাবে বেঁকে রয়েছে, দেখেই বুঝতে পারলাম মারা গেছে সে। আমি কম্পার্টমেন্ট ধরে হেঁটে ফিরে এলাম পাইলটের কেবিনে। গোটা পরিস্থিতিই খটকা জাগিয়েছে আমার মনে। যাত্রীদের কেউ সিটবেল্ট পরা নেই কেন? প্লেন যে ক্র্যাশ করবে কিংবা ল্যান্ড করবে তা অন্তত পনেরো মিনিট আগেই জানতেন পাইলট। তবে? দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল জ্যাকস্ট্র। 'স্টুয়ার্ডেস আসতে চাইল না।' বলল সে, 'সে রেডিও অপারেটরকে ছেড়ে নাকি কোথাও যাবে না।'

'মেয়েটা কি ঠিক আছে?'

'পিঠে বোধ হয় ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু স্বীকার করল না।'

সাদা চুল এবং মিলিটারি গোঁফের বৃহদায়তনের মানুষটা হঠাৎ এসে হাজির হলেন। রাগে কাঁপছেন। 'কী হয়েছে?' চেঁচালেন তিনি। 'আমরা কেন ল্যান্ড করেছি? বাইরে ওই শব্দটি কিসের? আর আপনারাই বা কে?' লোকটাকে দেখলেই মনে হয় এ ঝামেলা পাকাতে ওস্তাদ। কিন্তু ওই সময় আমি তার বিস্ময় এবং ক্রোধের কারণ বুঝতে পারছিলাম।

'আপনারা ক্র্যাশ-ল্যান্ড করেছেন,' শান্ত গলায় বললাম আমি। 'তবে কেন সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা আমার নেই। আর বাইরে যে শো শো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন ওটি তুষার-ঝড়ের শব্দ। আর আমরা এখান থেকে মাইলখানেক দূরের একটি সায়েন্টিফিক স্টেশনে কাজ করি। আমরা বৈজ্ঞানিক।'

আমি লোকটির পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলাম কিন্তু তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। 'এক মিনিট, কিছু মনে করবেন না,' অত্যন্ত সিরিয়াস গলায় বললেন, 'আমার ধারণা আমরা আরেকটু ব্যাখ্যা পাওয়ার অধিকার রাখি।'

'পরে,' কঠিন গলায় বললাম আমি, ঝাঁকি মেরে সরিয়ে দিলাম তার হাত। 'একজন মারাত্মক আহত মানুষ পড়ে আছেন ওখানে। ওর সেবা শুশ্রূষা প্রয়োজন। আগে ওকে আমরা নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাই তারপর আপনাদের ব্যবস্থা করছি।'

সাদা চুলের মানুষটি আপত্তি করে আবার কিছু বলতে যেতে চাইতেই আমি বাধা দিলাম, 'ভুলে যাবেন না, আমরা না থাকলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আপনারা সবাই জমে বরফ হয়ে যাবেন।'

কালো চুলের তরুণ যে ছেলেটি মেঝেতে শুয়েছিল তাকে পাশ কাটানোর সময় আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আমি কি কোনো সাহায্যে

আসতে পারি?'

আমি তার প্রস্তাবটি সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করলাম। দুজনে মিলে ফিরে এলাম রেডিও অপারেটরের কাছে। স্টুয়ার্ডেস তার পাশে উদ্বিগ্ন চেহারা নিয়ে বসে আছে। মেয়েটির মুখ পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করেছে, ভীষণ কাঁপছে।

'আ... আমার প্যাসেঞ্জারদেরকে দেখতে যাওয়া উচিত,' একটু ইতস্তত করে বলল সে।

'তাদের কথা একটু দেরিতে আপনার মনে পড়ল মনে হয়?' কাটাকাটা গলায় বললাম আমি।

'জানি আমি। এজন্য আমি দুঃখিত। আমি আসলে একে ছেড়ে কোথাও যেতে পারছিলাম না।' তার পায়ের কাছে শুয়ে থাকা তরুণের দিকে তাকাল সে। আবেগমথিত গলায় বলল, 'ও... ওকি মারা যাবে?'

'সম্ভবত', জবাব দিলাম আমি। মেয়েটি ঝট করে ঘুরিয়ে ফেলল মুখ যেন আমি তাকে আঘাত করেছি।

রেডিও অপারেটরকে সাবধানে স্ট্রেচারে তুলে তার শরীর বেঁধে ফেললাম। তারপর কালো চুলের ছেলেটি আর আমি মিলে স্ট্রেচারটি নামিয়ে দিলাম ভাঙা উইন্ডস্ক্রিনের ফাঁক দিয়ে। নিচে জ্যাকস্ট্র আর জস অপেক্ষা করছিল। ওরাও সাহায্য করল। তারপর স্টুয়ার্ডেসকে নামিয়ে দিলাম। নামার সময় একবার ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল সে। মনে পড়ল জ্যাকস্ট্র বলেছিল মেয়েটি পিঠে ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু ও নিয়ে এখন চিন্তা করার সময় নেই।

কৃষ্ণ কেশের তরুণটি প্লেনে উঠে বসল। কুকুরগুলো নির্মম ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে যদ্দূর সম্ভব দ্রুত গতিতে ছুটল। হু হু করে ধেয়ে আসছে বাতাস, পায়ের নিচে বরফ জমা মাটি, নদীর বরফের মতোই পিচ্ছিল। সর্দার কুকুর বাল্টো সবার আগে আগে ছুটছে। স্নো-স্টিক আর হোমিং স্পুলের চিহ্ন অনুসরণ করে দৌড়াচ্ছে সে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা ফিরে এলাম কেবিনে। আমরা তেলের বাতি আর কেরোসিনের চুলা জ্বালালাম। আহত মানুষটিকে যতটা সম্ভব আরাম দেওয়ার চেষ্টা করছি। স্টুয়ার্ডেসকে বললাম কফি বানাতে। তাকে আর কালো চুলের ছেলেটিকে কেবিনে রেখে আমরা বাকি তিনজন ফিরে এলাম প্লেনে। সঙ্গে নিয়েছি গরম কাপড়চোপড় আর কিছু ব্যান্ডেজ।

প্লেনের প্যাসেঞ্জার কেবিনের ভেতরে তাপমাত্রা কমপক্ষে ষোল ডিগ্রি

হ্রাস পেয়েছে, প্রায় সবাই হি হি করে কাঁপছে শীতে, কেউ কেউ হাত দিয়ে চাপড় মারছে গায়ে শরীর গরম রাখতে।

কাপড়ের বস্তাটি একটি সিটের ওপর রাখলাম। 'জামাকাপড়গুলো জলদি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিও। এখনি এ প্লেন থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তবে ওই মেয়েটিকে প্লেন থেকে নামাতে আপনাদের সাহায্য লাগবে আমার।' পেছনের আসনে বসা মেয়েটিকে ইঙ্গিত করে বললাম আমি।

'সাহায্য লাগবে?' দামি পোশাক পরা যুবতীটি বলে উঠল। 'কেন? ওর কী হয়েছে?'

'ওর কলারবোন ভেঙে গেছে,' বললাম আমি।

'ভেঙে গেছে? তাহলে তুমি আমাদেরকে কথাটা জানাওনি কেন?' উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন বয়সী নারীটি।

'ভুলে গিয়েছিলাম,' জবাব দিলাম আমি। 'এখন কে–?'

তিনি বললেন, 'আমি আছি। আমি তোমাকে সাহায্য করব।' বাকি যাত্রীদের নিয়ে প্লেন ত্যাগ করল জস। আমরা দুজন তরুণী মেয়েটির দিকে এগিয়ে দেখলাম।

'তুমি কী করতে যাচ্ছ সে কথা কি তুমি জানো, যুবক?' সন্দেহের সুরে আমাকে প্রশ্ন করলেন ভদ্রমহিলা।

'কমবেশি জানি। আমি একজন ডাক্তার।'

'ডাক্তার, অ্যাঁ?' আমার তেলঝোল মাখা পোশাক আর দাড়ি না কামানো মুখের দিকে তাকালেন তিনি, 'আর ইউ শিওর?'

'শিওর আয়াম শিওর,' বিরক্ত হলাম আমি। 'আমাকে কী করতে বলেন, আপনি? জ্যাকেটের পকেট থেকে মেডিকেল ডিগ্রি বের করে দেখাতে হবে?'

আমার বলার ভঙ্গিতে মজা পেলেন ভদ্রমহিলা। সস্নেহে আমার বাহুতে চাপড় দিলেন। আমি কাজ করছি, উনি নিচু গলায় মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। জানলাম মেয়েটির নাম হেলেন, বয়স সতেরো, জাতিতে জার্মান। মিউনিখে তার বাড়ি। বৃদ্ধা নারী কথা বলছেন, আমি মাঝে মাঝে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। বেশ চেনা চেনা লাগছিল চেহারা। কিন্তু কিছুতেই মনে করে উঠতে পারছিলাম না কোথায় যেন ওঁকে দেখেছি। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ে গেল। আরি. ইনি তো মেরি লিগার্ড,

বিখ্যাত অভিনেত্রী। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বজুড়ে তিনি তার ভক্তদের তার অসামান্য অভিনয় দিয়ে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন।

যখন বললাম আমি ওঁকে চিনতে পেরেছি, ভদ্রমহিলা যারপরনাই বিস্মিত হলেন। 'কিন্তু আমাকে চিনলে কী করে?'

'আপনার ছবি দেখে অবশ্যই। গত সপ্তাহে একটা পত্রিকায় আপনার ছবি দেখেছি।'

হেলেনের হাত এবং কাঁধে ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করেছি, মেরি আমার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন। 'তোমার ডাক্তারি হাত বেশ ভালোই বলতে হবে, ডাক্তার... আ...'

'ম্যাসন, পিটার ম্যাসন। বন্ধুরা আমাকে পিটার বলে ডাকে।'

জ্যাকস্ট্র এবং জস স্লেজ নিয়ে ফিরে এসেছে। পনের মিনিট বাদে আমরা কেবিনে ফিরলাম। দুই নারীকে ট্রাপডোরের বরফ পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে নামতে সাহায্য করলাম। কিন্তু নিচে নেমেই যে দৃশ্য দেখতে পেলাম তাতে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম। জসও ক্রোধ এবং আতঙ্ক নিয়ে ওদিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। আহত রেডিও অপারেটরকে যেখানে রেখে গিয়েছিলাম সেখানেই শুয়ে আছে সে। অন্যরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। বামে তাদের পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে আমাদের আরসিএ ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার– বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা কিংবা সাহায্য পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম। উল্টে রয়েছে জিনিসটা, ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

তিন

সোমবার রাত ২টা থেকে রাত ৩টা

পিনপতন নীরবতার মাঝে কেটে গেল আধমিনিট। অবশেষে যখন রা ফুটল আমার মুখে, ফিসফিসে শোনাল কণ্ঠ। 'কোন গর্দভের কাজ এটা?'

সাদাচুলো, সেনাবাহিনীর কর্মকর্তার মতো দেখতে লোকটি এক কদম বাড়ালেন। 'হাউ ডেয়ার ইউ স্যার!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'আমরা শিশু নই যে–'

'চোপ' শান্ত গলায় বললাম আমি। তিনি আমার চেহারা দেখে আর উচ্চবাচ্য করার সাহস পেলেন না। আমি সবার দিকে তাকালাম একে একে। 'তো?'

'আ... আমি কাজটি করেছি,' ধীর গলায় বলল স্টুয়ার্ডেস। 'সব আমার দোষ।'

'তুমি' বিস্মিত গলায় বললাম আমি। 'তোমার তো জানা উচিত এ জিনিসটি আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আপনাকে বিশ্বাস করতেই হবে,' বলল কপালকাটা লোকটি। 'উনিই সব সময় রেডিওর কাছে ছিলেন।'

লোকটি কথা বলছে, লক্ষ করলাম তার হাত থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। 'আপনার হাত কাটল কী করে?'

'রেডিওটাকে পতনের কবল থেকে রক্ষা করতে গিয়েছিলাম।' জানাল সে।

'ঠিক আছে। আমি ব্যান্ডেজ করে দেব।' স্টুয়ার্ডেসের দিকে ফিরলাম আমি, চোখে চোখ রেখে বললাম, 'কীভাবে ঘটনা ঘটল সে ব্যাখ্যা আমি তোমার কাছে চাইছি।'

আমি এখানে জিমির পাশে হাঁটু গেড়ে বসেছিলাম–

'কে?'

'জিমি ওয়াটারম্যান– রেডিও অপারেটর। তারপর আমি উঠে দাঁড়াই। সিধে হতে গিয়ে বাড়ি খাই টেবিলের সঙ্গে এবং রেডিওটি পড়ে যায়। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল সে।

'তাই নাকি?' আমার গলার স্বরে অবিশ্বাস। 'ওই ভারী জিনিস টেবিল থেকে এভাবে পড়ে গেল?'

জসের দিকে ফিরলাম আমি, 'এটা কি সম্ভব?'

'না,' সংক্ষেপে জবাব দিল সে তবে কেউ তার কথার প্রতিবাদ করল না।

আবার অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল কেবিনে। আমার ফারের কোট এবং হাতমোজা খুলে রেখে কাটা কপাল আর হাত থেকে রক্ত ঝরতে থাকা লোকটির দিকে ফিরলাম। তার ক্ষত পরিষ্কার করে দিতে লাগলাম। এমন সময় তেড়েফুঁড়ে এল কালোচুলের সেই তরুণ ছেলেটি যে রেডিও অপারেটরকে প্লেন থেকে নামিয়ে আনতে সাহায্য করেছিল আমাকে।

'শুনুন,' মারমুখী গলায় বলল সে, 'আপনার কি মনে হয় না তরুণী ভদ্রমহিলার সঙ্গে আপনি একটু বেশি রূঢ় ব্যবহার করে ফেলেছেন? স্রেফ একটা রেডিওই তো। আমি আপনাকে ওরকম একটা রেডিওর ব্যবস্থা করে দেব এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে, খুবজোর দশদিন লাগবে। কথা দিচ্ছি।'

তরুণটির দিকে তাকালাম আমি। বন্ধুসুলভ সেই ভাবটি তার চেহারা থেকে সম্পূর্ণ উধাও। তার চোখজোড়া শীতল এবং বুদ্ধিদীপ্ত দেখলেই বোঝা যায় এ লোক ভালো-মন্দ সব রকম পরিবেশের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে চলতে সক্ষম। 'একটা ব্যাপার তোমরা বোধহয় জান না,' শুকনা গলায় বললাম আমি। 'দশ দিনের মধ্যে তোমরা সবাই মরে যেতে পার।'

তরুণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল। 'এসব কী বলছেন আপনি?' তার চেহারা কঠোর হয়ে উঠল।

'সত্যি কথাই বলছি,' বললাম আমি। 'এই রেডিওটি যেটির কোনো গুরুত্বই বহন করছে না তোমার কাছে, এটি ছাড়া আমাদের টিকে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।'

কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ একটি কথা মনে পড়ে গেল আমার। 'আচ্ছা' ধীরে ধীরে বললাম আমি, 'এ মুহূর্তে আপনারা কোথায় আছেন সে সম্বন্ধে কারো কোনো ধারণা আছে কি?'

'হ্যাঁ, আছে। আমি বলেছি ওদেরকে,' দ্রুত বলল স্টুয়ার্ডেস। 'বরফ

ঝড়ের কারণে পাইলট নিশ্চয় রেইকযাভিকের ল্যান্ডিং ফিল্ড থেকে অনেক দূরে সরে এসেছেন। এ জায়গাটি ল্যাংযোকুল তাই নয় কি?' আমার চেহারার ভাব দেখে সে আবার চেষ্টা করল। 'নাকি হফসযোকুল? আমরা গ্যান্ডার থেকে উত্তর-পুবে উড়ে যাচ্ছিলাম আর ওই পথে আইসল্যান্ডে মাত্র দুটি স্নোফিল্ড বা গ্লেসিয়ার রয়েছে–'

'আইসল্যান্ড?' শব্দটি পুনরাবৃত্তি করলাম আমি অবাক হবার ভান করে। 'তুমি কি আইসল্যান্ডের কথা বললে?'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে, সবার চোখ ঘুরে গেল আমার দিকে। 'মাই ডিয়ার গার্ল,' বললাম আমি, 'তোমরা আসলে এ মুহূর্তে রয়েছে ২৬০০ মিটার উঁচুতে এবং গ্রিনল্যান্ড আইসক্যাপের ঠিক মাঝখানে।'

নীরবতা। আমার কথাগুলো ভয়ানক প্রভাব ফেলেছে সবার মনে। যেন সবাই চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তারপর সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। স্টুয়ার্ডেস এসে আমার জামার আস্তিন খামচে ধরল।

'এ হতে পারে না! এ হতে পারে না!' উন্মাদের গলায় বলতে লাগল সে। 'এটি গ্রিনল্যান্ড হতে পারে না। আমরা ছিলাম রেইকযাভিকের ফ্লাইটে। গ্রিনল্যান্ডের ধারে-কাছেও আমরা যাইনি।'

কালো চুলের ছেলেটি স্টুয়ার্ডেসের কাঁধে হাত রাখল কিন্তু মেয়েটি ব্যথায় পিছিয়ে গেল।

আমি শীতল গলায় জসকে বললাম, 'তুমি কি দয়া করে আমার বন্ধুদেরকে জানাবে আমরা ঠিক কোথায় আছি?'

পরিষ্কার এবং আবেগশূন্য গলায় বলে চলল জস। 'আমরা রয়েছি গ্রিনল্যান্ডে– রেইকযাভিক থেকে ১২০০ কিলোমিটার দূরে, সবচেয়ে কাছের শহর কিংবা গ্রাম এখান থেকে ৪৮০ কিলোমিটার দূরে এবং আর্কটিক সার্কেলের ৬৪০ কিলোমিটার উত্তরে এ মুহূর্তে আমাদের অবস্থান।'

জসের শান্ত, সমাহিত কণ্ঠ শুনে কারোরই সন্দেহ রইল না যে আমরা এ মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছি। তারপর অনেকগুলো প্রশ্ন একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি হাত তুলে বাধা দিলাম।

'প্লিজ লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান। আমি আপনাদের সবার প্রশ্নের জবাব একবারে দিয়ে দিচ্ছি। শুধু একটি বিষয় ছাড়া আর সব বিষয়ে আপনাদের মতো আমিও তিমিরে রয়েছি। তবে আসুন এখন খানিক কফি আর হুইস্কি পান করে নিই। আমার ধারণা আমাদের এ মুহূর্তে এ জিনিসটা দরকার।'

সবার মনে ধরল আমার প্রস্তাব শুধু ধর্মযাজক ছাড়া। মদ পানের কথা

শুনে তাকে বিব্রত দেখাল।

'আসুন নিন,' অধৈর্য গলায় বললাম আমি। 'এতে আপনার শরীর চাঙ্গা হবে।'

ধর্মযাজকের জন্য এটুকু আমন্ত্রণ যথেষ্ট ছিল। সে গোগ্রাসে গিলতে লাগল কফি এবং হুইস্কি।

সবাই যখন পান করতে ব্যস্ত আমি তখন আহত মানুষটির দিকে নজর দিলাম। তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস আগের চেয়ে একটু স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। স্টুয়ার্ডেস আমার দিকে ঝুঁকে এল। 'ওর অবস্থা কি আগের চেয়ে একটু ভালো মনে হচ্ছে?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল সে।

'একটু। তবে অবস্থা এখনো খুবই খারাপ। তোমার পিঠটা একটু দেখি। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব যন্ত্রণা সইছ?

'না, না। আমি ঠিক আছি,' বলল স্টুয়ার্ডেস।

'বোকামি করো না, মাই ডিয়ার,' বললেন মেরি লিগার্ড, আমাদের কথা এতক্ষণ শুনছিলেন তিনি। 'ও একজন ডাক্তার, জানোই তো।'

'না!' ক্রুদ্ধ গলায় বলল মেয়েটি।

আমি আর জেদ ধরলাম না। ঘুরে তাকালাম পুরো দলটির দিকে। কী অদ্ভুত প্রকৃতির একটি দল! প্রায় সবার পরনে বহুমূল্য স্যুট, হ্যাট, দামি পোশাক, এই হতচ্ছাড়া কেবিনের পটভূমে এদেরকে বড়ই বেমানান লাগছে। এখানে আরাম করার কোনো ব্যবস্থা নেই– নেই আরামকেদারা, কার্পেট কিংবা পর্দা। আছে বাক্সের মতো একটি ঘর যার আয়তন পাঁচ মিটার বাই চার মিটার। একদিকে আটটি খাট বা বিছানা অপরদিকে আমাদের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সরঞ্জাম। বেশকিছু খাবারের টিন, যার বেশির ভাগই খালি। স্তূপ করে রাখা হয়েছে তৃতীয় দেয়ালে। চার দেয়ালেই জমছে বরফ, প্রায় ছাদ ছুঁইছুঁই করছে। কেবিন থেকে বেরুনোর রাস্তা মাত্র দুটি– একটি ছাদের ট্রাপ-ডোর, অপরটি বরফে ঘেরা একটি টানেল বা গুহা, ওখানে আমরা আমাদের খাবার, পেট্রোল এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রাখি। টানেলের মাথায় টাট্টিখানা বা টয়লেট।

নগ্ন কেবিনের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে অসুখী, শীতে কাঁপতে থাকা মানুষগুলোর দিকে নজর ফেরালাম। এরা সবাই এসেছে বিলাসবহুল পশ্চিমা জগৎ থেকে। এদেরকে নিয়ে কী করব আমি? এরা সবচাইতে অপ্রত্যাশিত এবং অনাহূত অতিথি। আমি বুক ভরে দম নিলাম। তারপর আবার কথা বলতে শুরু করলাম। 'আপনারা যেহেতু আমাদের মেহমান হতে চলেছেন কাজেই আমাদের পরিচয় দেয়া বাঞ্ছনীয়।' বললাম আমি।

আপনাদের বামে রয়েছেন জোসেফ লন্ডন, আমাদের রেডিও অপারেটর।

'বর্তমানে বেকার,' যোগ করল জস, চেহারা করুণ করে তাকাল অমেরামতযোগ্য, ভাঙাচোরা রেডিওর দিকে।

'আপনাদের ডানদিকের মানুষটির নাম জ্যাকস্ট্র। ওকে ভালো করে লক্ষ করুন লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান। আপনারা যদি আবার বাড়ি ফিরতে পারেন তো ওর কারণেই পারবেন। গ্রিনল্যান্ড আইস-ক্যাপে কী করে টিকে থাকতে হয় ওর চেয়ে ভালো কেউ জানে না।'

'আর আমি হলাম ম্যাসন, পিটার ম্যাসন। এই সায়েন্টিফিক স্টেশনটির দায়িত্বে আছি। আমরা এখানে সাধারণত একা থাকি না। আমাদের পাঁচজন সহকর্মী একটি এক্সপিডিশনে ইংল্যান্ড গেছে। তিন সপ্তাহের মধ্যে তাদের ফিরে আসার কথা।... তো যাই হোক, এই হলাম আমরা। আর আপনাদের মধ্যে মাত্র একজনকেই চিনি আমি– মেরি লিগার্ড। দলটির মধ্যে যারা এখনো অভিনেত্রীটিকে চিনতে পারেনি তাঁরা বিস্মিত হয়ে ঘুরে দেখল ভদ্রমহিলাকে। 'তবে বাকিদের পরিচয় তাদের কাছ থেকেই শুনতে চাইছি।'

যার কপাল কেটে গিয়েছিল সে সবার আগে কথা বলল। 'কোরাজ্জিনি। নিক কোরাজ্জিনি। আমি স্কটল্যান্ড যাচ্ছিলাম একটি নতুন ট্রাক্টর কোম্পানির দায়িত্ব নিতে।'

'আপনি আমাদের কাজে লাগবেন মি. কোরাজ্জিনি' বললাম আমি। 'বাইরে একটা পুরনো ট্রাক্টর পড়ে আছে; কিন্তু ওটা চালু করা খুব কঠিন।'

শুনে শুধু হাসল কোরাজ্জিনি। বলল না কিছুই। আমি প্রিস্টের পোশাক পরা লোকটির দিকে তাকালাম।

'স্মলউড,' নিজের পরিচয় দিল সে। 'রেভারেন্ড জোসেফ স্মলউড। ইউনিটারিয়ান এবং ফ্রিচার্চের বিষয়ে জরুরি একটি মিটিংয়ে যোগ দিতে লন্ডন যাচ্ছিলাম আমি।'

'আর আপনি স্যার?' বড় জ্যাকেট পরিহিত ক্ষুদ্রাকৃতির মানুষটির দিকে তাকালাম।

'আমি সলি লেভিন, নিউইয়র্কের বাসিন্দা, আর এ আমার ছেলে জনি,' কালোচুলের তরুণের কাঁধ চাপড়ে দিল সে।

'আপনার পুত্র?'

'আরে না,' দ্রুত বলে উঠল তরুণ। 'উনি আমার ম্যানেজার, বাবা নন, আমি একজন বক্সার। জনি যাগেরো আমার নাম।'

'হ্যাঁ, শিগগির ও বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হবে,' গর্বভরে যোগ করল লেভিন। সে জনির আরো গুণগান গাইতে যাচ্ছিল, আমি থামিয়ে দিতে চট করে

ফিরলাম বক্সারের পাশে দাঁড়ানো যুবতীর দিকে।

'আমি মিসেস ড্যানসবি গ্রেগ,' হাসল সে, 'হয়তো আমার নাম আপনি শুনেছেন।'

ভান করলাম শুনিনি যদিও মহিলার অনেক ছবি দেখেছি বিভিন্ন খবরের কাগজের ফ্যাশন পাতায়। 'আর এ আমার চাকরানি ফ্লেমিং', কলারবোন ভাঙা তরুণী মেয়েটির দিকে ইঙ্গিত করল সে।

'আপনার পার্সোনাল মেইড?' অবিশ্বাস ফুটল আমার কণ্ঠে। 'তাহলে আমি যখন ওর কাঁধে ব্যান্ডেজ বাঁধছিলাম তখন আপনি সাহায্য করতে এলেন না কেন?'

'মিস লিগার্ডই তো যেচে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন,' শীতল গলায় বলল সে। 'আমার আর দরকার কী?'

'সে আপনাদের ব্যাপার,' বলে আমি ঘুরলাম সাদা চুলের বৃদ্ধ আর ইহুদিটির দিকে। 'থিওডোর মহিলার,' মৃদু গলায় বলল ইহুদি। আমি অপেক্ষা করলাম কিন্তু সে আর কিছুই বলল না।

'ব্রুস্টার,' ঘোষণা করলেন অপরজন। 'সিনেটর ব্রুস্টার,' সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোককে চিনতে পারলাম। আমেরিকান রাজনীতির এক বর্ণিল চরিত্র। 'আমার একটি রাজনৈতিক কমিটির জন্য তথ্য সংগ্রহে ইউরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম আমি।'

দলটির দিকে আবার তাকালাম। কত বিচিত্র পেশার মানুষের আগমন ঘটেছে গ্রিনল্যান্ডের এই আইস-ক্যাপে। একজন ব্যবসায়ী, একজন অভিনেত্রী, একজন ধর্মযাজক, একজন বক্সার এবং তার ম্যানেজার, একজন সিনেটর, একজন লন্ডনি, সোসাইটি উওম্যান এবং তার জার্মান মেইড, একজন সিনেটর, একজন চুপচাপ স্বভাবের ইহুদি এবং একজন আবেগী স্টুয়ার্ডেস। আর একজন মারাত্মক আহত রেডিও অপারেটর। সে বাঁচতেও পারে আবার মারা যাবার সম্ভাবনাই বেশি। এদের সবার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। কিন্তু কীভাবে করব? শূন্যের নিচের তাপমাত্রার বিরুদ্ধে লড়াই করার মতো প্রয়োজনীয় পরিচ্ছদ নেই তাদের, আর্কটিক আবহাওয়ায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও নেই কারো। এই বুনো এবং নির্মম আইসক্যাপে টিকে থাকার মতো শক্তিও নেই বেশিরভাগের।

আমার হতাশ চিন্তাভাবনাগুলো বাধা পেল দলটির নানান প্রশ্নে। স্বাভাবিক রুট পেলে পাইলট কী করে এতদূর সরে এল? তার কি কিছু হয়েছে? প্লেনের রেডিও কি নষ্ট হয়ে গেছে? ক্র্যাশ করার আগে যাত্রীদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়নি কেন?

আমি আমার সাধ্যমতো জবাব দিয়ে গেলাম সব প্রশ্নের। তবে বারবারই বললাম ওরা যা জানে তারচেয়ে বেশি কিছু জানি না আমি।

'কিন্তু এর আগে বলেছিলেন একটি বিষয় অন্তত আপনি আমাদের চেয়ে বেশি জানেন,' বলল কোরাজ্জিনি। 'সে বিষয়টি কী ড. ম্যাসন?' আমি সেই বিষয়টি ওদেরকে এখুনি জানাতে চাইছিলাম না বলে তাৎক্ষণিকভাবে একটি জবাব খাড়া করলাম। 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে আমরা জেনেছি আবহাওয়ার মাতলামির কারণেই রেডিও কম্যুনিকেশন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ কারণেই হয়তো দিক হারিয়ে পাইলট এতটা উত্তরে সরে আসছিলেন।' আমার বানোয়াট ব্যাখ্যা শুনে বিমূঢ় ভাব ফুটল জসের মুখে। সে খুব ভালো করেই জানে আমি যা বলছি তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। তবে অন্যরা আমার ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হল।

আহত রেডিও অপারেটরের কাছে গেলাম আমি, স্টুয়ার্ডেসের সাহায্যে তার মাথায় ব্যান্ডেজ করে দিলাম।

'ওর অবস্থা এখন কেমন, ড. ম্যাসন? জিজ্ঞেস করল সে।'

'বলা কঠিন। আমি ব্রেন ইনজুরি বিশেষজ্ঞ নই। ওকে যদি ভালো কোনো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া যেত, বলতে পারতাম ওর টিকে থাকার সম্ভাবনা আছে।' মেয়েটির উদ্বেগাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকালাম। 'আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, মিস...আ...।

'রস। মার্গারেট রস,'

'আমাকে বলো, মিস রস। বিমানে যাত্রী সংখ্যা এত কম কেন?'

'এটা একটা অতিরিক্ত বিমান,' জবাব দিল সে, 'আমরা অনেক যাত্রী বুক করে ফেলেছিলাম, তাই বাকি যাত্রীদের জন্য অতিরিক্ত আরেকটি বিমানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।'

'যাক দশজন যাত্রীর কারণে তোমার পরিশ্রম অন্তত লাঘব হয়েছে এবং তুমি খানিকটা ঘুমিয়েও নিতে পেরেছো।'

'বাজে কথা বলবেন না!' তীব্র আপত্তি করল স্টুয়ার্ডেস। 'আমি এর আগে কোনোদিন ডিউটির সময় ঘুমিয়ে পড়িনি। আর এবারে ঘুমিয়ে না পড়লে আমি যাত্রীদেরকে সাবধান করে দিতে পারতাম। কর্নেল হ্যারিসনকে সামনের দিকে নিরাপদ কোনো আসনে সরিয়ে নিয়ে আসতে পারতাম এবং উনি মারাও যেতেন না। আর মিস ফ্লেমিংয়েরও কলার বোন ভাঙত না।'

আমি মেয়েটির দিকে তাকালাম। একে নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। মেয়েটির আচরণ খুব অদ্ভুত, যাত্রীদের জন্য তার উদ্বেগ আমার হৃদয় স্পর্শ করেনি। এর ওপর আরো সতর্ক নজর রাখতে হবে, মনে মনে বললাম।

মুখে বললাম, 'এ জন্য অপরাধবোধে ভুগতে হবে না, মিস রস। দুর্ঘটনার আগ পর্যন্ত হয়তো পাইলটের কোনো ধারণাই ছিল না কী ঘটতে চলেছে। মনে মনে ভাবলাম কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে এই মেয়েটির হয় কোনোরকম ধারণা ছিল না অথবা সে অত্যন্ত পাকা অভিনেত্রী।'

আমরা স্যুপ, মাংস, আলু এবং সবজি দিয়ে তৃপ্তি সহকারে পেটপুজো করলাম। সবগুলো খাবারই টিনজাত। তারপর ঘুমের আয়োজন করতে লাগলাম। স্টুয়ার্ডেস মার্গারেট রস বলল সে আহত, রেডিও অপারেটরের সঙ্গে ঘুমাবে। বাকি তিনজন মহিলা তিনটি বিছানা দখল করল, আর ছ'জন পুরুষের জন্য রইল পাঁচটি খাট। কোরাজ্জিনি কয়েন টস করার প্রস্তাব দিল কে মেঝেতে ঘুমাবে তা নিয়ে। বাকিরা তার প্রস্তাবে রাজি হল। টসে হেরে গেল কোরাজ্জিনি তবে কোনো তর্ক ছাড়াই নিজের হার স্বীকার করে নিল সে।

যে যার বিছানার শয্যা নেয়ার পর আমি জসকে চোখ ইশারা করে এগুলাম ট্রাপ-ডোরের দিকে। জস বুঝতে পারছিল তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাইছি। বিনাবাক্য ব্যয়ে সে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। বাতাসের চাবুকের ধার একটু জমেছে তবে ঠাণ্ডা বেড়েছে আরো।

'এসব আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।' দৃঢ় গলায় বলল জস, 'পুরো ব্যাপারটি আমার কাছে কেমন খাপছাড়া লাগছে।

'আমার কাছেও তাই,' সায় দিলাম আমি। কিন্তু এ রহস্যের তল খুঁজে পাব কি করে?'

'এর আগে আপনি বলেছিলেন আপনি একটি বিষয় জানেন যা অন্যরা জানে না। কী সেটা?'

'প্লেন ক্র্যাশ হবার ব্যাপারটি অন্যেরা কেন জানে না বা টের পায়নি তা আমি জানি। ওদের সবাইকে নিশ্চয় মদ খাওয়ানো হয়েছিল।'

জস তাকাল আমার দিকে। 'আপনি ঠিক জানেন? মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল সে।'

'নিশ্চয়', জবাব দিলাম আমি। 'ওদের সবার চোখে-মুখে ছিল বিহ্বল ভাব, হাঁটাচলা কথাবার্তা সবকিছুই ছিল অস্বাভাবিক মন্থর। নিশ্চয় কোনো ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে সবাইকে।'

'কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না,' বলল জস, 'ঘুম থেকে জেগে ওঠার পরে তো ওদের বোঝা উচিত ছিল ওদেরকে ড্রাগ খাওয়ানো হয়েছে।'

'স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ওরা ব্যাপারটা বুঝতে পারত বটে কিন্তু ওরা

সম্ভবত এমন কনফিউসড ছিল যে, নিজেদের অদ্ভুত আচরণের জন্য প্লেন ক্র্যাশকেও হয়তো দায়ী করেছে।'

জমাটবাঁধা বরফের ওপর বসে শীতে হি হি করে কাঁপছি, জস জোরে বলল, 'এটি সম্ভব না। একজন মানুষ কী করে ঘুরে ঘুরে যাত্রীদের ড্রিংকের মধ্যে ঘুমের মাদক মিশিয়ে দেবে?'

'এক মিনিট জস,' বললাম আমি, 'আমাদের কেবিনের রেডিওর কী দশা হয়েছিল?'

'আমার কোনো ধারণা নেই। তবে টেবিলের পায়া ওভাবে ভেঙে যেতে পারে না। কেউ নিশ্চয় ইচ্ছে করে টেবিলটি উল্টে ফেলেছিল।'

'আর ওই সময় মার্গারেট রসই শুধু ওখানে ছিল... এখন আমাকে বলো, যাত্রীদের পানীয়তে স্লিপিং ড্রাগ মিশিয়ে দিতে সবচেয়ে সুবিধেজনক অবস্থানে কে থাকতে পারে?

'গুড গড, অফকোর্স নিশ্চয়ই ওই মেয়েটি।'

আমি আর সময় নষ্ট করতে চাইলাম না।

'জ্যাকস্ট্রকে আমাদের সন্দেহের কথা যত দ্রুত সম্ভব জানিয়ে দাও,' বললাম আমি। 'চলো, কেবিনে ফিরি। নইলে ঠাণ্ডায় জমে যাব।'

কেবিনের ভেতরে তাপমাত্রা শূন্যের নিচে চুয়াল্লিশ ডিগ্রি। আমি মেঝেতে শুয়ে পড়লাম, কানের ওপর টেনে দিলাম ফারের জ্যাকেট যাতে ঠাণ্ডায় জমে না যায় কান। এবং একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

চার

সোমবার সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা

পরদিন ঘুম যখন ভাঙল সকাল সাড়ে ৬টা বাজে। ঠাণ্ডায় অসার শরীর। জ্যাকস্ট্র আগেই উঠে পড়েছে, জ্বালিয়ে নিয়েছে তেলের বাতি। বাইরে মাঝরাতের মতো অন্ধকার। বছরের এ সময়ে দিনে সাকুল্যে দুই-তিন ঘণ্টা আলো থাকে, তাও দুপুরে দিকে। বরফ দেয়াল থেকে ছাদ পর্যন্ত ঢেকে ফেলেছে। আমাদের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্দেশ করছে বাইরে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে আটচল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

পূর্ণ বিশ্রাম নেয়ায় তাজা দেখাচ্ছে জ্যাকস্ট্রকে। কেরোসিনের চুলোয় পাতিল চাপিয়ে বরফ গলাচ্ছে। অন্যরাও জেগে গেছে, আপাদমস্তক কাঁপছে তাদের। মুখগুলো প্রবল ঠাণ্ডায় নীলচে-সাদা। সবার আগে মেরি লিগার্ড আমাদের স্বাগত জানালো। এক রাতের ব্যবধানেই তাঁর বয়স যেন বেড়ে গেছে দশ বছর। তবে অন্যদের প্রতি তাঁর উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় ভাটা পড়েনি মোটেই। জার্মান মেয়েটির খোঁজ-খবর নিলেন তিনি তারপর মিসেস ডান্সবি গ্রেগের দিকে ফিরে বললেন, 'তাহলে রাতটা টিকে গেলেন?'

'টিকে গেলাম ঠিকই বলেছেন আপনি,' তেতো গলায় জবাব দিল মিসেস ডান্সবি গ্রেগ। জার্মান মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বলল, 'ওখানে যে কফি বানানো হচ্ছে খুব সুন্দর গন্ধ ছড়িয়েছে। ফ্লেমিং, আমার জন্য এককাপ কফি নিয়ে এসো।'

আমি কফির কাপ নিয়ে জার্মান মেয়েটিকে দিলাম। 'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন হেলেনের একটা কলারবোন ভেঙে গেছে।' চাঁছাছোলা গলায় বললাম আমি। মহিলার ঠিকই মনে আছে তবে মুখে বলল 'ইস কী বোকা আমি! কথাটা একদমই ভুলে গিয়েছিলাম!' সে শীতল এবং কঠোর চোখে আমার দিকে তাকাল। আমি বুঝতে পারলাম আমি একজন শত্রু তৈরি করেছি।

তবে ত্রিশ সেকেন্ড পরে এসব কথা কিছুই মনে রইল না আমার। আমি মাত্র মেরি লিগার্ডকে কফি দিয়েছি এমন সময় কে যেন চিৎকার করে উঠল।

ভীত আর্তনাদ। চিৎকার করেছে স্টুয়ার্ডেস মার্গারেট রস। সে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে রেডিও অপারেটরের নিথর শরীরের দিকে। আমি একনজর চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলাম লোকটি মারা গেছে বহু আগে। তাকে পরীক্ষা করে দেখলাম। লাশ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি, সবার চোখ ঘুরে গেল আমার ওপর। নীরবতা ভঙ্গ করল যাগেরো।

'ও মারা গেছে তাই না, ড. ম্যাসন?'

'হ্যাঁ। যদ্দূর মনে হয় মস্তিষ্কে অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের কারণেই সে মারা গেছে।'

ওদেরকে মিথ্যা বলেছি আমি। মৃত্যুর আসল কারণ আমি জানি। খুন। তরুণটিকে ঠাণ্ডা মাথায়, নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। রেডিও অপারেটরটি ছিল অচেতন এবং অসহায়। নড়াচড়া করতেও পারত না। কেউ তাকে বালিশচাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে। এবং খুব সহজে।

আমরা ওকে আইস-ক্যাপের বাইরে কবর দিলাম। তবে কবরটা বেশি গভীর করা গেল না শক্ত বরফের কারণে। মাটি এমন শক্ত, কোদাল বসে না। প্রিস্ট স্মলউড কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলল নিচু গলায় শীতে কাঁপতে কাঁপতে। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

কেবিনে বসে নীরবে নাস্তা সারলাম। লক্ষ্য করলাম মার্গারেট রস কিছুই মুখে তুলছে না। 'ওরে খুনি,' মনে মনে বললাম। 'তোমাকে সহকর্মীদের দুঃখে কাতর নীরব ভূমিকায় একদমই মানাচ্ছে না। শিগগিরই অন্যরাও তোমাকে সন্দেহ করতে শুরু করবে।...'

আমার কোনো সন্দেহই নেই যে, মার্গারেট রসই হত্যা করেছে অজ্ঞান রেডিও অপারেটরকে। সে রেডিওটার যেভাবে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে, মাদক খাইয়েছে যাত্রীদের, একইভাবে ওই লোকটিরও কেড়ে নিয়েছে প্রাণ। কিন্তু কেন? রেডিও অপারেটরকে খুন করেছে সম্ভবত চিরতরে তার মুখ বন্ধ করে দিতে। কিন্তু রেডিওটাকে সে কেন ধ্বংস করল– যে জিনিসটা আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এত জরুরি? আমার মাথায় অনেক প্রশ্ন কিন্তু কোনোটারই জবাব মিলছে না। মেয়েটার দিকে তাকালাম আবার। 'হয় ও দারুণ বুদ্ধিমতী একজন খুনি,' ভাবছি মনে মনে। 'প্রতিটি পদক্ষেপ নেয় অত্যন্ত ভেবেচিন্তে নতুবা ও একটা উন্মাদ।'

নিজেকে স্বাভাবিক করতে দলটির কাছে আমাদের বর্তমান অবস্থার বাস্তবতা তুলে ধরলাম বিস্তৃতভাবে। ওরা বসে বসে আমার কথা শুনল, সবার চেহারা ফ্যাকাসে এবং বিবর্ণ দেখাল ভোরের ধূসর আলোয়।

আমার বক্তৃতা শেষ হতে কোরাজ্জিনি বলল, 'তাহলে আপনি যা বললেন, ড. ম্যাসন, তার সারমর্ম হল এই যে, আপনার অন্য সহকর্মীরা তিন সপ্তাহ আগে স্নো-ট্রাক্টর নিয়ে চলে গেছেন এবং আগামী তিন সপ্তাহের

আগে তারা আর ফিরছেন না। ইতিমধ্যে টিনজাত খাবার প্রায় শেষ হয়ে গেছে এবং যেটুকু খাবার আছে তাতে আমাদের তেরোজনের পাঁচদিনও চলবে কি না সন্দেহ। তার মানে ওরা ফিরে আসার আগ পর্যন্ত এক পক্ষকাল আমাদেরকে অনাহারে থাকতে হবে।'

'ঠিক', বললাম আমি।

'আপনার পুরনো স্নো-ট্রাক্টরে চেপে উপকূলে পৌঁছাতে বহুদিন লাগবে?'

'আবহাওয়া ভালো থাকলে সাতদিন। আর প্রতিকূল আবহাওয়ায় ট্রাক্টর তার যাত্রা শেষ করতেই পারবে না। কারণ ট্রাক্টরটার অনেক বয়স হয়েছে।'

'সে ক্ষেত্রে অপর ট্রাক্টরটি আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করি না কেন?' বলল যাগেরো। 'শুধু খাবারটা হিসেব করে খরচ করলেই হল।'

'অসম্ভব' বললাম আমি। 'আমরা সবাই মারা যাব– কোনো সন্দেহ নেই। স্বাভাবিক আবহাওয়ায় মানুষ না খেয়ে মোটামুটি একটি সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু এরকম বিশ্রী আবহাওয়ায় খাবার ছাড়া আমরা দুদিনও টিকতে পারব না।'

'আমরা যদি আপনাদের কলিগদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি?' প্রস্তাব দিল কোরাজ্জিনি। 'জানি রেডিও অকেজো তবে আপনি না বললেন আপনার পুরনো ট্রাক্টরে একটি রেডিও আছে?'

'ওটা শুধু ১৬০ কিলোমিটার, বড়জোর ২৪০ কিলোমিটার দূরত্ব কভার করতে পারে তাও যদি আবহাওয়া ভালো থাকে। আর আমাদের বন্ধুরা আছে ২৩০ কিলোমিটার দূরে। প্রয়োজন ছাড়া তারা ঘর থেকেই বেরুবে না। অপ্রয়োজনে খরচ করার মতো যথেষ্ট পেট্রোল তাদের কাছে নেই।'

'এখানে নিশ্চয় অনেক পেট্রোল আছে?'

'তা তো আছেই। ওখানে সাড়ে তিন হাজার গ্যালন পেট্রোল রেখেছি,' টানেলের দিকে হাত তুলে বললাম আমি।

'আই সি,' বলল কোরাজ্জিনি, চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। 'আ... প্লিজ ভাববেন না যে আমি খুব বেশি প্রশ্ন করছি– তবে আমার ধারণা আপনার বন্ধুরা নিশ্চয় রেডিওতে নিয়মিত যোগাযোগ করেন আপনাদের সঙ্গে? আপনাদের কাছ থেকে কোনো সাড়াশব্দ না পেলে কি তারা চিন্তায় পড়বেন না?'

'না, একদমই চিন্তায় পড়বেন না,' জবাব দিলাম আমি। 'হিলক্রেস্ট ওখানকার চার্জে রয়েছেন। বিজ্ঞানী, কখনই কোনো কিছু তাকে চিন্তিত করে না। তবে এ মুহূর্তে তাদের রেডিও ঠিকমতো কাজ করছে না। তারা যোগাযোগ করতে না পারার জন্য রেডিওকে দোষ দেবে।'

'তাহলে আমাদের করণীয় কী?' উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইল সলি লেভিন। 'না খেয়ে মরব নাকি হাঁটা শুরু করব? একটি সিদ্ধান্ত তো নিতেই

হবে।'

'সিদ্ধান্ত আমি আগেই নিয়ে ফেলেছি,' বললাম আমি।

'আমরা কাল রওনা হবো। আমরা সবাই। শুধু জস ছাড়া। সে এখানেই থাকবে অন্যদের সঙ্গে সাহায্য করার জন্য।'

'আজ কেন রওনা হচ্ছি না আমরা?'

'কারণ দীর্ঘযাত্রার জন্য ট্রাক্টরটিকে রেডি করতে হবে। এতে সময় লাগবে। তবে আগে প্লেন থেকে সবার লাগেজ নামিয়ে আনতে হবে। যত পারেন গায়ে পোশাক চাপিয়ে নেবেন।'

কোরাজ্জিনি এবং যাগেরোকে নিয়ে আমি ফিরে এলাম প্লেনে। স্নো-স্টিক দিয়ে চিহ্নিত করে রাখলাম রাস্তা যাতে কেবিনে ফেরার পথ হারিয়ে না ফেলি। প্লেনটি ঠাণ্ডা এবং অন্ধকার যেন কোনো কবরে প্রবেশ করছি আমরা। টর্চের আলোয় ভূতের মতো চলাফেরা করছি আমরা, লাশগুলোর গায়ে যেন ধাক্কা না খাই সে ব্যাপারে সাবধান থাকছি।

ভয়ঙ্কর নীরবতা ভেঙে যাগেরো প্রথম কথা বলল, 'আমরা কি... এদেরকে এখানে এভাবে ফেলে রেখে যাব, ডক্টর? কবর দেব না?'

'কবর দেব? আইস-ক্যাপে ওরা শিগগির কবর হয়ে যাবে। ছয় মাসের মধ্যে গোটা প্লেন গায়েব হয়ে যাবে বরফের নিচে।'

আমি কথা বলছি, লক্ষ করলাম কোরাজ্জিনি একটি ধাতব পোর্টেবল রেডিও ধরে ঝাঁকাচ্ছে, চেহারায় ফুটে রয়েছে হতাশা। ওটার ভেতর থেকে ভেসে আসা শব্দ শুনছে।

'টোটাল লস?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হুঁ মাত্র দুদিন আগে জিনিসটা কিনেছিলাম দুশো ডলার দিয়ে।'

'জিনিসটা সঙ্গে নিয়ে নিন।' পরামর্শ দিলাম আমি। 'শুনুন, এসে পড়েছে জ্যাকস্ট্র।'

কুকুরের ঘেউ ঘেউ আওয়াজ শুনতে পেলাম আমরা। স্লেজে দ্রুত তুলে ফেললাম বাক্স পেটরাগুলো। লাগেজের সংখ্যা এত বেশি যে, সবগুলো কেবিনে নিয়ে আসতে দুটো ট্রিপ লাগল। যখন ঢুকলাম কেবিনে, শীতে থরথর করে কাঁপছি, কোরাজ্জিনির নাক এবং কান সাদা হয়ে গেছে ফ্রস্টবাইটের আক্রমণে।

সেদিন লাঞ্চে বরাদ্দ থাকল স্যুপ এবং কিছু ড্রাইকেক। সামনের কাজগুলোর জন্য যে শারীরিক তাগদ এবং উষ্ণতা প্রয়োজন, এত অল্প খাবার দিয়ে তা পাওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দীর্ঘ যাত্রার জন্য পুরনো ট্রাক্টরটি প্রস্তুত করা সহজ কাজ ছিল না। কাজ করার সময় ট্রাক্টরটি পর্দা দিয়ে ঢেকে রাখতে হল ছুরির ফলার মতো ধারালো বাতাসের কবল থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে। ওটুকু প্রোটেকশন এবং দুটো তেলের বাতির

আলো এবং উষ্ণতা সত্ত্বেও আমাদের বেশিরভাগকে ঘনঘন কেবিনে ফিরতে হল ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া শরীরে কিঞ্চিৎ প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনতে।

লম্বা ভ্রমণের জন্য ট্রাক্টরে কাঠের একটি কেবিন তৈরি করা হয়েছে। ওতে রয়েছে চারটি বেড। কেবিনের খণ্ডাংশগুলো একে একে জোড়া লাগানো হল। মেঝের খণ্ডাংশ জোড়া লাগাতেই লেগে গেল এক ঘণ্টা। বহুক্ষণ পরিশ্রম শেষে ট্রাক্টরটি মোটামুটি যাত্রার উপযোগী হয়ে উঠল। ততক্ষণে ঠাণ্ডায় আমাদের হাড় জমে যাবার দাখিল, হাতের চামড়া ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে।

বিছানাপত্র ঠিকঠাক করছি, কে যেন আমার নাম ধরে ডাকল। মেরি লিগার্ড। 'এক মিনিটের জন্য একটু নিচে আসবে, প্লিজ? মার্গারেটকে একটু দেখবে। ওর পিঠের ব্যথাটা সাংঘাতিক বেড়েছে। আর সহ্য করতে পারছে না বেচারা।'

'আমি তো গত রাতেই ওর চিকিৎসা করতে চেয়েছিলাম। আমাকে যদি তার দরকারই হয় নিজে এল না কেন?'

'কারণ সে তোমাকে ভয় পাচ্ছে তাই।' অধৈর্য গলায় বললেন তিনি। 'তুমি আসবে কী আসবে না বলো?'

আমি কেবিনে গেলাম। গ্লাভস খুলে রক্তাক্ত হাতজোড়া ধুয়ে ফেললাম। স্টুয়ার্ডেসের পিঠ পরীক্ষা করে দেখলাম। বাম কাঁধের নিচেটা বিশ্রীভাবে ফুলে আছে আর শিরদাঁড়ার ঠিক মাঝখানে গভীর কাটা দাগ। মনে হয় ধারাল কোনো বস্তুতে লেগে কেটে গেছে।

'এভাবে আঘাত পেলে কী করে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'আর গতকাল আমাকে দেখতে দাওনি কেন?'

'আপনাকে গতকাল বিরক্ত করতে সায় দেয়নি মন,' জবাব দিল সে। 'আর আঘাতগুলো কীভাবে লেগেছে জানি না।'

'সে কারণ পরে খুঁজে বের করব,' তার চোখে চোখ রেখে বললাম আমি।

'খুঁজে বের করবেন? আমার ওপর আপনি এত রেগে আছেন কেন, ড. ম্যাসন? আমি কী করেছি?' ওর বড়বড় বাদামি চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

বাহ, দারুণ অভিনয়! স্বীকার করতেই হবে। ওকে হয়তো আমি আঘাত দিয়ে ফেলেছি তবে ঠিক কাজটাই করেছি।

সময় নষ্ট করলাম না আমি। ফারের কোট গায়ে চাপিয়ে মুখে বরফ-মুখোশ এঁটে পাঁচ-ছয় মিনিট বাদেই চলে এলাম প্লেনে। লাফ মেরে উঠে পড়লাম প্লেনের নাকে, ভাঙা উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে গলিয়ে দিলাম শরীর। সোজা চলে এলাম ছোট্ট কিচেনে যেখানে প্লেন ক্র্যাশের পরপরই দেখতে

পেয়েছিলাম স্টুয়ার্ডেসকে। জোর খোঁজ লাগিয়ে বুঝতে পারলাম আমার সন্দেহই সত্যি। এখানে এমন কিছু নেই যার কারণে ওর পিঠে অমন মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। রেডিও কম্পার্টমেন্টে ঢুকলাম আমি। যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেলাম। রেডিও কেবিনেটের টপ লেফট-হ্যান্ড কর্নার বিশ্রীরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিনারে নেভি ব্লু রঙের পোশাকের কিছু সুতো এবং ছোট গাঢ় একটি দাগ চোখে পড়ল আমার। রেডিওর ভেতরে উঁকি দিতেই বুঝলাম ইচ্ছাকৃতভাবে ওটাকে ভেঙে বাতিল করে দেয়া হয়েছে।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় আমার শরীর যেন কাজ করতে চাইছিল না, তবু বুঝতে পারছিলাম কেন রেডিও অপারেটর কোনো অ্যালার্ম কিংবা ওয়ার্নিং মেসেজ পাঠাতে পারেনি। তার কোনো উপায়ই ছিল না। স্টুয়ার্ডেস নিশ্চয় তার দিকে আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে রেখেছিল।

আগ্নেয়াস্ত্র! কথাটা ভাবতেই প্লেনের মৃত ক্যাপ্টেনের কথা মনে পড়ে গেল। আমি তার কাছে গিয়ে উল্টে দেখলাম জ্যাকেট। যা ভেবেছি, পিঠের ঠিক মাঝখানে বুলেটের গর্ত।

মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেল আমার, কলজেটা ঘোড়ার মতো লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। স্টুয়ার্ডেস যাকে কর্নেল হ্যারিসন বলে সম্বোধন করেছিল তার কাছে চলে এলাম। সাবধানে তার জ্যাকেট তুললাম। আছে ওটা। সেই একই ভয়ঙ্কর ছোট্ট ফুটো। লাশটি সামনের দিকে একটু ঠেলে দিতেই চোখে পড়ল কর্নেলের পিঠের পেছনের সিটের অংশ ছেঁড়া। কর্নেলের পকেটে একটি আগ্নেয়াস্ত্র পেয়ে গেলাম। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ওটা আমার জ্যাকেটের পকেটে চালান করে দিলাম।

কিছু বুলেটও পেয়েছি কর্নেলের কাছে। সেগুলোও নিয়েছি।

কর্নেলের আরেক পকেটে একটি পাসপোর্ট এবং একটি ওয়ালেট পেয়ে গেলাম। ওয়ালেটে জরুরি কিছুই নেই– তার স্ত্রীর লেখা কয়েকটি চিঠি, কিছু ব্রিটিশ এবং আমেরিকান টাকা আর নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায় ছাপা হওয়া একটি লেখা। দু'মাস আগের।

আমার টর্চের আলোয় খবরের কাগজের লেখাটিতে চোখ বুলালাম। একটি রেলওয়ে ক্র্যাশের ছবি ছাপা হয়েছে লেখাটির সঙ্গে, নিউজার্সিতে একটি ট্রেন দুর্ঘটনার ফলোআপ স্টোরি। যাত্রীবাহী রেলগাড়িটি একটি সেতু ধসে পানিতে পড়ে গিয়েছিল তারই গল্প।

লেখাটি পড়ার মুড ছিল না তবে পরে এটি কাজে লাগতে পারে ভেবে কাগজটি পিস্তল এবং বুলেটসহ একই পকেটে রেখে দিলাম। ঠিক তখন তীক্ষ্ণ ধাতব একটি শব্দ ভেসে এল কানে নিঃসঙ্গ প্লেনটির সামনে থেকে।

পাঁচ

সোমবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা

পাঁচ বা দশ সেকেন্ড জায়গায় নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম আমার পাশের মরা মানুষটির মতো। শুধু একটি চিন্তা, একটি ভয়ঙ্কর ভাবনা আমার স্থবির মনকে গ্রাস করছিল– মৃত পাইলটদের কেউ একজন হয়তো তার আসন থেকে উঠে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

তারপর আবারো শুনতে পেলাম শব্দটি। ধ্বংসস্তূপের মাঝ দিয়ে অন্ধকারে হাঁটাচলা করছে কেউ। আমি দ্রুত একটি আসনের পেছনে লুকিয়ে পড়লাম। এবার একটা ব্যাপার নিশ্চিত হয়ে গেছি। কোনো মৃত পাইলট শব্দের উৎস নয়, জীবিত একজন মানুষ ওই আওয়াজ করেছে। স্টুয়ার্ডেস। নিশ্চয় সে। মেরি লিগার্ড ছাড়া একমাত্র সেই আমাকে কেবিন ত্যাগ করতে দেখেছে। মেয়েটি ইতিমধ্যে তিনজনকে হত্যা করেছে, চতুর্থ আরেকজনকে খুন করতেও দ্বিধা করবে না। তার পরিচয় এখন ফাঁস হয়ে গেছে। সে জানে আমার অস্তিত্ব তার জন্য মস্ত সমস্যা।

হঠাৎ আমার ভয় রূপান্তরিত হল ক্রোধে। পকেট থেকে পিস্তল বের করে ছুটে গেলাম প্লেনের সামনে। কেউ নেই ওখানে। তবে একটি ছায়ামূর্তিকে পলকের জন্য দেখলাম ভাঙা উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে লাফিয়ে নামছে। গুলি করার চেষ্টা করলাম। ঘটল না কিছুই। পিস্তলে গুলিই ভরা নেই। জানালা দিয়ে তাকালাম বাইরে, দেখলাম ছায়ামূর্তিটি প্লেনের বাম বাহুর দিকে ছুটে যাচ্ছে, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল বরফে। দশ সেকেন্ড বাদে মাটিতে নেমে এলাম আমি। ভারী তুষারপাত হচ্ছে। তবে ছায়ামূর্তিটিকে দেখতে পাচ্ছি স্নো-স্টিকের লাইন ধরে ছুটে যাচ্ছে। হঠাৎ সে নতুন দিকে বাঁক নিল। আমি ছুটলাম তার পেছন পেছন। ছায়ামূর্তির টর্চের আলো আর পায়ের শব্দ তাকে অনুসরণ করতে সাহায্য করল। একটু পরই দাঁড়িয়ে

পড়লাম আমি প্রস্তর মূর্তি হয়ে। ছায়ামূর্তির টর্চের আলো নিভে গেছে। আর কোনো শব্দও শুনতে পাচ্ছি না। বোকামোর জন্য গালাগাল করলাম নিজেকে। আমার সোজা কেবিনে ফিরে যাওয়া উচিত ছিল বদলে এখানে চলে এসেছি, স্নো-স্টিক থেকে অনেক দূরে। কেন? ও তো আমার কবল থেকে পালাতে পারত না। বেঁচে থাকলে আমরা দুজনই তো কেবিনে ফিরব। সেখানে আজ হোক কাল হোক ওর মুখোমুখি হব আমি। বেঁচে থাকলে! হঠাৎ উপলব্ধি করলাম নির্বোধের মতো কী কাজটাই না করেছি। আমি বেঁচে না থাকলেই তো মেয়েটি আমার কবল থেকে রক্ষা পেয়ে যায়! এখানে আমাকে গুলি করলে কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। হয়তো এ মুহূর্তে সে আমার দিকে তাক করে রেখেছে বন্দুক।

টর্চ জ্বালিয়ে বৃত্তাকারে আলোটা ফেললাম অন্ধকার এবং তুষারের গায়ে। কাউকে দেখতে পেলাম না। বাম দিকে দ্রুত সরে গিয়ে নিভিয়ে দিলাম টর্চ। বাতি জ্বেলে আরেকটা বোকার মতো কাজ করেছি। ওকে আমার অবস্থান জানিয়ে দিয়েছি। মন্থর গতিতে এবং নিঃশব্দে মস্ত একটা বৃত্ত নিয়ে ঘুরলাম আমি, উৎকর্ণ কান, যদি সামান্যতম শব্দও শোনা যায়! কিন্তু শুনতে পেলাম না কিছুই। কিছু চোখেও পড়ল না। যেন একা শুধু আমি রয়েছি আইস-ক্যাপে।

তখন ভয়ঙ্কর সত্যটা আঘাত হানল আমাকে– আমি একা। আর একা বলেই আমাকে গুলি করা বোকামো হবে। পরদিন আমার লাশ আবিষ্কৃত হলে; শরীরে বুলেটের গর্ত থাকলে নানান প্রশ্নের জন্ম নেবে। আমাকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়ার আরো উপায় আছে। সবচেয়ে অভিজ্ঞ মানুষটিও আইস-ক্যাপের তুষার ঝড়ে হারিয়ে যেতে পারে– ঠাণ্ডায় জমে মরতে পারে।

আর আমি হারিয়ে গেছি। এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আমাকে কৌশলে ফাঁদে ফেলা হয়েছে উপলব্ধি করতেই ভীষণ রাগ হল। সিদ্ধান্ত নিলাম যেভাবেই হোক এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবই।

ভারী তুষারপাত এখন তুষার ঝড়ে রূপ নিয়েছে। সামনে এক দুই মিটারের বেশি দৃষ্টি চলে না। আর টর্চের আলোর জোরও কমে আসছে ক্রমে। ঠিক করলাম প্লেনটিকে খুঁজে বের করব আগে। কেবিন খুঁজে পাওয়ার চেয়ে ওটার সন্ধান পাওয়া সহজ হবে। আর প্লেনটি বোধকরি নব্বই মিটার দূরে রয়েছে। আমি বাতাস আর তুষারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে এগিয়ে চললাম। ত্রিশ সেকেন্ড পর প্লেনটিকে পেয়ে গেলাম।

হেঁটে প্লেনের ডানার কাছে চলে এলাম, চোখ পড়ল একটি স্নো-স্টিক এবং লাইন ধরে এগোতে লাগলাম। মাত্র পাঁচটি স্টিক রয়েছে একসঙ্গে। তারপর আর নেই। বাকি স্টিকগুলো সাবধানে তুলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এখন কেবিন খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। মরিয়া হয়ে পাঁচটি স্টিকের প্রথমটি তুলে নিয়ে লাইনের শেষ মাথায় ওটা গাঁথলাম। তারপর আরেকটি স্টিক ওটার পরে গাঁথলাম। এভাবে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু প্রবল বাতাস আর টর্চের নিভু নিভু আলোয় দিক ঠিক রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। এ পরিকল্পনা বাদ দিয়ে রেডিও অ্যান্টেনার ওপর নজর দিলাম। আমি জানি ওটা প্লেন থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে চারশ মিটার দূরে রয়েছে।

প্লেনে ফিরে এসে সোজা হাঁটা দিলাম। পিঠে আছড়ে পড়ছে ঝড়ো বাতাস, আমি গুনে গুনে কদম ফেলছি। যখন সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়েছি, একটা অ্যান্টেনা পোস্টের সঙ্গে বাড়ি খেলাম। তখন আমার আনন্দ দেখে কে! আমি দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম খাম্বাটাকে যেন আর কোনোদিন ছাড়ব না। আনন্দ অচিরেই রূপ নিল প্রচণ্ড রাগে, কারণ আমি তো আরেকটু হলেই মরতে বসেছিলাম।

কেবিনে ঢুকেই স্টুয়ার্ডেসের দিকে তাকালাম। তার পরনে ফারের জ্যাকেট, হাতজোড়া ঘষছে।

'ঠাণ্ডা লাগছে, মিস রস?' কণ্ঠে উদ্বেগ ফোটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলাম।

'কেন লাগবে না, ড. ম্যাসন!' স্টুয়ার্ডেসের প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বললেন মেরি লিগার্ড। ও বাইরে ঝাড়া পনেরো মিনিট ব্যস্ত ছিল ট্রাক্টরের লোকদের নিয়ে।

'কী করছিল জানতে চাইলাম আমি।'

'ওদেরকে কফি দিতে গিয়েছিলাম।' জবাব দিল স্টুয়ার্ডেস।

'কোনো সমস্যা?'

'না।'

জসের দিকে ইশারা করতে সে আমার পেছন পেছন চলে এল ফুড টানেলে। আমি সরাসরি বললাম, 'বাইরে কেউ একজন কিছুক্ষণ আগে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল।'

'আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিল!' বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল জস। তারপর চিন্তান্বিত গলায় বলল, 'ওয়েল, এতে অবশ্য আমি তেমন অবাক হচ্ছি না... এই লোকগুলো যা খুশি করতে

পারে।'

'মানে?'

'কেউ আমাদের গোলাবারুদ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছে।'

'গোলাবারুদ!' এক মুহূর্তের জন্য মানসচক্ষে দেখলাম এক উন্মাদ আমাদের ট্রান্সটরটি উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। 'ওরা কী নিয়েছে?'

'কিছুই নেয়নি। সেটাই তো আশ্চর্যের কথা। এক্সপ্লোসিভ কিছুই খোয়া যায়নি তবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হয়েছে, ফিউজের তারগুলো আমাদের অন্যান্য ইকুইপমেন্টের সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে রেখেছে... সে যাকগে, আপনার ঘটনাটা কী বলুন?

বললাম ওকে, জসের মুখ শক্ত হয়ে গেল। 'আমাদের মধ্যে ঠাণ্ডা রক্তের এবং অত্যন্ত হিসেবি একজন খুনি আছে!' মৃদু গলায় বলল ও। 'কিন্তু আমাদের হাতে কোনো প্রমাণ নেই, জানেনই তো।'

'প্রমাণ পাব, বললাম আমি। এক্ষুনি।'

কেবিনে ফিরে স্টুয়ার্ডেসের কাছে গেলাম সরাসরি। 'আমার সঙ্গে তোমাকে একটু প্লেনে যেতে হবে, মিস রস।' শীতল গলায় বললাম আমি, 'প্লেনে কিছু খাবার পড়ে আছে। ওগুলো নিয়ে আসা দরকার।'

প্লেনে যেতে দশ মিনিট সময় লাগল। এ মুহূর্তে তুষারপাত অতটা ভারী নয় এবং বেশ অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যাচ্ছে আমাদের। গন্তব্যে পৌঁছে উইন্ডস্ক্রিনের দিকে হাত তুলে দেখালাম।

'আগে তুমি, মিস রস, 'বললাম আমি,' 'ওপরে ওঠো,' 'কিন্তু উঠব কী করে?' অসহায় গলায় বলল সে মাথার ওপরে উইন্ডস্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে।

'আগে যেভাবে উঠেছিলে,' ভয়ঙ্কর গলায় বললাম আমি। লাফ দেওয়ার চেষ্টা করল সে তবে উইন্ডস্ক্রিনের ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারল না। আবার চেষ্টা করল। এবারো ব্যর্থ হল। তৃতীয়বার লাফানোর সময় ওকে নিচ থেকে তুলে ধরলাম আমি যাতে হাত দিয়ে উইন্ডস্ক্রিন ধরতে পারে। নিজেকে খানিকটা ওপরে টেনে তুলল স্টুয়ার্ডেস কিন্তু পরক্ষণে ব্যথায় কাতরে উঠে হাত ছেড়ে দিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। ধীরে, যন্ত্রণা কাতর চেহারা নিয়ে সিধে হল সে, তাকাল আমার দিকে। কী অসাধারণ অভিনেত্রী, ভাবলাম আমি। কী দারুণ অভিনয়।

'আমি পারব না,' কাঁপা গলায় বলল সে, 'আমি আপনাকে আগেই বলেছিলাম আমি পারব না। আপনি আমার সঙ্গে এরকম করছেন কেন?' ঘুরে দাঁড়াল ও, 'আমি কেবিনে গেলাম।'

'না, যেতে পারবে না!' খপ করে স্টুয়ার্ডেসের হাত চেপে ধরলাম আমি, 'এখানেই থাকবে তুমি যাতে তোমার ওপর নজর রাখতে পারি।'

আমি লাফিয়ে উঠে গেলাম প্লেনে, উইন্ডস্ক্রিনের ফাঁক দিয়ে ঢুকলাম ভেতরে। তারপর ওকে টেনে তুললাম। ওকে নিয়ে চলে এলাম কিচেনে। রাগত গলায় বললাম, 'প্যাসেঞ্জারদের ড্রাগ খাওয়ানোর সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা তাই না, মিস রস?'

'কা-কী বলছেন বুঝতে পারলাম না।'

'বুঝতে পারনি? তাহলে বলো প্লেন ক্র্যাশ হওয়ার সময় যে ধাতব খণ্ডে আঘাত লেগে তোমার পিঠ চিরে গিয়েছিল সেটা কোথায়?'

'আ... আমি জানি না,' বলল ও। 'এসব কী হচ্ছে? আমার সত্যি কিছু বোধগম্য হচ্ছে না।'

ওর হাত ধরে টানতে টানতে রেডিও কম্পার্টমেন্টে নিয়ে এলাম, রেডিও কিবেনেটের ওপর ফেললাম টর্চের আলো। 'রক্ত, মিস রস,' বললাম। 'তোমার পিঠের রক্ত। আর নেভি ব্লু রঙের এই সুতোগুলো তোমার ইউনিফর্মের। প্লেন ক্র্যাশ হওয়ার সময় তুমি এখানে দাঁড়িয়েছিলে। তবে তুমিও আঘাত পেয়েছিলে। কিন্তু তোমার হাতে তখন একটি অস্ত্র ছিল।'

নীরবতা।

'একটা সুযোগ হারালে, মিস রস। তোমার বলা উচিত ছিল কীসের অস্ত্র? বেশ, আমিই ব্যাখ্যা দিচ্ছি। যে অস্ত্রটি তুমি রেডিও অপারেটরের দিকে তাক করে রেখেছিলে। দুঃখের বিষয়, তুমি তখন তাকে হত্যা করতে পারনি। তবে পরে কাজটা বেশ ভালোভাবেই সমাধা করেছ। লোকটাকে বালিশ দিয়ে চেপে শ্বাসরোধ করে মেরেছ।'

'বালিশ?' ওর বাদামি চক্ষুজোড়া ভয়ে বিস্ফারিত হল।

'হ্যাঁ। গত রাতে কেবিনে তুমি ওই যুবককে হত্যা করেছ।'

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' ফিসফিস করল স্টুয়ার্ডেস। 'একদম উন্মাদ বনে গেছেন আপনি।'

জবাবে আমি ওকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে এলাম প্লেনের সামনে যেখানে লাশ হয়ে বসে আছেন ক্যাপ্টেন। আমি তাঁর জ্যাকেট খুলে নিয়ে পিঠে গুলির চিহ্ন দেখালাম। 'তুমি নিশ্চয় এ বিষয়টি সম্পর্কেও জানো?'

আমি কথা বলছি, জ্ঞান হারিয়ে, দলা-মোচড়া হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল স্টুয়ার্ডেস। আরেকটি দারুণ অভিনয়। আমি ভাবলাম এক মুহূর্তের জন্য। কিন্তু ওটি কোনো অভিনয় ছিল না। সত্যি সত্যি অজ্ঞান হয়ে গেছে

মার্গারেট রস।

পরবর্তী কয়েক মিনিট কী যে অপরাধবোধে ভুগছিলাম আমি তা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত। নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল আমার, ঘৃণাও হচ্ছিল খুব। মেঝেয় অচেতন হয়ে পড়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবছিলাম আমি এমন নির্বোধ হলাম কি করে। আমার মাথায় কেন এ বোধটা এল না যে পিঠে এমন মারাত্মক ইনজুরি নিয়ে মার্গারেটের পক্ষে লাফ মেরে প্লেনে ওঠা অসম্ভব? লাফ দেওয়ার মতো শক্তিও ওর নেই। তাছাড়া ও ততটা লম্বাও নয় যে একলাফে প্লেনের জানালা ধরে ফেলবে। আমি আসলে রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

মার্গারেট চোখ মেলে তাকাতে ওকে মোলায়েম স্বরে বললাম, 'ইটস অলরাইট, মিস রস। আমি পাগল নই, আসলে একটা নির্বোধ। আমি যা বলেছি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি। আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ।'

মনে হল না আমার একটা কথাও ওর কানে গেছে। ওর মাথায় তখন শুধু একটি চিন্তাই ছিল। 'খুন!' চিৎকার দিল মার্গারেট। 'ও খুন হয়েছে! কে... কে ওকে খুন করল?'

'আমি জানি না। শুধু জানি ওর সঙ্গে তোমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। তবে খুনি একজনকে নয়, তিনজনকে খুন করেছে– সে হত্যা করেছে ক্যাপ্টেনকে, কর্নেল হ্যারিসনকে এবং রেডিও অপারেটরকে।'

শিউরে উঠল মার্গারেট। শীতে নয়, ভয়ে। 'আমার ভয় লাগছে, ড. ম্যাসন... আমার ভয় করছে।' শুধু এ কথাটাই বারবার বলল ও। আমি ওকে খুনিকে নিয়ে চিন্তা করতে বারণ করলাম, তবে সে অন্য কিছুর কথা ভাবতেই পারছিল না। 'ক্র্যাশের আগে আমাকে রেডিও কম্পার্টমেন্টে কেন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?'

'সম্ভবত এ কারণে যে যাতে কেউ একজন তোমার দিকে বন্দুক তাক করে হুমকি দিতে পারে রেডিও অপারেটর ওই লোকের কথামতো কাজ না করলে তোমাকে মেরে ফেলা হবে।' বললাম আমি।

'তাহলে ওখানে কে ছিল?' বলে চলল মার্গারেট। আমার চেহারায় বিমূঢ়ভাব ফুটে উঠতে দেখে যোগ করল, 'ব্যাপারটি আপনি বুঝতে পারছেন না? কেউ যদি জিমি মানে রেডিও অপারেটরের দিকে বন্দুক তাক করে রাখে, তাহলে অপর কেউ একজন ক্যাপ্টেন জনসনের দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে রেখেছিল। একজন মানুষ একইসঙ্গে তো আর দুই জায়গার দুজন লোককে কাভার দিতে পারে না।'

নিজের নির্বুদ্ধিতাকে আবারো গালাগাল করলাম আমি। এ ভাবনাটি আগে মাথায় আসেনি কেন? প্লেনে নিশ্চয় দুজন মানুষ দুই জায়গায় অস্ত্র হাতে ছিল। গুড গড, এ যে মারাত্মক কথা! কেবিনের কজন মানুষের মধ্যে দুজন রয়েছে নির্দয় নির্মম খুনি, প্রয়োজনে হত্যা করতে যাদের চোখের পাতাও কাঁপে না। আর এরা কারা সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই।

ভয়ানক এই চিন্তাগুলো আমাকে স্তব্ধ করে দিল। 'জানি আপনি কি ভাবছেন,' বলল মেয়েটি। তার কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক শান্ত। 'এ মুহূর্তে সবাইকে সন্দেহ করছেন আপনি, আমাকেসহ। বেশ তো, এটা দেখুন,' সে তার বাম হাতের অনামিকা থেকে একটি আংটি খুলে নিল। 'এটা আমার এনগেজমেন্ট রিং। ক্রিসমাসের সময় জিমির সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। এখন আমাকে আপনার বিশ্বাস হয়?'

গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই প্রথম আমি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন আচরণ করলাম। আমি কিছুই বললাম না। বসে বসে দেখলাম মেয়েটির গাল বেয়ে অশ্রু ঝরছে। হাতের মধ্যে মাথা গুঁজল ও, আমি ওকে হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিলাম। ও আমার ফারের জ্যাকেটে মুখ লুকিয়ে হু হু করে কেঁদে উঠল। যেন ওর হৃদয়টা ভেঙে টুকরো হয়ে গেছে।

ঠিক ওই সময়টা হয়তো ওর প্রেমে পড়ে যাওয়ার জন্য সেরা মুহূর্ত ছিল। প্রেম তো আর বলেকয়ে আসে না, সুবিধাজনক সময়ের জন্য অপেক্ষাও করে না। প্রেম হঠাৎ হয়ে যায়। চার বছর আগে, আমার স্ত্রী গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পর আমি কোনো নারীকে নিয়ে আর চিন্তা করিনি। তখন থেকে নিঃসঙ্গ জীবনযাপন চলছে আমার, বিচ্ছিন্ন সব জায়গায় কাজ করছি, নারীসঙ্গ থেকে সম্পূর্ণই বঞ্চিত আমি। আর এখন, যে আবেগ-অনুভূতিগুলো ভেবেছিলাম বহু আগেই মরে গেছে, সেগুলো জ্যান্ত হয়ে লাথি ছুড়তে শুরু করেছে আমায়। আমার কাঁধে কালো চুলের যে মাথাটি রাখা আছে সেটির দিকে তাকিয়ে আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন করতে লাগল। তবে ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দিতে পারব না আমি। সে চেষ্টাও করব না।

কিছুক্ষণ পর কান্না থামাল মার্গারেট। বিড়বিড় করল, 'আমি দুঃখিত।' গ্লাভস দিয়ে চোখ মুছল। তারপর বলল, 'এখন আমরা কী করব, ড. ম্যাসন? এখন তো জানি প্লেন ক্র্যাশটা নিছক কোনো দুর্ঘটনা ছিল না, বন্দুকের মুখে ক্র্যাশটা করানো হয়েছে।'

'যদি জানতাম এখন আমাদের কী করা উচিত,' বললাম আমি।

'কিন্তু ওরা কর্নেল হ্যারিসনকে কেন হত্যা করল?' জিজ্ঞেস করল মার্গারেট।

'হয়তো তাঁর ড্রিংকে মেশানো ড্রাগ ভালোভাবে কাজ করেনি। হয়তো তিনি অনেক কিছু দেখে ফেলেছিলেন কিংবা জেনে ফেলেছিলেন।'

'কিন্তু এখন আপনিও তো অনেক কিছু দেখে ফেলেছেন– জেনে ফেলেছেন!' চিন্তিত গলায় বলল ও। 'এখান থেকে জলদি চলুন যাই। আমার কেমন ভয় লাগছে।'

ওর কথা মাত্র শেষ হয়েছে বাইরে, একটা শব্দ শুনতে পেলাম– প্লেনের গায়ে কে যেন টোকা মারছে। আমি পিস্তল আর টর্চ জ্বালিয়ে ধরে উইন্ডস্ক্রিনের ফাঁক দিয়ে লাফিয়ে নামলাম জমিনে। কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু বাতাসের শব্দ ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ নেই। টর্চ জ্বালিয়ে প্লেনের চারপাশে একবার চক্কর দিলাম। কিন্তু কাউকে বা কিছু দেখতে পেলাম না। মার্গারেটকে মৃদু গলায় ডাক দিলাম। সে উইন্ডস্ক্রিনের সামনে উদয় হল। 'সব ঠিক আছে। আমরা ভুল শুনেছি। নেমে এসো।'

'আপনি আমাকে এখানে একা রেখে চলে গেলেন কেন?' আতঙ্কে গলা কাঁপছে ওর। 'এখানে কতগুলো লাশের মাঝে... কী ভয়ঙ্কর। আপনি আমাকে রেখে কেন চলে গেলেন?'

'আমি দুঃখিত। অত কিছু ভাবার সময় আসলে ছিল না।' ওকে জড়িয়ে ধরলাম আমি, সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করলাম, তারপর দুজনে মিলে ফিরে এলাম কেবিনে।

ছয়

সোমবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৭টা

আমরা এসে দেখি জ্যাকস্ট্র এবং অন্যরা ট্রাক্টরের কাজ শেষ করে ফেলেছে। প্রথম সুযোগেই জ্যাকস্ট্রকে নিয়ে বাইরে গেলাম আমি, কী ঘটেছে খুলে বললাম সব।

'তাহলে আমাদের করণীয় কী, ড. ম্যাসন?'

'একটু ঘুমিয়ে নিয়েই যত দ্রুত সম্ভব যাত্রা করব।'

'আপলাভনিকের উদ্দেশে?' উপকূলে ওখানেই আমাদের মূল সায়েন্টিফিক স্টেশন। 'আমরা কি আদৌ ওখানে পৌঁছাতে পারব?'

জানি ও কী চিন্তা করছে। সুমেরু অঞ্চলের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত একদল লোককে পুরনো এবং অনির্ভরযোগ্য একটি ট্রাক্টরে নিয়ে ভ্রমণ করাটাই দারুণ ঝুঁকিপূর্ণ, তায় এদের মধ্যে ঘাপটি মেরে রয়েছে দুজন খুনি। ফলে বিপদের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে দ্বিগুণ। আমরা আদৌ আপলাভনিক পৌঁছতে পারব কি না তা-ই সন্দেহ। একেবারে নিম্নবুদ্ধির মানুষও বুঝতে পারবে ওই দুই খুনি যে কোনোভাবেই হোক পুলিশি তদন্ত এবং কারাবাস এড়িয়ে যেতে চাইবে। আর তারা যদি আমাদের সবাইকে মেরে ফেলে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগবে শুধু তারা দুজন কীভাবে বেঁচে রইল। কাজেই তারা আমাদেরকে মেরে পালিয়ে যাবে, যাতে পুলিশি জেরার মুখে পড়তে না হয়।

'আমি ঠিক জানি না,' জবাব দিলাম আমি। 'তবে এটা জানি এখানে বসে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে। তবে রওনা হবার আগে আরেকবার চেষ্টা করে দেখব খুনিদের পরিচয় বের করতে পারি কি না...' আমি কী করতে চাই বুঝিয়ে বললাম ওকে। রাজি হয়ে গেল জ্যাকস্ট্র।

কেবিনে ফিরে এসে আমি নজন যাত্রীর সবার ওপরে এক এক করে সতর্ক নজর বুলালাম। এদের মধ্যে খুনি কারা সিদ্ধান্ত নেয়া মোটেই সহজ

নয়। পরতে পরতে কাপড় চাপিয়েছে তারা শরীরে, সবার চেহারাই কেমন বদলে গেছে, অন্য জগতের মানুষ মনে হচ্ছে। প্রথম দর্শনে মনে হয় এদের যে কেউই হত্যাকারী হতে পারে; কিন্তু দ্বিতীয়বার তাকালে মায়া লাগে। কারণ চোখে দেখতে পাই শীতে থরথর করে কাঁপতে থাকা অসহায় এবং খুব সাধারণ কতগুলো মানুষ।

কিন্তু তারা কি সত্যি খুব সাধারণ? এক এক করে এদেরকে পরখ করলাম। যাগেরো– ওকি সত্যি বক্সার? মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো তাগদ এবং শক্তি আছে ওর গায়ে, তবে মনে হয় ছেলেটা খুব বেশি শিক্ষিত আর বক্সারদের মতো কাটাকুটির কোনো চিহ্নও নেই চেহারায়।

আর ওর ম্যানেজার সলি লেভিনের ব্যাপারটাই বা কী? একজন বক্সিং ম্যানেজারের সবরকম বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে আছে– তবে একটু বেশি মাত্রায় আছে বলে মনে হচ্ছে। একই কথা প্রযোজ্য রেভারেন্ড স্মলউডের ক্ষেত্রেও। সে বিনয়ী, চুপচাপ এবং বেশ নার্ভাস– টিপিকাল একজন ধর্মযাজক। তবে দুজনই বড্ড টিপিকাল বলে আমার সন্দেহ লাগছে বেশি।

কোরাজ্জিনিও একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন। সন্দেহ নেই সে বেশ কর্মঠ এবং বুদ্ধিমান একজন ব্যবসায়ী, তবে ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে জিনিসটা সাধারণত অনুপস্থিত, শারীরিকভাবে অনেক বেশি শক্ত কোরাজ্জিনি। একে টিপিকাল পর্যায়ে ফেলা যায়নি বলে তাকেও আমার সন্দেহ হচ্ছে।

পুরুষদের মধ্যে আর বাকি রইল দুজন– থিওডর মহিলার এবং সিনেটর ব্রুস্টার। মাহলারকে নিয়ে আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল তা শুধু তার রোগপাতলা গড়ন এবং নিজের সম্পর্কে কিছু খোলাসা না করার কারণে।

আর সিনেটর ব্রুস্টার। ইনি কি সত্যি নিরপরাধ? হঠাৎ চিন্তাটা মাথায় এল। আমি কী করে জানব ইনি সত্যিকারের সিনেটর ব্রুস্টার কি না? যে কেউ মুখে ওরকম একটি গোঁফ গজিয়ে নিজেকে মধ্যবয়স্ক সিনেটর বলে দাবি করতে পারে।

আমার চিন্তা-ভাবনাগুলো কেমন ঘোট পাকিয়ে যাচ্ছিল। মহিলাদের কথা ভাবছিলাম আমি। তরুণী মেয়েটি, হেলেন, বলেছিল সে মিউনিখ থেকে এসেছে। সে কি কোনো রাজনৈতিক বা অপরাধ দলের সদস্য হতে পারে? যদিও মেয়েটির বয়স মাত্র সতেরো।

আর মিসেস ডানসবি গ্রেগ? হাই সোসাইটির মানুষ আর ওই সমাজের সদস্যরা আমার কাছে একেবারেই অচেনা। মহিলা খুবই স্বার্থপর এবং আবেগশূন্য টাইপের। তবে পেশাদার খুনিদের কাঠিন্য এবং দৃঢ়তা তার মাঝে অনুপস্থিত। আমার অন্তত তাই ধারণা। আমার অবশ্য ভুলও হতে পারে।

বাকি রইলেন শুধু মেরি লিগার্ড। ওনাকে নিয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। উনি সকল সন্দেহের উর্ধ্বে।

বুঝতে পারলাম সবাই আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রয়েছে। ওরা নিশ্চয় খেয়াল করেছে আমি ওদেরকে এক এক করে লক্ষ করছি। এমন সময় কেবিনে ঢুকল জ্যাকস্ট্র হাতে রাইফেল নিয়ে। তাকে কেউ খেয়াল করেনি আমার দিকে সবার নজর ছিল বলে।

সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আমি জ্যাকস্ট্রর দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, 'হ্যাঁ। আমরা এক্সপিডিশনে সর্বদা রাইফেল বহন করি নেকড়ে কিংবা অন্যান্য বুনো জন্তুদের হামলার ভয়ে। রাইফেলে জ্যাকস্ট্রর তাক খুব ভালো। কাজেই আপনারা সবাই হাত তুলুন।'

কথা বলতে বলতে কর্নেল হ্যারিসনের পিস্তলটা পকেট থেকে বের করলাম আমি। সবার আগে প্রতিক্রিয়া দেখালেন সিনেটর ব্রুস্টার। লাফিয়ে উঠলেন তিনি, রাগে লাল মুখ, চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনি এসব কী হাস্যকর খেলা শুরু করেছেন?'

সঙ্গে সঙ্গে জবান বন্ধ হয়ে গেল তার রাইফেলের বিকট শব্দে। জ্যাকস্ট্র গুলি করেছে। ধোঁয়া উবে যেতে দেখলাম যেখানে সিনেটর বসেছিলেন তার পাশে কাঠের মেঝেতে বুলেটের আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে ফুটো। রীতিমতো ভ্যাবাচাকা খেয়ে আবার বসে পড়লেন সিনেটর, ঘরে পিনপতন নীরবতা। এখন আর কারো মনে সন্দেহ নেই যে, আমরা কোনোরকম হাসিঠাট্টা করছি না। হাত ওপরে তুলে রেখে যাগেরো বলল, 'ঠিক আছে, ডক্টর, বুঝতে পারছি আপনি খুব সিরিয়াস। কিন্তু এসবের অর্থ কী ব্যাখা করবেন কি দয়া করে?'

'অর্থ খুবই সাধারণ,' জবাব দিলাম আমি। 'আপনাদের মধ্যে দুজন খুনী আছে। তাদের কাছে অস্ত্র আছে। আমি ওই অস্ত্রগুলো চাই।'

'মাই ডিয়ার ম্যান,' ধীরে ধীরে বললেন মেরি লিগার্ড, 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে?'

'একদমই না,' শান্ত গলায় বললাম আমি। 'আপনারা প্রমাণ চাইলে প্লেনে গেলেই তা দেখতে পাবেন। ক্যাপ্টেন পিঠে গুলি খেয়ে মরেছেন। একজন যাত্রীর বুকে গুলি করা হয়েছে। আর বাইরে আইসক্যাপে নজর দেয়া রেডিও অপারেটর জিমিকে ঘুমের মধ্যে হত্যা করেছে হত্যাকারীরা। হ্যাঁ তাকেও খুন করা হয়েছে। ব্রেন ইনজুরিতে সে মারা যায়নি। এখানে, এই কেবিনের মধ্যে তাকে বালিশচাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে কেউ। এখন আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে, মিস লিগার্ড?'

তিনি কোনো জবাব দিলেন না। কেউই কোনো কথা বলছে না। স্তম্ভিত

বিস্ময়ে বসে আছে সবাই। আমি তাদের চেহারা দেখছি, অপরাধের চিহ্ন খুঁজছি মুখে; কিন্তু সেরকম কিছুই পেলাম না কারো অবয়বে। হত্যাকারীরা যে-ই হোক, নিজেদের ওপর তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

'আপনারা এখন একজন একজন করে উঠে দাঁড়াবেন', বললাম আমি। 'জস আপনাদেরকে সার্চ করবে অস্ত্রের জন্য। দাঁড়ানো অবস্থায় একদমই নড়াচড়া করবেন না। একটু নড়েছেন কী মরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে গুলি করব আমি।'

প্রথমে সার্চ করা হল যাগেরোকে; কিন্তু তার কাছে পাওয়া গেল না কিছুই। তারপর এক এক করে অন্য সবার শরীর তল্লাশি করলাম আমরা। কারো কাছেই কোনো অস্ত্র নেই।

'এরপর আপনাদের লাগেজ তল্লাশি করা হবে,' ঘোষণা করলাম আমি।

কোরাজ্জিনি বলে উঠল, 'আপনি খামোকা সময় নষ্ট করছেন, ড. ম্যাসন। কেউ চোখের সামনে অস্ত্র লুকিয়ে রাখবেন না।'

'তা হতে পারে।' বললাম আমি। 'তবু আমি কোনো ঝুঁকিতে যাব না।'

'ঠিক আছে,' দ্রুত বলল সে। 'তাহলে কার ব্যাগ দিয়ে আপনি শুরু করবেন? আমার ব্যাগটা ওই যে ওখানে, বাদামি রঙের ব্যাগ'– থেমে গেল সে, সিলিং-এর ছোট জানালার দিকে তাকিয়ে তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। 'গুড গড।' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'ওখানে ঘটছে কী?'

'কোনোরকম চালাকির চেষ্টা করবেন না, কোরাজ্জিনি,' বললাম আমি। 'আমাদের অস্ত্রগুলোর কথা ভুলে যাবেন না যেন।'

'আপনাদের অস্ত্র জাহান্নামে যাক!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'নিজেই দেখুন না কি হচ্ছে।'

সে সরে দাঁড়ালো। আমি জানালা দিয়ে তাকালাম বাইরে। দুই সেকেন্ড পরে আমার পিস্তলটা জসের হাতে গুঁজে দিয়ে ট্রাপডোর খুলে বেরিয়ে এলাম।

অন্ধকার রাতে মশালের মতো জ্বলছে প্লেন। আগুনের পরিষ্কার একটি স্তম্ভ, ধোঁয়াহীন প্লেনের শরীরের ঠিক মাঝখান দিয়ে বেরিয়েছে। আশপাশের বরফ রক্তলাল দেখাচ্ছে লেলিহান শিখায়, শোঁ শোঁ গর্জন ছাড়ছে। অকস্মাৎ আগুনের স্তম্ভটি সাদা রঙ ধারণ করল, এক লাফে দুই-তিনগুণ উঁচুতে উঠে গেল, তারপর, কয়েক সেকেন্ড বাদে বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হল পেট্রল ট্যাংক।

আগুনের শিখা স্তিমিত হয়ে আসছে, আর কিছু দেখার ছিল না। আমি ট্রাপডোর বেয়ে নেমে এলাম কেবিনে।

'প্লেনটা গেছে,' ঘরের ভেতরের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললাম।

কোরাজ্জিনি মন্তব্য করল, 'তার মানে আপনার প্রমাণও সেই সঙ্গে মুছে গেল। তাই না? ক্যাপ্টেন এবং কর্নেল হ্যারিসনের কথা বলছি।'

'না, কোনো কারণে প্লেনের নাক এবং লেজ আগুনের কবল থেকে রেহাই পেয়েছে... আমরা এখন আর ব্যাগ সার্চের ঝামেলায় যাব না, মি. কোরাজ্জিনি। এই ক্রিমিনালগুলো প্রফেশনাল। ঠিকই বলেছেন তারা দৃষ্টির গোচরে তাদের অস্ত্র লুকিয়ে রাখবে না।'

'বেশ,' বলল জস। 'প্লেনে আগুন লাগার ঘটনা থেকে একটা জিনিস অন্তত পরিষ্কার হয়ে গেল।'

'এক্সপ্লোসিভের কথা বলছ? হ্যাঁ ওরা প্লেনে আগুন লাগাতে আমাদের মালমসলা ব্যবহার করেছে।

'এক্সপ্লোসিভগুলো ছড়ানো ছিটানো ছিল তাই লক্ষ্য করিনি ফিউজের তার খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'এই এক্সপ্লোসিভের ব্যাপারটা কী?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর ব্রুস্টার। জ্যাকস্ট্র গুলি করে তাঁকে ভড়কে দেয়ার পর এই প্রথম কথা বললেন তিনি।

'কেউ আমাদের গোলাবারুদের রসদ থেকে কিছু ফিউজের তার চুরি করেছে প্লেনে আগুন দিতে,' ব্যাখ্যা করলাম আমি। 'কাজটা যে কেউ করতে পারে– এমনকি আপনিও সন্দেহমুক্ত নন। আমি শুধু এটুকুই জানি, যে লোক হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী সে-ই রেডিওটি অকেজো করে রেখেছে এবং ফিউজের তার চুরি করেছে।'

'এবং চুরি করেছে চিনি,' যোগ করল জস। ঈশ্বর জানেন ওরা চিনি দিয়ে কী করবে।

ঘটনাক্রমে থিওডর মাহলারের দিকে চোখ চলে গিয়েছিল আমার। দেখলাম চিনির কথা শুনে সে লাফ দিয়ে উঠল। আমি জানি আমি ভুল দেখিনি। তবে সে আমাকে লক্ষ করার আগেই চট করে মাথাটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলাম।

জস বলে চলল, 'ওটা ছিল আমাদের সঞ্চিত সর্বশেষ চিনির ব্যাগ, চোদ্দ কিলো ওজন। কিন্তু টানেলের মেঝেয় অন্যান্য রসদের সঙ্গে অল্প কিছু চিনি পড়ে থাকতে দেখেছি আমি। বাকি চিনি গায়েব!'

সাপারটা জমল না মোটেই। কারণ খাবারের পরিমাণ ছিল নিতান্তই অপ্রতুল– শুধু সুপ, কফি আর কিছু ড্রাই কেক। কেউ কোনো কথা না বলে চুপচাপ খেয়ে নিল। সবাই ভয়ে আছে। প্রত্যেকের মনে একটাই চিন্তা কাজ করছে– তার পাশে বসা মানুষটি হয়তো খুনি।

খাবার শেষে আমি আমার আসন থেকে উঠে গেলাম। জস আর জ্যাকস্ট্রকে বললাম সঙ্গে আসতে। ট্রাপডোরে পা বাড়ালাম। বাইরে বন্ধ

হয়ে গেছে তুষারপাত। বাতাসও নিস্তেজ। পরিষ্কার আকাশে ঝলমলে আলো বিলোচ্ছে চাঁদ।

ট্রাভেলার্স মুন', মন্তব্য করলাম আমি।

'হ্যাঁ' সায় দিল জ্যাকস্ট্র। 'যাত্রা করার জন্য যথার্থ আবহাওয়া। আমাদের আর সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। তাড়াতাড়ি রওনা করা দরকার।'

আমি জসের দিকে ফিরলাম। 'তুমি একা থাকতে পারবে তো?'

'পারব। তবে আমি আসলে হয় না?

'না, আমি দুঃখিত। কাউকে না কাউকে এখানে থাকতেই হবে।

টর্চের নিষ্প্রভ আলোয় ট্রাক্টর আর স্লেজ খুঁজে দেখলাম কোথাও বন্দুক লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি না। প্রতিটি কোনাকাঞ্চি খুঁজে দেখলাম। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। হতাশ হয়ে কেবিনে ফিরে এলাম। আমাদের যাত্রার কথা ঘোষণা করলাম। 'আপনারা আপনাদের জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিন। আর গায়ে যত পারবেন গরম কাপড় চাপিয়ে নেবেন। আমরা এখন রওনা হবো।'

ট্রাক্টরের ইঞ্জিন চালু হতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। অবশেষে জসকে বিদায় জানালাম আমরা। সে কেবিনে একা দাঁড়িয়ে রইল। জানি না ওর সঙ্গে আবার মোলাকাত হবে কি না। ও-ও নিশ্চয় একই কথা ভাবছিল।

গাড়ি চালাচ্ছি আমি, পাশে বসে আছে জ্যাকস্ট্র। চুপচাপ তবে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ চেহারায়। আইসক্যাপের ওপর নজর রেখে চলেছে, বরফের কোনো পরিবর্তন চোখে পড়লে সাবধান করে দেবে আমাকে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে।

ট্রাক্টরের পেছনে কাঠের কেবিনে বসে শীতে কাঁপছে ওরা দশজন। ওদের পেছন পেছন আসছে ট্রাক্টর স্লেজ। ওতে রয়েছে খাবার, তাঁবু এবং নানান ইকুপমেন্ট। স্লেজের পেছনে কুকুরদের স্লেজ। বাল্টো ছাড়া বাকি সবগুলো কুকুরকে জুতে দেয়া হয়েছে এ স্লেজে। সর্দার কুকুর বাল্টোকে কখনো বেঁধে রাখা হয় না। সে সবসময় মুক্ত থাকে, বরফে ওঁৎ পেতে থাকা বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দেয় জ্যাকস্ট্রকে।

প্রথম তিন কিলোমিটার রাস্তা নির্বিঘ্নে পার হলাম। রাস্তা চলতে সমস্যা হচ্ছিল না, কারণ উপকূলে আমাদের গত যাত্রার সময় বেশ কিছু বড় বড় পতাকা পুঁতে রেখেছিলাম বরফে। ওই পতাকাগুলো আমাদেরকে পথ দেখাচ্ছিল। মোট আটাশটা পতাকা দেখলাম, হঠাৎ করেই লাপাত্তা বাকিগুলো– নিশ্চয় উড়িয়ে নিয়ে গেছে বাতাসে।

'এখন থেকে আমাদের যাত্রা আরো কঠিন হয়ে উঠল,' জ্যাকস্ট্রকে

বললাম আমি। 'সঠিক পথ পেতে হলে আমাদেরকে কম্পাস ব্যবহার করতে হবে। আমাদের একজন কম্পাসসহ কুকুরে টানা কাঠের স্লেজে থাকবে। ওটা ট্রাক্টর থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে। ট্রাক্টরে কম্পাস কোনো কাজে লাগবে না। জ্যাকস্ট্র স্লেজে ওঠার পরে আমি ঢুকলাম ট্রাক্টর কেবিনে, দুর্দশাগ্রস্ত দশ বাসিন্দার দিকে তাকালাম। তাদের মুখ ফ্যাকাশে, সবাই শীতে বেদম কাঁপছে।

'দেরির জন্য দুঃখিত,' বললাম আমি। 'আমার সঙ্গে একজনকে লাগবে লুকআউট হিসেবে। আপনি আসতে পারবেন, মি. মাহলার?' তাকালাম তার দিকে। নিঃশব্দে মাথা দোলাল সে। আমার সঙ্গে চলে এল ড্রাইভিং কেবিনে।

এ লোকটি এমনিতে চুপচাপ দেখলেও যখন কথা বলতে শুরু করল, অনর্গল বকে গেল। জানাল সে একজন রাশান ইহুদি, বাবার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল দেশ থেকে। তারপর সে আমেরিকায় যায়, নিউইয়র্কে একটি পোশাকের কারখানায় কাজ খুঁজে নেয়। পরে সে একটি তেলের কোম্পানিতে কাজ করেছে। তার স্ত্রী মারা গেছে। সে এখন তার স্বপ্নের দেশ ইসরায়েলে বাস করতে চায়।

একটি করুণ গল্প, যার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে কষ্ট আর প্রবল দুর্ভোগের কথা। যদিও আমি তার একটি কথাও বিশ্বাস করিনি।

চাঁদ ডুবে গেল, গাড়ি থামালাম। আমাদের যাত্রীরা চিনি ছাড়া কালো কফি পান করছে, তাদেরকে বললাম আমরা তিন ঘণ্টার জন্য একটি যাত্রাবিরতি দেব। আমার পাশে বসা থিওডর মাহলার কথাটা শুনে নার্ভাস হয়ে পড়ল। আমি কফি শেষ করে তার কানে কানে বললাম তার সঙ্গে একাকী কিছু কথা আছে আমার। অবাক চোখে তাকাল সে আমার দিকে। তবে কিছু না বলে আমার পেছন পেছন বেরিয়ে এল অন্ধকারে।

ট্রাক্টর থেকে শ মিটার গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি, টর্চ জ্বেলে নিয়ে পকেট থেকে বের করলাম পিস্তল। আঁতকে উঠল মাহলার, ভয়ে বিস্ফারিত চোখ।

'কোনো চালাকি নয়, মাহলার,' বললাম আমি, 'তোমার অস্ত্রটা আমাকে দিয়ে দাও।'

সাত

মঙ্গলবার সকাল ৭টা থেকে মঙ্গলবার মধ্যরাত

শূন্যে হাত ছুড়ল মাহলার। 'অস্ত্র? কীসের অস্ত্র? আ... আমি আপনার কথা কিছু বুঝতে পারছি না। আমার কাছে কোনো অস্ত্রটস্ত্র নেই।'

'ঘোরো' হুকুম করলাম আমি। মাহলার ঘুরে দাঁড়াতেই ওর পিঠে পিস্তল ঠেকিয়ে দ্রুত শরীর সার্চ করে নিলাম। কিন্তু পেলাম না কিছুই।

'এখন খুশি তো, ড. ম্যাসন?'

'না তোমার বাক্সে কোনো অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছ কি না দেখতে হবে আমাকে। তাছাড়া, তোমাকে সন্দেহ করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ আমার কাছে আছে।' বলে ওর পকেট থেকে বের করে নেয়া চিনির থলে দুটোকে দেখালাম। 'এর ব্যাখ্যা কী, মি. মাহলার?' আবার 'আপনি' সম্বোধন ফিরে ফিরে গেলাম আমি।

'এ জিনিস কোথায় পেয়েছি বুঝতেই পারছেন,' জবাব দিল সে। 'চুরি করেছি।'

'সে তো বুঝতেই পারছি। ছোট একটি ভুল আপনার সমস্ত অপরাধ ফাঁস করে দিল। আপনার দুর্ভাগ্য জস যখন চিনি চুরি যাওয়ার কথা বলছিল তখন হঠাৎ আপনার দিকে চোখ চলে যায় আমার। আপনাকে আমি চমকে উঠতে দেখেছি। আপনার আরো দুর্ভাগ্য আমরা যখন কফি পান করছিলাম তখন আপনার কফির কাপে চুমুক দিয়ে আমার গা গুলিয়ে উঠেছিল। ভীষণ মিষ্টি! বাকি চিনি দিয়ে কী করেছেন?'

'আপনি ভুল করেছেন, ড. ম্যাসন। অল্প কিছু চিনি নিয়ে ব্যাগটা যেমন ছিল তেমনই রেখে এসেছি আমি।'

'বেশ আমরা এখন ট্রাক্টরে ফিরে যাব' বললাম আমি। 'আপনার ব্যাগ সার্চ করে দেখব।'

'না', জোর গলায় বলল মাহলার। 'দেখুন ড. ম্যাসন, আপনাকে সবার

সামনে আমি অপ্রস্তুত করতে চাই না। এটা দেখুন।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে সে দিল আমাকে। স্তম্ভিত হয়ে কার্ডের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ডাক্তার হিসেবে কাজ করার সময় এরকম কার্ড বহুবার দেখেছি আমি। আবারো ভুল লোককে সন্দেহ করেছি। কার্ডটি ভাঁজ করে আমার স্নোমাস্ক খুলে ফেললাম। মাহলারের কাছে নিয়ে তার স্নোমাস্ক খুলে ফেললাম।

'নিশ্বাস ফেলুন,' বললাম আমি।

সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম– মাহলারের নিশ্বাসে মিষ্টি গন্ধ। ওর ডায়াবেটিস আছে। ওকে কার্ড ফিরিয়ে দিয়ে মৃদু গলায় জানতে চাইলাম, 'কবে থেকে ডায়াবেটিস বাঁধিয়ে বসে আছেন, মি. মাহলার?'

'ত্রিশ বছর।'

তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিলাম। যা শুনলাম তাতে খুশি হতে পারলাম না। সে যেটুকু চিনি চুরি করেছে তা দিয়ে বেশিদিন চলতে পারবে না। ওকে নিয়ে দারুণ চিন্তায় পড়ে গেলাম।

'আপনাকে অস্ত্র উঁচিয়ে হুমকি দেয়ার জন্য ক্ষমা চাইছি, মি. মাহলার। আপনি আপনার অসুখের কথা গোপন করলেন কেন?'

'আপনি তো নানান ঝামেলায় অস্থির,' জবাব দিল মাহলার। 'তাই আমার কথা বলে আপনাকে চিন্তায় ফেলতে চাইনি।'

ট্রাক্টরে ফিরে এলাম দুজনে, সবাইকে জানিয়ে দিলাম আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শুরু করছি যাত্রা।

আপত্তি করল মিসেস ডেন্সবি গ্রেগ। 'কিন্তু আপনি না বললেন তিন ঘণ্টা আমরা রেস্ট নেব।'

'হ্যাঁ, তবে কথাটি বলার সময় মি. মাহলারের শারীরিক অবস্থার কথা জানতাম না।'

মাহলারের ডায়াবেটিসের কথা সবাইকে জানিয়ে দিলাম। 'এ মুহূর্তে মাত্র দুটি জিনিস মি. মাহলারের জীবন রক্ষা করতে পারে– বিশেষ খাবার কিংবা ইনসুলিন ইনজেকশন। কিন্তু আমাদের কাছে দুটোর একটিও নেই। আমরা শুধু ওকে বাঁচাতে পারব যদি দ্রুত উপকূলে পৌঁছাতে পারি। তাহলে ওই দুটো জিনিসও হাতে পেয়ে যাব আমরা। এ জন্যই বিরতিহীনভাবে সর্বোচ্চ গতিতে চলতে হবে আমাদেরকে। কারো কোন আপত্তি আছে?'

কেউ কোনো আপত্তি করল না। আবার যাত্রা হল শুরু। নতুন এ সমস্যা আমাকে চিন্তিত এবং ক্রুদ্ধ করে তুলল। আমরা মাহলারকে বাঁচিয়ে রাখার যত চেষ্টাই করি না কেন, এখন হোক বা পরে খুনিরা প্রকাশ্যে চলে

আসবেই। তখন আমাদের সবাইকে মরতে হবে। হত্যাকারীরা কিছুতেই নিজেরা পথ চিনে উপকূলে পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু আমরা যখন উপকূলের কাছাকাছি চলে আসব, ওরা হয় আমাদেরকে ফেলে রেখে চলে যাবে যাতে ঠাণ্ডায় ধুঁকে মরি অথবা গুলি করে মেরে ফেলবে সবাইকে।

মাহ্লারকে আমরা অতিরিক্ত খাবার এবং গরম পানীয় দিলাম। সারাক্ষণ শুইয়ে রাখলাম বিছানায়, তাকে যতটা সম্ভব উষ্ণতা দেয়ার চেষ্টা করলাম। বিপজ্জনক জেনেও ট্রাক্টরের ভেতর চুলো জ্বালিয়ে রেখে পথ চলছি। অতিরিক্ত এ সেবাযত্ন বিব্রত করে তুলল মাহ্লারকে। সে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল। কিন্তু অন্যরা তার কথায় কর্ণপাত করল না, সবাই তার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত। তারা যেন নিজেদের ভয় এবং সন্দেহ ভুলে গিয়ে মাহ্লারকে কীভাবে বাঁচিয়ে রাখবে সে চেষ্টায় প্রাণপাত করতে লাগল।

আবহাওয়া এখনো ভালো এবং আমরা মাঝে মাঝে অতি সংক্ষিপ্ত যাত্রাবিরতি দিয়ে ক্রমাগত পথ চলছি। একবার এরকম যাত্রাবিরতির সময় ট্রাক্টর কেবিনে বসা যাগেরো আমাকে ডাক দিল। 'বাইরে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটছে, ডক্টর। আগুন, একবার দেখবেন।'

আমি বাইরে তাকালাম। আকাশজুড়ে অদ্ভুত একটি আলো, প্রতি মুহূর্তে আলোর ছটা বেড়ে যাচ্ছে। ম্লান কতগুলো রঙ ফুটল আকাশের বুকে, তারপর পরিষ্কার এবং অপূর্ব সুন্দর কিছু নকশা তৈরি করল।

'ও, হল নর্দার্ন লাইট বা সুমেরু প্রভা,' বললাম আমি। 'এ জিনিস এই প্রথম দেখেছ তুমি?'

'জি। দারুণ দেখতে, না?'

'হ্যাঁ, দারুণ তো বটেই। তবে এ আলো বিপদ ডেকে আনতে পারে। এগুলোর কারণে রেডিও রিসেপশন ঠিকমতো পাওয়া যায় না।'

'আমাদের রিসেপশন খারাপ হলেও বোধহয় কিছু যায় আসে না, তাই না?' বলল যাগেরো। 'কেবিনের রেডিওটা অকেজো। আর ট্রাক্টরের ছোট রেডিও দিয়ে আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে তো যোগাযোগও করা যাবে না। ওরা তো অনেক দূরে।'

'তা বটে,' স্বীকার করলাম আমি। 'তবে উপকূলের কাছাকাছি আসার পরে এ রেডিও দিয়েই আপলাভনিকে আমাদের মূল স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব।'

কথাটা বলেই জিভে কামড় দিলাম। বাইরে থেকে আমাদের সাহায্য আসার শেষ সুযোগটির কথাও জানিয়ে দিয়েছি আমি। রেডিও কন্ট্যাক্ট সবসময়ই কঠিন, তবে খুনিরা আত্মপ্রকাশ করার আগেই হয়তো আমি

আপলাভনিকে সাহায্য চাইতে পারতাম। কিন্তু যাগেরো যদি খুনিদের একজন হয়ে থাকে, আমরা আপলাভনিকের কাছাকাছি পৌঁছাবার আগেই সে আমাদের রেডিওটা নষ্ট করে ফেলবে।

আবছা আলোয় যাগেরোর মুখটা দেখছিলাম আমি। তাকে রিলাক্স দেখাচ্ছে– তবে খুব বেশি রিলাক্সও নয়। অবশ্য তাকে যদি খুব বেশি শান্ত কিংবা খুব বেশি অস্থির দেখাত, তার ওপর আমার সন্দেহটা আরো বৃদ্ধি পেত। পেত কি? আমি ক্রমে কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি। এর আগে যাদেরকে সন্দেহ করেছি সবগুলোই ছিল ভুল। তবু মনে হচ্ছে যাগেরোই অপরাধী। তবে আমার সন্দেহ ভুলও হতে পারে।

আমি মার্গারেট রসকে বললাম একটু বাইরে আসতে। ওর সঙ্গে কথা আছে। স্লেজে গিয়ে বসলাম দুজন। ওকে প্লেন ক্র্যাশের রাতের ঘটনার কথা স্মরণ করতে বললাম।

'তিনটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব আমার চাই,' বললাম আমি।

'প্রশ্নগুলো হল– প্লেনটি কেন ক্র্যাশ করল? যাত্রীদের কফিতে কীভাবে ড্রাগস মেশানো হয়েছিল এবং রেডিওটা অকেজো হল কীভাবে? এ প্রশ্নগুলোর জবাব পেলে আমরা হয়তো খুনিদের পরিচয় জানতে পারব।'

মার্গারেটকে এক এক করে সে রাতের ঘটনাগুলোর কথা মনে করতে বললাম। সে বলল কীভাবে যাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় হল। তাদের সঙ্গে সে গানডার এয়ারপার্টে গিয়েছিল, তারপর গানডার বিমানবন্দর থেকে তারা আকাশে ওড়ে এবং মার্গারেট যাত্রীদের রাতের খাবার পরিবেশন করে। হঠাৎ থেমে গেল ও, বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

'এইরে।' বলল সে, 'আগে কেন কথাটা মনে পড়েনি আমার? কী বোকা আমি!'

শিউরে উঠল সে, তবে কথা বলা বন্ধ করল না, দ্রুত শব্দগুলো বেরিয়ে আসতে লাগল তার মুখ থেকে।

'পুরুষদের টয়লেটে আগুন লেগে গিয়েছিল– সিরিয়াস কিছু নয়; কিছু কাগজ পুড়ছিল। কেউ হয়তো অসাবধানে জ্বলন্ত সিগারেট ফেলে দেয় আর সে থেকেই আগুনের উৎপত্তি, ওই সময় এমনটিই ভেবেছি আমি। কর্নেল হ্যারিসন প্রথম আবিষ্কার করেন টয়লেটে আগুন জ্বলছে। ওই সময় আমি মাত্র খাবার পরিবেশন শেষ করেছি– কফি তখনো দেইনি। সবাই যে যার আসন ফেলে ছুটে গিয়েছিল আগুন দেখতে। কয়েক মিনিট বেশ একটা কোলাহল তৈরি হয়। ওই সময় নিশ্চয় কেউ কিচেনে গিয়ে ঢুকেছিল।'

আমি প্রশ্ন করার আগেই আমার পরবর্তী জিজ্ঞাসার জবাব দিল

মার্গারেট। তার গলার স্বর নিচু, থেমে থেমে কথাগুলো বলল সে।

'এর আগে দুজন মানুষ আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন ডিনার কখন পরিবেশন করা হবে। মিসেস ডেন্সবি গ্রেগ আর... আর... মি. যাগেরো।

উত্তেজনায় সামনে ঝুঁকে এলাম, ওর মুখে প্রায় মুখ ছুঁইয়ে বললাম, 'প্লেন ক্র্যাশের পরে এখন আমাদের কেবিনে প্রথম রাতটির কথা স্মরণ করো। রেডিও যখন মেঝেতে পড়ে যায় ওই সময় যাগেরো কি তোমার আশপাশে ছিল?'

'না, সে ছিল না'

'কিন্তু তুমি ঘোরা মাত্র রেডিওটা পড়ে গেল। ঘুরে কাকে দেখলে?'

'মি. কোরাজ্জিনি–'

'হ্যাঁ হ্যাঁ,' দ্রুত বললাম আমি। 'আমরা সবাই জানি রেডিওটা রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল সে। কিন্তু দেয়ালের ধারে আর কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখনি তুমি?'

'হ্যাঁ, আরো একজন ছিল,' ধীর গলায় জবাব দিল ও।

'কে সে?' অধৈর্য শোনাল আমার কণ্ঠ।

'সলি লেভিন।'

সংক্ষিপ্ত সময়ের দিনের আলো এসে বিদায় নিয়ে গেল। বাড়ছে ঠাণ্ডা। আমরা সেদিন দিনে দুবার থামলাম। বিকেল চারটায় একবার আর রাত আটটার সময় দ্বিতীয়বার। দুবারই আমি জসের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। আমি ওকে বলেছিলাম নিয়মিত বিরতি দিয়ে ওর সঙ্গে আমি যোগাযোগর চেষ্টা করে চলব। যদি এর মধ্যে ভাঙা রেডিওটা ও মেরামত করে ফেলতে পারে তাহলে তো যোগাযোগ হয়েই যাবে। যদিও দুজনেই জানতাম ও জিনিস সম্পূর্ণই অমেরামতযোগ্য।

সবাই নির্মম শীতের কামড়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। প্রায়ই একেকজন ট্রাক্টর থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ছে, ট্রাক্টরের পাশে দৌড়াচ্ছে শরীরটাকে গরম করে নেয়ার আশায়। কিন্তু খিদে, ঠাণ্ডা আর অনিদ্রার কারণে কেউই দু-এক মিনিটের বেশি দৌড়াতে পারছে না।

মাঝরাতের মিনিট দশেক পরে আমি ট্রাক্টর থামানোর নির্দেশ দিলাম। গত সাতাশ ঘণ্টা ধরে পথচলার ওপরে আছি আমরা।

আট

বুধবার সকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা

সে রাতে কেউ ঘুমাল না। যদিও সবাই ছিলাম বেজায় ক্লান্ত এবং বিপর্যস্ত। আমার ধারণা কেউ ঘুমিয়ে পড়লে সে হয়তো ঠাণ্ডায় জমেই মারা যেত। এমন শীত জীবনে দেখিনি আমি। তেলের বাতি জ্বলছে, প্রচুর গরম কফি পান করছি আমরা, ছোট্ট পরিসরে গাদাগাদি করে বসেছি সকলে তবু শীতের ভয়ানক কামড়ে আমাদের করুণ অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। বৃদ্ধা মেরি লিগার্ড এবং অসুস্থ মাহলার কীভাবে সে রাতটি টিকে গেলেন জানি না।

ভোর চারটার দিকে মিটমিটে বাতিটি জ্বেলে দিয়ে নীল-সাদা শ্বাসগুলোর দিকে তাকালাম। ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হয়ে ওগুলো এখন হলুদ রঙ ধারণা করতে শুরু করেছে। 'কেউ কি আদৌ ঘুমাতে পেরেছেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। সবাই নিঃশব্দে ডানে-বামে মাথা নাড়ল।

'কেউ কি ঘুমাতে চান?' আবার মাথা নাড়ল সকলে।

'ঠিক আছে। এখন ভোর চারটা বাজে। স্থবির হয়ে বসে থেকে শীতে জমে মরার চেয়ে চলার পথে মৃত্যু বরং অনেক শ্রেয়।'

জ্যাকস্ট্র গেল ট্রাক্টর স্টার্ট দিতে। তার সঙ্গে গেলাম আমি এবং কোরাজ্জিনি। ক্রমাগত কাঁপছি, আর হাঁপাচ্ছি, হিম শীতল বাতাস যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে গলা আর ফুসফুস। কেবিনের ভেতরে টর্চ জ্বেলে দেখলাম তাপমাত্রা নেমে এসেছে মাইনাস ৫৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে।

এমন লোয়েস্ট টেম্পারেচার জীবনে দেখিনি। এখন কী হবে, ভাবছিলাম আমি। আমাদের মধ্যে দুজন খুনি, একজন যাত্রী মারা যেতে বসেছে, বাকি সাতজন খাবারের অভাবে ক্রমে দুর্বলতর হয়ে পড়ছে।

ট্রাক্টরের ইঞ্জিন আবার চালু হতে পৌনে তিন ঘন্টা সময় লাগল। সব কিছু জমে বরফ হয়ে গেছে, ইঞ্জিন খুলে নিয়ে প্রতিটি অংশ গরম করতে হল ট্রাক্টর কেবিনে তেলের স্টোভ জ্বালিয়ে। ভীষণ পরিশ্রমের কাজ। কাজটা করতে গিয়ে আমাদের হাতের চামড়া ছিলে গেল, ফেটে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। মুখের অবস্থাও তথৈবচ।

কফি আর দুই টিন মাংস বারোজন মানুষের মধ্যে ভাগ করে অতৃপ্ত নাশতা সেরে আমরা ফের আমাদের যাত্রা শুরু করলাম।

জ্যাকস্ট্র গাড়ি চালাচ্ছে, মাহলারকে আমি পরীক্ষা করে দেখলাম। গায়ে পুরো পোশাক চাপিয়ে, স্লিপিং ব্যাগে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলেও মাহলারের মুখটা তীব্র শীতে নীল-সাদা হয়ে গেছে এবং হিহি করে কাঁপছে।

'কেমন বোধ করছেন, মি. মাহলার?'

'অন্যদের চেয়ে নিশ্চয় খারাপ নয়।'

মাহলারের শরীর শুকিয়ে গেছে, অন্যদের অবস্থাও কমবেশি তা-ই, বিশেষ করে মেরি লিগার্ডের দশা শোচনীয়।

'আপনার পাটা একবার দেখি তো', বললাম আমি মাহলারকে। তার পা বিশ্রী রকম সাদা, ওতে প্রাণের কোনো চিহ্নই নেই। মার্গারেট রসকে বললাম গরম পানিভর্তি দুটো রাবার ব্যাগ দিয়ে যেন সার্বক্ষণিক সেঁক দেয় মাহলারের পায়ে। মাহলার আবারো আপত্তি জানাবার চেষ্টা করল কিন্তু তার কথায় কর্ণপাত করলাম না। ডায়াবেটিক রোগী, সে কি না কোনো চিকিৎসা পাচ্ছে না, সে ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হলে পা জোড়া চিরতরে হারানোর যথেষ্টই সম্ভাবনা রয়েছে।

দুপুরে যাত্রাবিরতি দিয়ে আমি আর জ্যাকস্ট্র আরেকবার চেষ্টা করলাম জসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। ওর কাছ থেকে আমরা এখন আড়াইশ কিলোমিটার দূরে চলে এসেছি। মিনিট দশেক টানা কলসাইন পাঠালাম আমি, শেষে হতাশ হয়ে ছেড়ে যেতে যাচ্ছি, জসের কণ্ঠ ভেসে এল মাইক্রোফোনে।

'GFX CALLING GFK, GFX CALLING GFK. রিসিভিং ইউ ফেইন্ট বাট ক্লিয়ার।'

উত্তেজনায় আমার হাত থেকে মাইক্রোফোন প্রায় পড়ে যাচ্ছিল।

'ড. ম্যাসন বলছি। ড. ম্যাসন বলছি। তোমাকে পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। জস বলছ?'

'জি স্যার।'

আমি কিছু বলার আগেই সে বলে উঠল, 'ক্যাপ্টেন হিলক্রেস্ট আপনার সঙ্গে কথা বলবেন, স্যার।'

আমি আর জ্যাকস্ট্র অবাক চাউনি বিনিময় করলাম। তার চোখে সতর্কতা। আমি ওর চোখের ভাষা বুঝে ফেললাম। 'একটু ধরো। আমি দু-তিন মিনিট পরে আবার তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করছি।'

রেডিওটি নিয়ে আমরা ট্রাক্টর থেকে দুইশ মিটার দূরে চলে গেলাম যাতে কেউ আমাদের কথা শুনতে না পায়। হিলক্রেস্টের কণ্ঠ পরিষ্কার এবং জোরালো শোনা গেল। 'আমি সংক্ষেপে পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছি। আমরা সোমবার বিকালে শুনতে পাই ব্রিটিশ এবং আমেরিকান রেডিওতে উভয়েই নিখোঁজ যাত্রীবাহী বিমানের কথা ঘোষণা করছে। গতকাল আপলাভনিক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তারা বলে, যদিও বিষয়টি এখনো আনঅফিসিয়াল, আমেরিকান এবং ব্রিটিশ সরকার নিশ্চিত যে বিমানটি আবার হারিয়ে গেছে এবং গ্রিনল্যান্ড অথবা বাফিন আইল্যান্ডের কোথাও অবতরণ করেছে। তারা ব্যাপকভাবে আকাশ এবং সাগরে সার্চ পার্টি নামিয়েছে। এ সার্চ পার্টিতে বিভিন্ন দেশ তাদের জাহাজ এবং প্লেন পাঠাচ্ছে। সন্ধানী দলে যোগ দিয়েছে বারোটা ইউএস এয়ার ফোর্স বম্বার, পাঠানো হচ্ছে কানাডিয়ান জাহাজ এবং একটি ব্রিটিশ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার ইতিমধ্যে কেপ ফেয়ারওয়েলে পৌঁছেছে। গ্রিনল্যান্ডের সমস্ত সায়েন্টিফিক স্টেশনকে সার্চে যোগ দিতে হুকুম করা হয়েছে– এ জন্য আমরা সোজা কেবিনে ফিরে এসেছি পেট্রোল নিতে। আপনার খবর কী? কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আছে?'

'না, হ্যাঁ আছে। একজন যাত্রী, মাহলার, সে অ্যাডভান্সড ডায়াবেটিস। দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছে। আপলাভনিকের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করে বলুন তারা যেন জরুরি ভিত্তিতে কিছু ইনসুলিনের ব্যবস্থা করে।'

'আচ্ছা। আপনারা ফিরে আসুন। আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। এখানে প্রচুর পেট্রোল এবং খাবার আছে। দুজনের বদলে আটজন গার্ড পাহারা দিচ্ছে। এখানে অপ্রীতিকর কিছু ঘটেনি। আমরা আপনাদের থেকে মাত্র ১৩০ কিলোমিটার পেছনে। পাঁচ-ছয় ঘণ্টার মধ্যে আমরা একত্রিত হতে পারব।'

প্রথমে স্বস্তির পরশ অনুভব করলেও অনুভূতিটা বেশিক্ষণ রইল না।

জ্যাকস্ট্রও সায় দিল না। ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। 'অসম্ভব' জবাব দিলাম আমি। 'খুনিরা জানে আপনাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কাজেই তারা আরো মরিয়া হয়ে উঠবে এবং হয়তো আবার খুনখারাবি শুরু করে দেবে। কাজেই এ ঝুঁকি নিতে পারব না। আমাদের সামনে এগোতে হবে। আপনারা দয়া করে আমাদের পেছন পেছন আসুন। আপলাভনিককে বলুন দুর্ঘটনাকবলিত বিমানটি সম্পর্কে আমাদের তথ্য দরকার। ওদেরকে যাত্রী তালিকায় চোখ বুলাতে বলবেন। কে কিংবা কী প্লেনটাতে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার জানা দরকার।'

ট্রাক্টর কেবিনে ফিরে এলে সিনেটর জানতে চাইলেন, 'আপনার বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ হল, ড. ম্যাসন?'

'হু', জবাব দিলাম আমি। জস অবশেষে কেবিনের রেডিও মেরামত করতে পেরেছে। ক্যাপ্টেন হিলক্রেস্টের সঙ্গে সে যোগাযোগ করেছিল। হিলক্রেস্ট এক্সপিরিসন দলের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। হিলক্রেস্ট আমাদের পেছন পেছন আসছেন।'

'আসতে কতক্ষণ লাগবে?' জানতে চাইলেন সিনেটর। চারশ কিলোমিটার দূরে আছেন তিনি। আর তাঁর ট্রাক্টরের গতি আমাদেরটার চেয়ে বেশি দ্রুত নয়।' কিন্তু হিলক্রেস্টের ট্রাক্টর আমাদের ট্রাক্টরের চেয়ে তিনগুণ জোরে চলে। কমপক্ষে পাঁচ-ছয় দিন তো লাগবেই।

মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর। ভাবছিলাম দশজন যাত্রীর মধ্যেও কেউ কি বুঝতে পারবে আমি মিথ্যা বলছি। যে লোকটি কেবিনে আমাদের রেডিও ভেঙেছিল সে নিশ্চয় জানে ওটি মেরামতের অযোগ্য।

সেদিন দুপুরে, বেলা আড়াইটার দিকে, তাপমাত্রা নেমে এল সবচেয়ে নিচে মাইনাস ৫৮ ডিগ্রিতে। তারপর অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটতে শুরু করল। বরফ এমন শক্ত হয়ে গেল মসৃণ সারফেসে পিছলে যেতে লাগল ট্রাক্টরের চাকা। সুমেরুর তাপমাত্রায় অভ্যস্ত কুকুরগুলো এই ভীতিকর ঠাণ্ডায় একদম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল, তারা কাঁদতে লাগল, গোঙাতে থাকল। আমরা যারা ট্রাক্টরের বাইরে গেলাম, তারা নিঃশ্বাস ফেলা মাত্র বাষ্পটা সাদা ঘন মেঘে রূপান্তরিত হল, ট্রাক্টর চলতে বার বার থেমে গেল। রেডিয়েটর লিক হয়ে পানি পড়ছে দেখে আমাদের টেনশন আরো বৃদ্ধি পেল।

ট্রাক্টরের কেবিনের ভেতরের অবস্থাও ভালো নয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা যাত্রীদের

দেহ-মন উভয়ের ওপর চাপ ফেলেছে। তারা পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে একদমই আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে, তারা শুধু ঘুমাতে চাইছে। সীমাহীন, দীর্ঘ ঘণ্টাগুলো পার করে দিতে চাইছে ঘুমিয়ে। তবে তারপর তারা ভুগবে অনিদ্রায়, দুর্বলতায়, কোনো কিছু মুখে তোলার ক্ষমতাও তাদের থাকবে না এবং নার্ভাসনেস তাদেরকে পরিণত করে তুলবে উন্মাদে।

এক এক করে সবার দিকে তাকালাম আমি। সিনেটর পাথরমূর্তি হয়ে বসে আছেন, জীবিত নয় মৃত মানুষের মতো লাগছে তাঁকে। মাহ্লার বোধহয় ঘুমাচ্ছে। মিসেস ডেন্সবি গ্রেগ এবং হেলেন একে অন্যকে জড়িয়ে বসে আছে একটু শারীরিক উত্তাপ পেতে। মনিব আর চাকরানির মধ্যে এখন আর কোনো তফাৎ নেই; দুর্দশা আর ক্লেশ তাদেরকে মানুষে পরিণত করেছে। হেলেনের প্রতি মিসেস ডেন্সবি গ্রেগের এই স্নেহটুকু আমার কাছে বেশ ভালো লাগল।

মেরী লিগার্ড সুন্দরী, সাহসী, সদাহাস্যময়ী। মেরি লিগার্ড এখন এক অসুস্থ বুড়িতে পরিণত হয়েছেন, প্রতি ঘণ্টায় দুর্বলতর হয়ে পড়ছেন। তাঁর জন্য আমার কিছু করার নেই। এরকম অবস্থা চলতে থাকলে আর দু-তিন দিনের মধ্যেই তিনি মারা যাবেন।

সলি লেভিন জামাকাপড় এবং কম্বলে এমনভাবে ঢেকেঢুকে রেখেছে নিজেকে যে কেবল চক্ষু দুটি দেখা যাচ্ছে। তবে তার চেহারাতেও দুর্দশার ছাপ স্পষ্ট। তার প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নেই।

স্টোভের পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছে মার্গারেট রস। মেয়েটির প্রতি আমার এমন মায়া জন্মেছে যে তার পাণ্ডুর, বেদনাক্লিষ্ট মুখখানা আমার বুকে ব্যথার সৃষ্টি করল।

মি. স্মলউড আমাকে বিস্মিত করল। তার ভেতরে যেন লুকিয়ে আছে শক্তি যে কারণে শীত তাকে কাবু করতে পারেনি। সে চুপচাপ বসে আছে, শান্ত ধীর এবং রিল্যাক্সড। প্রার্থনার বইটি তাকে পড়তে দেখছি আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে।

সন্ধ্যা আটটায় ট্রাক্টর থামালাম। হিলক্রেস্টের সঙ্গে আবার রেডিওতে যোগাযোগই শুধু নয়, চাইছি তিনি যেন আমাদেরকে ওভারটেক করতে পারেন। ট্রাক্টর ইঞ্জিনের কাছে গেলাম রেডিয়েটর খালি করতে যাতে থেমে থাকার এ সময়টুকুতে পানি বরফ হয়ে না যায়। তরল পদার্থটি ঝরঝর শব্দে পড়ছে, পেছনে কেউ যেন এসে দাঁড়াল মনে হল আমার। বিপদ! টের

পেয়ে গেল আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। দুবার চেষ্টা করতেই সাদা একটা আলো জ্বলে উঠল চোখের সামনে কপালে ভারী কিছুর আঘাতে। আমি আইস-ব্যাগের বরফ জমিনে দড়াম করে পড়ে গেলাম জ্ঞান হারিয়ে।

আমি ওই সময় মরে যেতে পারতাম। অচেতন অবস্থা থেকে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে মৃত্যু ঘটত আমার। তবে জ্যাকস্ট্রর কণ্ঠ জাগিয়ে তুলল আমাকে– ড. ম্যাসন! ড. ম্যাসন! উঠুন ড. ম্যাসন। উঠে পড়ুন। আস্তে আস্তে উঠুন।

আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। মাথায় ব্যথার সুচের তীক্ষ্ণ খোঁচা দেখলাম। চারপাশে তাকালাম। সবকিছুই কেমন ঘোলাটে লাগল। আশঙ্কায় ধক্ করে উঠল বুকের ভেতর। আমার চোখের কোনো ক্ষতি হয়নি তো। পরক্ষণে বুঝতে পারলাম আমার কপাল কেটে গিয়ে রক্ত পড়ে জমাট বেঁধে আছে ডান চোখের পাতায়। তাই সবকিছু আবছা দেখছিলাম।

অহেতুক প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করল না জ্যাকস্ট্র। 'কে আপনাকে মেরেছে কোনো ধারণা আছে, ড. ম্যাসন?'

'নাহ্'।

'কেন মারল?'

'ঠিক জানি না... ওহ্, আমার পিস্তল...' জ্যাকেটের পকেটে হাত দিলাম। বিস্মিত হয়ে দেখলাম অস্ত্রটি যথাস্থানেই আছে।

'কিছু খুইয়েছেন?'

'হ্যাঁ। বুলেটগুলো এখানে ছিল। এক মিনিট– কর্নেল হ্যারিসনের পকেট থেকে খবরের কাগজের সে আর্টিকেলটা নিয়ে এসেছিলাম ওটা পাচ্ছি না!'

'খবরের কাগজের আর্টিকেল? ওতে কী লেখা ছিল, ড. ম্যাসন?'

'পড়িনি। ঈশ্বর, কী বোকা আমি!'

পাঁচ মিনিট পর কাটা জায়গাটা ধুয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে নিলাম। ফিরে এলাম ট্রাক্টরে হিলক্রেস্টের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ করতে।

'আপলাভনিকের খবর কী?' জানতে চাইলাম আমি। দুটো খবর আছে, ড. ম্যাসন,' বলল হিলক্রেস্ট। 'আমেরিকা থেকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের যাত্রী তালিকা এখনো এসে পৌঁছায়নি। তবে নিউজপেপার রিপোর্ট তিনটি নাম দিয়েছে : মেরি লিগার্ড, সিনেটর হফম্যান ব্রুস্টার এবং মিসেস ফিলিস ডেন্সবি গ্রেগ। দ্বিতীয় খবরটি হল আপলাভনিকে আমাদের সহকর্মীদের

ধারণা প্লেনে কোনো এক যাত্রী খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একা বহন করছিলেন– জিনিসটা অত্যন্ত গোপনীয়ও বটে। তবে ওটা কী জানতে চাইবেন না। কারণ আমি জানি না। তবে জিনিসটা ছিল কর্নেল হ্যারিসনের কাছে।'

জ্যাকস্ট্রর দিকে তাকালাম আমি। সে তাকাল আমার দিকে। হতাশ বোধ করছিলাম খুব। যে আমাকে মাথায় আঘাত করেছে সে আমার চেয়ে অনেক বেশি চালাক। সে এবং তার পার্টনার নিশ্চয় জানে জসের পক্ষে বেসিনের ওই রেডিও মেরামত করা সম্ভব নয়। এবং এটাও তাদের অনুমান করা শক্ত নয় যে হিলক্রেস্টের নিজের রেডিওতে আমি কথা বলেছি এবং তিনি নিশ্চয় আমাদের কেবিন থেকে কথা বলছেন কিংবা আরো কাছ থেকে, যেহেতু আমি ওদেরকে বলেছিলাম আমার রেডিও মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে কাজ করে। ওরা জানে গুরুত্বপূর্ণ কোনো কারণেই হিলক্রেস্ট তাঁর এক্সপিডিশন থেকে ফিরে এসেছেন। কারণ আমি ওদেরকে বলেছিলাম তিনি দুই-তিন সপ্তাহের আগে নিজের স্টেশন ছেড়ে নড়াচড়া করবেন না।

আমি হিলক্রেস্টকে বললাম, 'ধন্যবাদ। প্লিজ, আপলাভনিকের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করুন এবং জানান, প্লেন ক্র্যাশের কারণ জরুরি ভিত্তিতে জানতে চাই আমরা। আপনারা আমাদের থেকে কতটা পিছিয়ে আছেন? আমরা দুপুর থেকে এ পর্যন্ত মাত্র বত্রিশ কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দিতে পেরেছি।'

'আমরা মাত্র তেরো কিলোমিটার রাস্তা পার হয়েছি কারণ–'

'মাত্র তেরো?' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'আপনি তেরো বললেন?'

'আপনি ঠিকই শুনেছেন', রাগে গলা কাঁপছে হিলক্রেস্টের।

'চিনি চুরির কথা মনে আছে? চুরি যাওয়া চিনির খোঁজ মিলেছে। আপনাদের কোনো বন্ধু পুরো চিনির বস্তা খালি করেছে পেট্রোলের ড্রামে। ফলে আমাদের নড়াচড়া প্রায় বন্ধ।'

নয়

বুধবার রাত ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা

সে রাতে নয়টার পর আবার রওনা হলাম আমরা। রাত তিনটা নাগাদ চলে এলাম ভিন্ডেবি নুনাটাক্স-এ। ১৬০ কিলোমিটারজুড়ে পাহাড় আর পাহাড়। সরু গিরিপথ চলে গেছে এসব পাহাড়ের মাঝ দিয়ে, তবে রাস্তাটা ভয়ানক খাড়া। জমাট বরফে ট্রাক্টরের চাকা বারবার পিছলে যেতে চাইল। আমাদের চলার গতি হয়ে উঠল মন্থর এবং কঠিন।

খাড়া গিরিপথের প্রবেশপথে পৌঁছালাম সাতটা নাগাদ। সংকীর্ণ এ গিরিপথের একটা পাশ ধপ করে নেমে গেছে হিমবাহের গভীর এক ফাটলের দিকে। ফাটলটা ভয়ানক গভীর, দেখলে মনে হয় এর কোনো তল নেই। দিনের আলো ফোটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম এ গিরিপথ পার হওয়ার জন্য।

সকাল আটটায় রেডিওতে যোগাযোগ করলাম হিলক্রেস্টের সঙ্গে। তিনি গত বারো ঘণ্টায় অল্প কয়েক মাইল রাস্তা পার হতে পেরেছেন। তাদেরকে ইঞ্জিন খুলে নিয়ে পরিষ্কার করতে হয়েছে, চিনি মেশানো পেট্রোলের প্রতিটি গিয়ার বিশুদ্ধ করেছেন তারা– কাজটা অনেক কঠিন এবং সময়সাপেক্ষও বটে। হতাশাজনক আরেকটি খবর হল আপলাভনিক থেকে প্লেন ক্র্যাশ নিয়ে এখনো কোনো তথ্য আসেনি।

তিন ঘণ্টা বিরতি শেষে আবার চলা শুরু হল আমাদের। তাপমাত্রা এখন মাইনাস ৩৪ ডিগ্রিরও কম। তবে এতেও মেরি লিগার্ড এবং মাহলারের শারীরিক অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। দুজনই ভয়ানক অসুস্থ। অন্যরা যখন ট্রাক্টর থেকে নেমে হাঁটছে তাদেরকে তখন কুকুরে টানা স্লেজে করে বহন করা হল। আমি ট্রাক্টর থেকে সবাইকে নামিয়ে দিয়েছিলাম, কারণ চাইনি মানুষের ওজনে ট্রাক্টর স্লিপ খেয়ে হিমবাহের ফাটলের মধ্যে গিয়ে পড়ুক।

দুপুর নাগাদ আমরা গন্তব্যের অর্ধেকেরও বেশি পথ পার হলাম। এখন আমরা চলে এসেছি গিরিপথের সবচেয়ে বিপজ্জনক এবং সরু জায়গায়। কোরাজ্জিনি ছুটতে ছুটতে এল, হাত তুলে থামতে বলছে আমাকে।

ঝামেলা হয়েছে ডক্টর, বলল সে। 'কে যেন গিরিপথ থেকে ছিটকে পড়ে গেছে। জলদি আসুন।'

'কে? ড্রাইভারের আসন থেকে লাফ মেরে এলাম। তাড়াহুড়োয় ট্রাক্টরের দরজার পাশে রাখা পিস্তলটি আনতে ভুলে গেছি।'

'জার্মান মেয়েটি পা পিছলে পড়ে গেছে। আপনার বন্ধু তাকে সাহায্য করতে গেছে।'

হিমবাহের ফাটলের কিনারে উঁকি দিলাম আমি। আঁতকে উঠলাম। ফাঁকের দেয়ালের ওপরের অংশ চওড়ায় দুই মিটারের বেশি হবে না। তবে নিচের অংশ বেঁকে গিয়ে ফাটল আর দেয়ালের মাঝখানে চওড়া হয়ে মস্ত একটা গুহামুখের সৃষ্টি করেছে এবং গুহামুখটি অদৃশ্য হয়ে গেছে ঘুটঘুটে অন্ধকারে। বামে, ছয় মিটার নিচে, দুটো দেয়াল সংযুক্ত হয়েছে তখনো বরফ দ্বারা। বরফটি একটি সেতুর আকার ধারণ করেছে এবং সেটি দৈর্ঘ্যে বড়জোর পাঁচ মিটার। আর এই বরফের সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে আছে জ্যাকস্ট্র, জড়িয়ে ধরে থেকেছে ভয়ে নীল হয়ে যাওয়া হেলেনকে। হেলেনকে পড়ে যেতে দেখে জ্যাকস্ট্র নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে নিজেও লাফ দিয়ে পড়েছিল এবং মেয়েটাকে ব্রিজ থেকে ছিটকে পড়া থেকে বাঁচিয়েছে।

'তুমি ঠিক আছো তো?' হাঁফ ছাড়লাম আমি।

'আমার বাম হাত বোধহয় ভেঙে গেছে,' জানাল জ্যাকস্ট্র। 'একটু জলদি করবেন ড. ম্যাসন, বরফের ব্রিজটা কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়বে।'

দ্রুত চিন্তা করছি আমি। রশি ছুড়ে দেব? না। জ্যাকস্ট্রর হাতভাঙা, ওদিকে হেলেনের কলারবোন ভাঙা। ওদের কেউই রশি দিয়ে নিজেদেরকে বাঁধতে পারবে না। কাউকে কি ফাটলের দিকে নামিয়ে দেব রশিসহ? কিন্তু রশি বেয়ে ওপরে উঠবে কী করে? আমাদেরকে তো ওপরে টেনে তুলতে হবে।

এক ছুটে ফিরে এলাম ট্রাক্টর স্লেজে। সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে– চারটা কাঠের টুকরো। এগুলো রাখা হয়েছিল ইমার্জেন্সি ব্রিজ তৈরি করার জন্য। টুকরোগুলো লম্বায় চার মিটার, আট সেন্টিমিটার পুরু, যে কোনো মানুষের ওজন বইতে সক্ষম। আমি এক টুকরো কাঠ নিলাম। নিমিষে ফাটলের ওপর তৈরি হয়ে গেল ব্রিজ, জ্যাকস্ট্র আর হেলেনের ঠিক মাথার ওপরে। একটি রশি বাঁধলাম আমার কোমরে, ব্রিজ থেকে নেমে পড়লাম নিচে। এসে দাঁড়ালাম বরফের সেতুর ওপরে, জ্যাকস্ট্র এবং হেলেনের ঠিক পাশটিতে।

আরেকটি রশি ফেলতে বললাম। রশিটি শক্ত করে বেঁধে দিলাম হেলেনের কোমরে। অন্যরা ওকে টেনে তুলতে শুরু করল, আমি নিচ থেকে ওকে ঠেলে তুলে দিতে লাগম। মুড়মুড় শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম পায়ের

নিচের বরফের সেতু ভাঙতে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকস্ট্রর হাত ধরে ওকে দিয়ে সেতুর আরেক অংশে লাফিয়ে পড়লাম। এক সেকেন্ড পরই একটু আগে সেতুর যে অংশে আমরা ছিলাম, সে অংশটি ভেঙে বিলীন হয়ে গেল খাদের অতলে।

বরফের দেয়ালে শরীর ঠেকিয়ে রাখলাম দুজনে। হঠাৎ হেলেনের আর্তচিৎকার শুনে ওপর দিকে তাকালাম। ওকে ফাটলের ওপরে টেনে তোলা হয়েছে। কোরাজ্জিনিকে দেখতে পেলাম। ফাটলের একদম কিনারে দাঁড়িয়ে আছে সে। হাতে আমার পিস্তল।

তিক্ততা, রাগ এবং ভয় একসঙ্গে গ্রাস করল আমাকে। যে জিনিসটি কখনো ঘটতে দিতে চাইনি আমি আর জ্যাকস্ট্র অসহায়ভাবে শত্রুর কবলে পড়ব সে ঘটনাটি ঘটল অবশেষে। কোরাজ্জিনি নিশ্চয় হেলেনকে গিরিপথ থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, জানত আমাদের দুজনের কোনো একজন ওকে বাঁচাতে এগিয়ে আসব। জ্যাকস্ট্রর হাত ভেঙেছে শুনে আমি ফাটলের নিচে চলে এসে ওর পরিকল্পনায় বরং সাহায্যই করেছি। ওরকম একটি সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল কোরাজ্জিনি।

ও আমাদেরকে কীভাবে হত্যা করবে ভাবছিলাম, দেখি রেভারেন্ড স্মলউড তাকিয়ে আছে তার দিকে, শূন্যে হাত ছুড়ে চিৎকার করে কী যেন বলছিল ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। কোরাজ্জিনি ডান হাত থেকে বাম হাতে পিস্তল নিয়ে ডান হাতে আঘাত করল স্মলউডের মুখে। বরফের ওপর দড়াম করে পড়ে গেল ধর্মযাজক।

পিস্তল নাড়িয়ে অন্যদেরকে সরে যেতে হুকুম দিল কোরাজ্জিনি, ফাটলের ওপর কাঠের টুকরো দিয়ে তৈরি করা ব্রিজের দিকে হেঁটে এল। ওর মতলব বুঝে ফেললাম তখুনি। গুলি খরচ না করে সে কাঠের সেতুটা লাথি মেরে ফেলে দেবে এবং আমরা দুজন খাদের অতলে আছড়ে পড়ে বরণ করব হিমশীতল মৃত্যু।

লাফ মেরে সেতুর ওপরে যাওয়ার চেষ্টা করা যায় কিনা মরিয়া হয়ে ভাবছি, কাঁধের ওপর আছড়ে পড়ল একটি রশি। মুখ তুলে চাইতে দেখি আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে কোরাজ্জিনি।

'আপনারা সারাদিন ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি?' বলল সে। 'উঠে আসুন।'

ত্রিশ সেকেন্ড লাগল আমাদেরকে ওপরে তুলে নিতে। এই ত্রিশ সেকেন্ড সময়ে আমার ভেতরে আশা, বিস্ময়, স্বস্তি এবং সন্দেহ সবকিছুই একসঙ্গে কাজ করেছে। আপাদমস্তক কাঁপছিল আমার কিন্তু কোরাজ্জিনি দেখেও না দেখার ভান করল। এগিয়ে এসে পিস্তলটি গুঁজে দিল আমার হাতে। 'অস্ত্রের বিষয়ে আপনি একটু উদাসীনই বটে, ডক্টর।'

'কিন্তু... কিন্তু এটি আপনার কাছে কেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

এখনো বিভ্রান্তি যায়নি আমার।

'কারণ গ্লাসগোতে নতুন একটি কাজ পেয়েছি আমি এবং সেটা শুরু করতে চাই,' ধারালো গলায় বলল সে।

ওর বলার মাজেজা বুঝতে পেরেছি আমি। আমার মতো ও-ও জানে হেলেনকে কেউ ইচ্ছে করে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। সে লোকটি কে অনুমান করতে পারছি।

জ্যাকস্ট্রকে নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল আমার। সাবধানে ওর কোট খুলে ফেললাম। স্বস্তি নিয়ে আবিষ্কার করলাম ওর হাত ভাঙেনি– শুধু কনুইয়ের হাড়টা স্থানচ্যুত হয়েছে। চাপ দিয়ে হাড়টিকে যথাস্থানে নিয়ে এলাম। প্রচণ্ড ব্যথা পেলেও চেহারায় বিন্দুমাত্র সে ভাব ফুটতে দিল না ও। বরং মুখে হাসি ধরে রেখেছে যেন কিছুই হয়নি।

হেলেনের কাছে গেলাম আমি। ঘটনার আকস্মিকতা এখনো সামলে উঠতে পারেনি মেয়েটি। কাঁপছে। বলল, 'জানি না আপনাদের দুজনকে কী বলে ধন্যবাদ দেব।'

'ধন্যবাদ দিতে হবে না। তোমাকে কে ধাক্কা মেরেছে?'

চক্ষু বিস্ফারিত হল হেলেনের। 'কী?'

'আমার কথা তুমি শুনেছ হেলেন। কে কাজটি করেছে?'

'হ্যাঁ। আ... আমাকে ধাক্কা মেরেছিল।' স্বীকার করল সে, 'তবে ব্যাপারটি নিছকই দুর্ঘটনা ছিল।'

'কে ধাক্কা মেরেছিল?' পুনরাবৃত্তি করলাম আমি।

কথা বলল সলি লেভিন। 'আমি', তবে এটি একটি অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। আমার পায়ে কেউ ল্যাং মেরে দিয়েছিল এবং–'

'আপনার পায়ে কে ল্যাং মারতে যাবে?'

'ফর গডস শেক!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমি কেন ইচ্ছে করে ওকে ধাক্কা মারতে যাব?'

সে কথাই তো জানতে চাইছি,' ঘুরলাম আমি। ফিরে এলাম ট্রাক্টরে। শুনলাম কোরাজ্জিনি বলছে রেভারেন্ডকে, 'আপনার গায়ে হাত তোলার জন্য আমি দুঃখিত, রেভারেন্ড। আপনি হত্যাকারী তা আমি মনে করি না তবে আমি কোনো ঝুঁকি চাইনি।'

আমরা অবিরাম চলতে লাগলাম। ভিন্ডেরি নুনাটাক্সের বাকি পথটুকু অতিক্রম করলাম বাড়তি কোনো ঝামেলা ছাড়াই। আহার বিরতি দিতে থামালাম ট্রাক্টর। খাবার তৈরি এবং পরিবেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মার্গারেট রসকে। সে শুকনো মুখে এল আমার কাছে। 'মাংসের টিনগুলো খুঁজে পাচ্ছি না, ড. ম্যাসন।'

'ওগুলো নিশ্চয় কোথাও আছে, মার্গারেট,' বললাম আমি। 'চলো,

একটু খুঁজে দেখি।'

এই প্রথম কিছু না ভেবেই ওর নাম ধরে ডাকলাম আমি। তবে কোনো আপত্তি করল না সে।

মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটে। সে হাসি দেখে আমার বুকের ভেতর কেমন একটা ঢেউ উঠল। তবে এসব বিষয় নিয়ে রোমান্টিক চিন্তা করার উপযুক্ত সময় এটা নয়। আমরা আঁতিপাঁতি করে সব জায়গায় খুঁজলাম মাংসের টিন; কিন্তু পেলাম না কোথাও। এ সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলাম আমি। কী করতে চাই সে প্ল্যানটা ফিসফিসিয়ে বলে দিলাম জ্যাকস্ট্রকে।

সবাইকে একত্রে ডাকলাম আমি। 'আমাদের শেষ মাংসের টিনগুলো গায়েব হয়ে গেছে,' বললাম আমি। 'কেউ ওগুলো চুরি করেছে। যে চুরি করেছে সে স্বীকার করুক নইলে আমি ঠিকই চোরকে খুঁজে বের করব।'

সবাই চুপ হয়ে থাকল। হঠাৎ বন্দুক কক্ করার শব্দে সকলে পেছন ফিরে দেখল। জ্যাকস্ট্র তার রাইফেল তাক করেছে যাগেরোর মাথায়। আমিও পকেট থেকে পিস্তল বের করে যাগেরোর উদ্দেশে তাক করলাম। 'তোমার বাক্সটি এখানে নিয়ে এসো।' বললাম তাকে। 'খোলো ওটি।'

'ওটা তালা মারা।'

'তালা খোলো।'

'চাবি হারিয়ে ফেলেছি।'

কোরাজ্জিনিকে বললাম মানেরোকে সার্চ করতে। কারণ ওদের দুজনকে আমি বন্দুকের নলের আওতায় রাখতে চাই। কোরাজ্জিনি ওকে সার্চ করেও কিছু পেল না। তারপর সলি লেভিনকে সার্চ করতে বললাম কোরাজ্জিনিকে।। তার কাছে এক গোছা চাবি পাওয়া গেল। লেভিন চেঁচিয়ে উঠল, 'ও নিশ্চয় চাবিগুলো আমার পকেটে লুকিয়ে রেখেছে। কারণ আমার কাছে এরকম চাবি কোনো দিনই ছিল না।'

'ঠিক আছে, কোরাজ্জিনি,' বললাম আমি, 'দেখা যাক আমরা কী খুঁজে পাই।'

যাগেরোর ব্যাগ খুলল কোরাজ্জিনি। কাপড়ের নিচে পাওয়া গেল লুকানো তিনটে মাংসের টিন।

'এখন বলো যাগেরো,' শীতল গলায় বললাম আমি। 'তোমাকে এ মুহূর্তে কেন খুন করব না তার পেছনে শক্তিশালী কোনো যুক্তি দেখাতে পারবে?'

'আপনি মস্ত ভুল করছেন,' বলল যাগেরো। 'আমি কি এতই বোকা, ওই জিনিসগুলো চুরি করে নিজের ব্যাগে রাখব?'

ততক্ষণে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি আমি। 'ওদের পা বেঁধে ফেলো।' হুকুম দিলাম আমি। এখন থেকে যাগেরো এবং লেভিন পা বাঁধা অবস্থায় ভ্রমণ করবে ট্রাক্টর স্লেজের সামনে এবং সারাক্ষণ ওদের দিকে তাক করা

থাকবে অস্ত্র।

দুই ঘণ্টা পর আমরা যাত্রাবিরতি দিলাম এবং চালালাম রেডিও। এই প্রথম ট্রাক্টর ছেড়ে কোথাও গেলাম না আমি। সবাই আমাদের কথা শুনলে শুনুক। আপলাভনিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম কিন্তু সফল হলাম না। তখন যোগাযোগ করলাম হিলক্রেস্টের সঙ্গে। বললাম দুই খুনিকে পাকড়াও করেছি। তবে আমার কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা বা স্বস্তি কোনোটাই ফুটল না বেদম ক্লান্ত আর বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম বলে। বিষণ্নবোধও করছিলাম। কারণ যাগেরোকে আমি পছন্দ করতে শুরু করেছিলাম। অথচ খুনে সন্দেহে ওকেই বেঁধে রাখতে হল!

যাত্রী তালিকা কিংবা বিমানে কী জিনিস নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সে ব্যাপারে আপলাভনিক থেকে কোনো তথ্য তখনো দেওয়া হয়নি বলে জানালেন হিলক্রেস্ট। শুনলাম অনেকগুলো জাহাজ রওনা হয়ে গেছে আপলাভনিকের পথে এবং চারটে বিমান আমাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ট্রাক্টর এবং পেট্রোল নিয়ে নিজেদের সমস্যা বয়ান করছেন হিলক্রেস্ট, হঠাৎ আমার মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল। 'এক মিনিট!' বলে আমি কেবিনে ঢুকলাম। দাঁড়ালাম মাহলারের বিছানার পাশে। 'আপনি না একটা তেল কোম্পানিতে কাজ করতেন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'হ্যাঁ, কেন?' মাহলারের কণ্ঠ দুর্বল এবং শ্বাস করতে খুব কষ্ট হচ্ছে।

আমি ওকে জানালাম হিলক্রেস্টদের পেট্রোলের সঙ্গে কীভাবে চিনি মেশানো হয়েছে। সমস্যার সমাধানের উপায় সঙ্গে সঙ্গে বাতলে দিল মাহলার। 'ওনার কাছে যদি চল্লিশ লিটারের কন্টেইনার থাকে ওনাকে বলুন আট লিটার পেট্রোল ঢেলে ফেলে দিয়ে ওতে সমপরিমাণ পানি রাখতে। তারপর ভালো করে ঝাঁকাতে হবে। দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে, তারপর বত্রিশ লিটার তরল ঢেলে ফেলতে বলবেন। এটুকু প্রায় খাঁটি পেট্রোল পাবেন তিনি। পানি পেট্রোলে দ্রবীভূত হয় না; কিন্তু পানির সঙ্গে মিশে যায়। আপনি যদি যথেষ্ট পরিমাণে পানি ঢালেন তাহলে ওই পানি টেনে নিয়ে যাবে চিনি।'

'বাহ্। দারুণ সহজ তো।' মুগ্ধ হলাম আমি। 'আর কোনো পরামর্শ, মি. মাহলার?'

'আগে আমরা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফুয়েল বহন করেছি। কিন্তু ফুয়েল এখানে রেখে যাই না কেন যাতে ক্যাপ্টেন হিলক্রেস্ট এটা পেতে পারেন? আপনি তো গত রাতেই কাজটা করতে পারতেন।'

আমি স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম মাহলারের দিকে। 'কেন করিনি, জানেন, মি. মাহলার?' বললাম আমি। কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নির্বোধ হলাম আমি। নইলে এ কথাটা মনে পড়ল না কেন আমার?' আমি হিলক্রেস্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম।

দশ

বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টা থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা

সেদিন পুরো সন্ধ্যা এবং রাত টানা গাড়ি চালালাম। কোথাও থামলাম না এ ভয়ে যত দ্রুত উপকূলে পৌঁছানো যায় তার ওপর নির্ভর করছে মাহ্লার এবং মেরি লিগার্ডের বাঁচা-মরা।

রাত ন'টার আগে জ্ঞান হারিয়েছে মাহ্লার। এখন খুব ধীরে শ্বাস করছে। শিগগির কোনো ইনসুলিনের ব্যবস্থা করা না গেলে দুই-তিনদিনের মধ্যে মারা যাবে সে। মেরি লিগার্ডের শারীরিক অবনতিও ঘটছে আশঙ্কাজনকভাবে।

আমি আমার রোগীদের নিয়ে যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, জ্যাকস্ট্র তখন আবহাওয়া নিয়ে চিন্তিত। বাতাস এখন আগের চেয়ে উষ্ণ, তবে হাওয়ার বেগ বেড়েছে এবং আকাশ ঢেকে যাচ্ছে কালো, ভারী দ্রুত সঞ্চরণশীল বরফ-মেঘে। এসবই গ্রিনল্যান্ডের ভয়ঙ্কর ঝড়ের পূর্বাভাস। এ ঝড়ে বাতাসের বেগ অবিশ্বাস্য বেড়ে যায়।

যত দ্রুত সম্ভব ছুটে চলেছি আমরা এবং আমাদের অগ্রযাত্রাও মন্দ নয়, তবে ভোর চারটা নাগাদ যখন আমরা আপলাভনিক থেকে প্রায় তিনশ কিলোমিটার দূরে, এমন সময় নতুন এক সংকট এসে মাথাচাড়া দিল–

সাসক্রুগি। এ হল জমাট বাঁধা বরফের ঢেউ, বাতাসের কারণে সৃষ্ট ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের ঢেউয়ের মতোই এ ঢেউ ওঠে নামে। ফলে ট্রাক্টরের গতি ধীর হয়ে এল। আমরা সাসক্রুগির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে মন্থর গতিতে আরো ঘণ্টা চারেক এগোলাম এবং যাত্রাবিরতি নিলাম আটটা নাগাদ।

সংক্ষিপ্ত নাশতা সেরে নিল সবাই, তবে আমি এমন পরিশ্রান্ত ছিলাম মুখে তুলতে পারলাম না কিছুই। গত তিনদিন ধরে ঘুমাবার সুযোগ পাইনি। শরীরের শক্তি জড়ো করে হিলক্রেস্টের সঙ্গে রেডিওতে যোগাযোগ

করলাম।

মাহলার এবং মেরি লিগার্ড ছাড়া অন্য সবাই হিলক্রেস্টের সঙ্গে আমার কথোপকথন শুনতে পেল। অন্য কোনো মানুষের কণ্ঠ শুনে ওরা যেন আরাম পেল, যদিও অনেক দূর থেকে ভেসে আসছিল কণ্ঠটি।

'কী খবর?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইলাম আমি।

'খবর ভালো', জবাব দিলেন হিলক্রেস্ট। 'পেট্রোল পরিশোধনের পরামর্শটি দারুণ কাজে লেগেছে। আমরা ভিন্ডেরি নুনাটাক্স-এর দিকে এগোচ্ছি, আজ বিকেলের মধ্যে ওটা পার হয়ে যাব বলে আশা করছি।' খবর সত্যি ভালো তবে আমাকে দেয়ার মতো খবর আরো বাকি ছিল তার।

'আপনারা কী বহন করছেন সে বিষয়ে কিছু অফিসিয়াল তথ্য চলে এসেছে আমার কাছে। ওটার মূল্য এক মিলিয়ন পাউন্ড। এ জন্যই সরকার এ বিষয়ে আগে মুখ খুলতে চায়নি এবং এমন বিশাল সার্চ শুরু হয়েছে। এয়ারক্রাফট-ক্যারিয়ার ট্রাইটন নিজে আসছে জিনিসটি সংগ্রহ করতে।'

'ফর হেভেনস শেক!' চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। 'কী জিনিসের কথা বলছেন আপনি? প্লেনে কী ছিল?'

'ওটি একটি গাইডেড-মিসাইল মেকানিজম। সাংঘাতিক অ্যাডভান্সড এবং গোপনীয় জিনিস যার কথা আমেরিকার দু-একজন বিজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ জানে না। এরকম জিনিস একটিই তৈরি করা হয়েছে এবং ওটি ব্রিটেনে পাঠানো হচ্ছিল যাতে ওখানকার বিজ্ঞানীরা মেকানিজমটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

এক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, 'ওই মেকানিজম যাতে মন্দ লোকের হাতে না পড়ে সে জন্য ওটা উদ্ধারে দু'দেশের সরকার যে কোনো পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। জিনিসটা চেনার উপায় বাতলে দিচ্ছি, ড. ম্যাসন। ওটা পোর্টেবল মেটাল রেডিওর মতো দেখতে, সঙ্গে চামড়ার হাতল রয়েছে। ওরকম কোনো রেডিও যদি আপনার চোখে পড়ে, ড. ম্যাসন, তাহলে–'

বাক্যের শেষটুকু আর শুনতে পেলাম না আমি, যাগেরো, পা বাঁধা অবস্থায় নিজের আসন থেকে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল কোরাজ্জিনির ওপর। সে কোটের পকেট থেকে কী যেন বের করতে যাচ্ছিল। কোরাজ্জিনি চট করে একপাশে সরে গেল, তবে যাগেরোর ডান হাতের ঘুষি এত জোরে আঘাত করল তাকে যে, সে দেশলাই কাঠির মতো ছিটকে পড়ল মাটিতে। আমি এত জোরে কাউকে কোনোদিন আঘাত করতে দেখিনি। কয়েক সেকেন্ড কেউ কোনো কথা বলল না। শেষে ফিসফিস করে আমি বললাম,

'তাহলে কোরাজ্জিনিই নাটের গুরু!'

'অবশ্যই কোরাজ্জিনি সব কিছুর জন্য দায়ী।' বলল যাগেরো। কোরাজ্জিনির কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটি পিস্তল বের করে আনল। বলল, 'এটি আপনার কাছে রেখে দিন, ডক্টর।'

সে আমার দিকে পিস্তলটি ছুড়ে দিল। আমি ওটা লুফে নিলাম। এমন অদ্ভুত টাইপের আগ্নেয়াস্ত্র কোনোদিন দেখিনি। আমি ওটা মেঝেয় রেখে নিজের অস্ত্র বের করে তাক করলাম ঘুষি খেয়ে অচেতন কোরাজ্জিনির দিকে।

'কিন্তু... কিন্তু তুমি কী করে জানলে।' বললাম আমি। 'কী করে বুঝলে ও-ই ছিল অপরাধী?'

'আমি নিশ্চিত ছিলাম ওই খুনি। কারণ আমি খুনগুলো করিনি। সলিও ওর জন্য দায়ী নয়। তাহলে দায়ী কোরাজ্জিনি।'

'হ্যাঁ, কোরাজ্জিনিই দায়ী।' বললাম আমি। পরিষ্কারভাবে কিছু চিন্তা করতে পারছি না আমি। সবকিছু কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে আঁতকে উঠলাম। 'কিন্তু ওরা তো ছিল দুজন। কোরাজ্জিনিকে নিশ্চয় কেউ সাহায্য করছিল–'

কথা শেষ করতে পালাম না, প্রচণ্ড জোরে একটা ধাতব জিনিস দিয়ে বাড়ি মারা হল আমার কব্জিতে। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল পিস্তল। এর পরপর আমার ঘাড়ের পেছনে সজোরে ঠেসে ধরা হল ছোট এবং শক্ত কী যেন।

'ডোন্ট মুভ, ড. ম্যাসন,' ভেসে এল রেভারেন্ড স্মলউডের কণ্ঠ। তবে তার গলার স্বর হিমশীতল। 'তোমার হাতের অস্ত্রটি ফেলে দাও, জ্যাকস্ট্র'। হুকুম করল সে। 'এক পা নড়েছ কী আমি গুলি করে দেব ড. ম্যাসনকে।'

কোরাজ্জিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে আবার খাড়া হয়েছে। স্মলউড তাকে তার অস্ত্র দিল। 'গেট আউট!' অস্ত্র বাগিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল কোরাজ্জিনি। 'সবাই বেরোও এবং জলদি!'

মাহলার এবং মেরি লিগার্ডকে বয়ে নিয়ে ট্রাক্টর কেবিন থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। স্মলউডের নির্দেশে তার এবং কোরাজ্জিনির সামনে সার বেঁধে দাঁড়াতে হল। এদিকে জোরেশোরে তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে।

স্মলউড আমাকে উদ্দেশ করে বলল, 'রেডিও কলটি আপনি এখনো শেষ করেননি, ড. ম্যাসন। শেষ করুন। আপনার দেরি দেখে আপনার বন্ধু হিলক্রেস্ট নিশ্চয় মনে মনে অবাক হচ্ছেন। তবে সাবধান, তার মনে যেন কোনো সন্দেহ না জাগে। আর সংক্ষেপ কথা সারবেন।'

সংক্ষেপেই কথা সারলাম। দেরির জন্য একটা অজুহাত দেখিয়ে শান্ত গলায় উপসংহার টানলাম, 'আপনাকে দুপুরে আবার কল করব, ক্যাপ্টেন হিলক্রেস্ট। দিস ইজ মে ডে কলিং অফ। মে ডে, মে ডে।'

রেডিওর সুইচ অফ করে দিলাম আমি। মাত্র এক কদম এগিয়েছি, স্মলউড আমার পেটে ঠেসে ধরল পিস্তল। 'মে ডে? এ কথার মানে কী?'

'আমরা কোনো কল শেষ করার সময় এ সংকেত বাক্যটি উচ্চারণ করি।'

'আপনি মিথ্যা কথা বলছেন', শীতল, নির্মম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে স্মলউড। ও চোখ হত্যাকারীর।

'আমি মিথ্যা কথা বলছি না', ক্রুদ্ধ গলায় বললাম আমি।

'সত্যি বলুন নয়তো পাঁচ গণার পরে আপনাকে আমি হত্যা করব। এক, দুই, তিন–'

'আমি বলছি ও কথার অর্থ কী?' চেঁচিয়ে উঠল মার্গারেট রস।' 'মে ডে হল কোনো জরুরি অবস্থায় সাহায্য চাইবার জন্য আন্তর্জাতিক এয়ার সাইন,' বলেই কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। 'ওকে কথাটা না বলে আমার উপায় ছিল না, ড. ম্যাসন। বাধ্য হয়ে বলেছি। নইলে ও আপনাকে খুন করত।'

'সত্যি করতাম,' বরফশীতল গলায় বলল স্মলউড। 'তবে আপনার সাহস আছে বটে, ড. ম্যাসন।'

'তুমি কখনই সফল হবে না, স্মলউড', বললাম আমি। 'জাহাজ, প্লেন, এবং হাজার হাজার মানুষ তোমাদেরকে খুঁজছে।'

'সে পরে দেখা যাবে। কোরাজ্জিনি বাক্সটা নাও। ড. ম্যাসন, ড্রাইভারের আসন থেকে ম্যাপটা নিয়ে আসুন।'

আমি ম্যাপ নিয়ে এসে দেখি কোরাজ্জিনি ট্রাক্টরের সামনে বসে আছে। তার হাঁটুর ওপর স্মলউডের স্যুটকেস। প্রার্থনার বই এবং ধর্মযাজকের পোশাক ছুড়ে ফেলে দিয়ে নিচে থেকে একটি ধাতব বাক্স বের করল সে। দেখতে অবিকল টেপরেকর্ডারের মতো। তবে ওটা টেপরেকর্ডার ছিল না। জটিল একটি যন্ত্র তাতে একটি কম্পাসসহ নানা সুইচ এবং কন্ট্রোল রয়েছে। কোরাজ্জিনি বেশ কয়েকটি সুইচ টিপতেই মেশিন থেকে উচ্চকিত শব্দ ভেসে এল।

স্মলউডের দিকে তাকাল সে। 'আমরা দারুণ সিগন্যাল পাচ্ছি। ডিরেকশন ২৬৮।'

স্মলউডের চেহারায় কোনো অভিব্যক্তি ফুটল না। এই পেশাদার লোকগুলো প্রতিটি পরিকল্পনা করেছে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এবং ভীতিকর

দক্ষতার সঙ্গে। ধাতব বাক্সটি একটি রেডিও ডিরেকশন-ফাইন্ডার আর কোরাজ্জিনি কোথাও থেকে পূর্ব-নির্ধারিত রেডিও সিগন্যাল পাচ্ছে। হয়তো কোনো জেলে নৌকা কিংবা কোনো সাবমেরিন থেকে। ওরা হয়তো তীরের কাছাকাছি রয়েছে যেখানে ওদের বন্ধুরা ওদের জন্য অপেক্ষা করবে।

স্মলউড আমাকে ডেকে বলল, 'ড. ম্যাসন এদিকে আসুন। ম্যাপে আমাদের সঠিক অবস্থানটি দেখিয়ে দিন।'

'নরকে যাও তুমি', খেকিয়ে উঠলাম আমি।

'হুম, জানতাম আপনি আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন না। তবে আমি অন্ধ নই। লক্ষ করেছি আমাদের স্টুয়ার্ডেসের প্রতি আপনার একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। আমার কথামতো কাজ না করলে আমি মিস রসকে গুলি করব।'

ওযে ওমন কাজ করতে পারে সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। তাই আমাদের পজিশন ওকে বলে দিলাম। জ্যাকস্ট্রকে বলতে সে-ও তামিল করল হুকুম। আমাদের দুজনকে আলাদাভাবে জেরা করা হলেও দুজনের জবাবই ছিল অভিন্ন। আমরা ওদেরকে ভুল পজিশন বলিনি। স্মলউড কোরাজ্জিনির দিকে ফিরে মাথা দোলাল। 'আমরা কাংগালাক গ্লেসিয়ারের পাদদেশের একশো কিলোমিটার দূরে রয়েছি–'

'তাহলে তোমরা কেন প্লেনটা ওখানে ল্যান্ড করালে না? এতসব ঝামেলাও পোহাতে হতো না।' বললাম আমি।

এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিল না স্মলউড। ঘুরিয়ে বলল, 'ক্যাপ্টেনের মৃত্যু তার পাওনা ছিল। আমি তাকে হুকুম করেছিলাম কাংগালাক গ্লেসিয়ারের কাছে, উপকূলের ধারে ল্যান্ড করতে সেখানে আমাদের... আ, আমাদের বন্ধুরা একটি জায়গা নির্ধারণ করে রেখেছিল, পাঁচ কিলোমিটার লম্বা, একদম সমতল, অবতরণের জন্য দারুণ জায়গা। প্লেনটা কত উঁচু দিয়ে উড়ছিল খেয়াল করিনি আমি। ক্র্যাশের আগে বুঝতে পারি লোকটা আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছে।' কোরাজ্জিনির দিকে তাকাল সে। 'চলো। রওনা হওয়া দরকার।'

'তোমরা আমাদের এখানে ফেলে রেখে যাবে যাতে শীতে ধুঁকে ধুঁকে আর অনাহারে মারা যাই?' তিক্ত গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আপনাদের ভাগ্যে যাই থাক তা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই,' বলল সে। 'তবে আপনারা আমাদের পেছনে ধাওয়া করলেও সে ঝুঁকি তো নিতে পারি না। কোরাজ্জিনি, স্লেজ থেকে কিছু রশি নিয়ে এসে ওদের পা বেঁধে ফেলো। তোমরা সবাই বরফের ওপর বসে থাকো। ঠিক আছে,

কোরাজ্জিনি, সবার আগে ড. ম্যাসনকে বাঁধো।'

নিজের অস্ত্রটি স্মলউডকে দিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এল কোরাজ্জিনি, হাঁটু মুড়ে বরফে বসে রশি দিয়ে আমাকে বাঁধতে শুরু করল।

'না' আমার কণ্ঠ হিংস্র এবং মরিয়া শোনাল। 'জ্যাকস্ট্র, যাগেরো– তোমরা সবাই উঠে দাঁড়াও যদি বাঁচতে চাও। ও যদি আমাদের কাউকে গুলি করে সঙ্গে সঙ্গে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের সবাইকে ও হত্যা করতে পারবে না। তার আগেই আমরা ওকে কজা করে ফেলব। ওদের প্ল্যান আমরা জেনে ফেলেছি। কাজেই ওরা যদি আমাদেরকে বেঁধে ফেলতে পারে তাহলে এক এক করে সবাইকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবে। তখন আর ওদেরকে বাধা দেয়ার উপায় থাকবে না আমাদের!'

এক মুহূর্ত নীরবতা নেমে এল। তারপর স্মলউড বলল, 'ড. ম্যাসন ঠিকই বলেছেন, ওকে যতটা বোকা ভেবেছিলাম ততটা নির্বোধ তিনি নন। তোমাদের সবাইকে একসঙ্গে আমরা কজা করতে পারব না। তোমাদের কেউ না কেউ হয়তো আমাদের কবল থেকে পালিয়ে যাবে। কাজেই তোমাদেরকে বন্দি করে খানিকটা পথ আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়াই শ্রেয়।'

ওরা তাই করল। পরবর্তী নয় ঘণ্টা তীব্র ঝড়োহাওয়া আর প্রবল বরফপাতের মধ্যদিয়ে চললাম আমরা। এভাবে পাড়ি দিতে হবে পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ। সারাক্ষণ কোরাজ্জিনি একাই চালাল গাড়ি আর স্মলউড ট্রাক্টর কেবিনের পেছনে বসে আমাদের দিকে সার্চলাইট ও বন্দুক তাক করে রইল। ট্রাক্টর স্লেজে গাদাগাদি করে বসতে হয়েছে আমাদেরকে, স্মলউডের কাছ থেকে তিন মিটার দূরে। মার্গারেট এবং হেলেনকে ট্রাক্টর কেবিনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে হাত বেঁধে জিম্মি হিসেবে।

আমরা রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পরে জ্যাকস্ট্র কী একটা জিনিস আমার হাতে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কোরাজ্জিনির ওয়ালেট। যাগেরোর সঙ্গে মারামারির সময় ওর পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। এখনো জানে না সে জিনিসটা হারিয়েছে।'

টর্চলাইটের আলোয় কোরাজ্জিনির ওয়ালেট খুলে ভেতরে খবরের কাগজের সেই লেখাটি দেখতে পেলাম যেটি কর্নেল হ্যারিসনের লাশের পকেট থেকে আমি নিয়েছিলাম। জোরে জোরে লেখাটি পড়লাম। ট্রাক্টর ইঞ্জিনের গর্জন আর বাতাসের হুঙ্কারে আমাদের কথা স্মলউড শুনতে পাচ্ছিল না।

প্লেনে বসে লেখাটিতে একনজর বুলিয়েই বুঝতে পেরেছিলাম এটা নিউজার্সির একটি ট্রেন দুর্ঘটনার খবর। যাত্রীবাহী ট্রেনটি ব্রিজ ভেঙে নদীতে

পড়ে গিয়ে বহু যাত্রীর প্রাণসংহার করে। তবে লেখাটির মূল বিষয় ছিল ট্রেনে একজন সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন যিনি চল্লিশ নিহত যাত্রীর মধ্যে একজন। এই কর্মকর্তাটি একটি 'সুপার সিক্রেট গাইডেড মিসাইল মেকানিজম' সঙ্গে বহন করছিলেন।

দীর্ঘক্ষণ নীরবতা বিরাজ করল ওখানে। শেষে নীরবতা ভেঙে জ্যাকস্ট্র বলল, 'এখন বুঝতে পারছি কেন আপনাকে মেরে অজ্ঞান করে দেয়া হয়েছিল।'

যাগেরো অবাক হয়ে প্রশ্ন করল 'আপনাকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল? কিন্তু কেন?'

আমি ওকে জানালাম কীভাবে কর্নেল হ্যারিসনের লাশের পকেটে খবরের কাগজের আর্টিকেলটা পেয়েছিলাম এবং তারপর কীভাবে এটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়।

'কিন্তু আপনাকে মারল কেন?' জিজ্ঞেস করল যাগেরো। 'আপনি আর্টিকেলটা পড়লে ওদের সমস্যা কী?'

ব্যাপারটা 'বুঝতে পারছ না?' অধৈর্য গলায় বললাম আমি। দুটো দুর্ঘটনা একই রকম বলে আমি যদি দুটিকে মিলিয়ে দেখে কিছু সন্দেহ করে বসি। তারপর হিলক্রেস্টের কাছে শুনি প্লেনে অত্যন্ত গোপনীয় কিছু একটি বহন করা হচ্ছিল। আর আর্টিকেলটি আমি পেয়েছি একজন সামরিক কর্মকর্তার কাছে। তিনি ওই গোপন জিনিসটা বহন করছিলেন। এখন পুরো ব্যাপারটা যদি আমি জেনে যাই তাহলে প্রতিটি মানুষের লাগেজ আমি সার্চ করব, কোরাজ্জিনির পোর্টেবল রেডিও এবং স্মলউডের টেপ রেকর্ডারটির অস্তিত্ব খোঁজাখুঁজির কারণে প্রকাশ হয়ে যেত। গড, কি বোকা আমি! এ বোকামির কোনো ক্ষমা নেই।'

'বোকামি আমরা সবাই-ই করেছি,' বলল যাগেরো। 'এখন ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল কেন পাণ্ডববর্জিত একটি এলাকায় আমরা ক্র্যাশ করলাম। ক্যাপ্টেন নিশ্চয় জানতেন প্লেনে কী যাচ্ছে, তিনি আমাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও ক্র্যাশ-ল্যান্ড করেন যাতে স্মলউড উপকূলে পৌঁছাতে না পারে।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিলাম আমি বিরস বদনে। 'আরো কিছু বিষয়ও পরিষ্কার হয়ে গেছে।' কোরাজ্জিনি কয়েন টস্ করার ভান করেছিল কেবিনের মেঝেতে শোবার জন্যই যাতে রেডিও অপারেটরকে ঘুমের মধ্যে হত্যা করার সুবিধা হয়।'

সবকিছু দুইয়ে দুইয়ে চার মিলে যেতে সবাই কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল।

তারপর সলি নেভিল জানতে চাইল, 'কিন্তু প্লেনে আগুন লাগল কীভাবে?'

'ওরা জানত আমাদের কেবিনে এসে হিলক্রেস্ট যখন দেখবেন পেট্রোলের ভেতরে চিনি মেশানো হয়েছে তিনি তখন প্লেনের পেট্রোল ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন' ব্যাখ্যা দিলাম আমি। 'তাই ওরা প্লেনে আগুন লাগিয়ে দেয় যাতে হিলক্রেস্ট প্লেনের পেট্রোল ব্যবহার করতে না পারেন।'

আবার নীরবতা। শেষে যাগেরো বলল, 'আমার তরফ থেকেও একটি ব্যাখ্যা বাকি রয়ে গেছে। ব্যাখ্যাটি এ মানুষটির বিষয়ে', সে সলি লেভিনের কাঁধে হাত রাখল। 'ইনি আমার বাবা।'

'কী? তোমার বাবা?'

'জি, ডক্টর ম্যাসন।' বলল লেভিন। 'আমি যাগেরো টাইটেল ব্যবহার করি না কারণ একজন বক্সারের ঘনিষ্ঠ কোনো আত্মীয় তার ম্যানেজার হতে পারে না। নিয়ম নেই। আমি যে যাগেরোর বাবা সে কথা এ কারণেই কাউকে বলি না। তবে এতে তো কারো কোনো ক্ষতি হচ্ছে না।'

'এবারে কিন্তু ক্ষতি হয়েছে,' বললাম আমি। 'আপনাদের দুজনের মধ্যেকার আসল সম্পর্কটি যদি আমার জানা থাকত, সম্ভবত, আপনাদের আমি সন্দেহের কাতারে ফেলতাম না। তাহলে সন্দেহভাজনের তালিকায় শুধু থাকত কোরাজ্জিনি আর স্মলউড। সে যাকগে, আবারও একটা বোকামি করে ফেললাম এই যা!'

বিকাল পাঁচটার দিকে থেমে গেল ট্রাক্টর। কোরাজ্জিনি ঢুকল কেবিনে। স্মলউডকে জানাল উপকূল আর পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। স্মলউড তাকাল আমাদের দিকে। 'ঠিক আছে, এখানেই তোমাদের সবাইকে নেমে পড়তে হবে। নামো সবাই।'

ঠাণ্ডায় শরীর এমন আড়ষ্ট, নড়াচড়া করতে পারছিলাম না। 'আমাদের জন্য অন্তত কিছু খাবার, একটা তাঁবু আর কুকুরের স্লেজটা রেখে যাও না?' মরিয়া হয়ে বললাম আমি। 'মাহলার এবং মেরি লিগার্ড একদমই হাঁটতে পারবে না।'

'তোমরা বেহুদা সময় নষ্ট করছ,' বলল সে। 'নামো বলছি!'

লেভিন যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল। 'আমি হাঁটতে পারছি না। আমার পাগুলো জমে বরফ হয়ে গেছে।'

'একটা গুলি ঢুকিয়ে দিলেই তোমার পা আবার নড়াচড়া শুরু করে দেবে।' শীতল গলায় বলল স্মলউড।

যাগেরো ঝট করে এগিয়ে এল সামনে। 'খবরদার ওকে স্পর্শ করবে না, স্মলউড।' হুমকির সুরে বলল সে। 'আমার বুড়ো বাবার ওপর একটা

আঙুল তুলেছ কী তোমার ঘাড়টা পচা গাজরের মতো মট করে ভেঙে ফেলব।'

যাগেরোর চেহারা দেখে কথাটা বিশ্বাস হল আমার। স্মলউডেরও বোধ হয় তাই।

'তোমার বাবা?' অন্যমনস্ক সুরে বলল সে, 'এই লোকটি তোমার বাবা?'

মাথা ঝাঁকালো যাগেরো।

'বেশ। জার্মান মেয়েটার সঙ্গে একে বিনিময় করব আমরা। ওই মেয়েটির ব্যাপারে কারো কোনো মাথা ব্যথা নেই।' লেভিনকে ধরে নিয়ে যাওয়া হল ট্রাক্টর কেবিনে। স্মলউড হেলেনের দিকে ফিরে বলল, গেট আউট!'

তারপরই ঘটল ঘটনাটা। হেলেন স্মলউডের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হুমড়ি খেল, স্মলউড একটা হাত বাড়িয়ে দিল হয় তাকে ধরার জন্য নতুবা ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে। আর তক্ষুনি স্মলউডকে সজোরে লাথি কষাল হেলেন। লাথি মেরে হাত থেকে ফেলে দিল পিস্তল। স্মলউড সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালের মতো লাফ মেরে মেঝে থেকে তুলে নিল অস্ত্রটি এবং তাক করল হেলেনের দিকে। প্রচণ্ড রাগে জ্বলছে চোখ। চিৎকার দিল মিসেস ডেন্সবি গ্রেগ। 'হেলেন! সাবধান!' সে ঝড়ের বেগে ছুটে এসে ধাক্কা মেরে তার চাকরানিকে সরিয়ে দিল একপাশে। আর ঠিক ওই মুহূর্তেই গুলি করে বসেছে স্মলউড। গুলিটি সোজা গিয়ে বিধল ভদ্রমহিলার শিরদাঁড়ায়। সে বরফের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

স্মলউড কোরাজ্জিনিকে ইশারা করে ট্রাক্টরে ঢুকে পড়ল, অস্ত্রটি এখনো আমাদের দিকে তাক করা। ইঞ্জিন চালু করল কোরাজ্জিনি। চলতে শুরু করল গাড়ি। আমরা বরফের ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম। একাকী ছোট্ট একটি দল। আমাদের পায়ের কাছে পড়ে আছে এক নারীর লাশ, দেখছি চলে যাচ্ছে ট্রাক্টর, ট্রাক্টর স্লেজ কুকুরের স্লেজ এবং কুকুরগুলো– সবকিছু হারিয়ে গেল আঁধারে।

কথা বলে উঠল জার্মান মেয়েটা। 'হেলেন!' অদ্ভুত গলায় বলল সে। 'উনি আমাকে আমার নাম ধরে ডাকলেন!' আমি ওর দিকে একবার তাকালাম তারপর ফিরে চাইলাম ট্রাক্টরটা যে পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেদিকে।

এগারো

শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে শনিবার বেলা ১২:১৫

সে রাতে যে অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করলাম আমরা, তা ভুলে যাওয়ার নয়। ট্রাক্টরের পেছনে কত ঘণ্টা হেঁটেছি আমরা? ছয় ঘণ্টা, আট নাকি দশ? ঠিক মনে নেই। সে রাতে সময়ের কোনো হিসাব ছিল না আমাদের কাছে।

রাগ এবং ভয় আমাদের চালিকাশক্তি ছিল। ঝড়ের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল দ্বিগুণ, বরফ আর তুষারের দেয়াল উড়িয়ে নিয়ে আসছিল আর্তনাদ করতে থাকা বাতাস। অমন বাতাসে হাঁটা অসম্ভব হয়ে যেত যদি হাওয়াটা সামনে থেকে আসত। কাংগালাক গ্লেসিয়ারের খাড়া, সরু উপত্যকা থেকে ধেয়ে আসা বাতাস আমাদের পিঠে আছড়ে পড়ছিল।

আমাদের পিঠ ব্যথায় টনটন করছিল শুধু বাতাসের চাবুকের আঘাতে নয়, যে তিনজন মানুষ হাঁটতে পারছিল না তাদেরকে পালাক্রমে আমরা পিঠে বয়ে নিয়ে চলছিলাম। অজ্ঞান মাহ্লারকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিঠে বয়ে নিয়ে চলল মানেরো। জ্যাকস্ট্রর পিঠে হেলেন। ট্রাক্টর অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। আমি অচেতন মেরি লিগার্ডকে বইছি। ব্রুস্টার দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন তবু মাঝে মাঝেই তিনি তিন অজ্ঞান যাত্রীর কাউকে না কাউকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও নিজের পিঠে সওয়ার করছিলেন। তবে পা যখন আর চলতে চায় না তখনই কেবল তিনি হাল ছেড়ে দিচ্ছিলেন।

স্মলউড এবং কোরাজ্জিনি ভেবেছিল ওই রাতটি আমরা আর টিকতে পারব না, মারা যাব। সত্যি মরে যেতাম যদি বাল্টো ফিরে না আসত আমাদের কাছে। প্রভুভক্ত কুকুর সর্দার আমাদের কথা ভোলেনি। ট্রাক্টরটি আমাদেরকে ফেলে চলে যাওয়ার কিছু পরই ছুটতে ছুটতে বরফের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে বাল্টো এবং আমাদেরকে কাংগালাক গ্লেসিয়ার হয়ে উপকূলের দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

তখন রাত তিনটার মতো বাজে, নেকড়ের গলায় একটি ডাক দিয়ে অকস্মাৎ থেমে দাঁড়াল বাল্টো। কান পেতে শুনল প্রত্যুত্তর, তারপর পরিবর্তন করল দিক। তিন মিনিট পর কুকুরদের স্লেজটি চোখে পড়ল আমাদের। ট্রাক্টরের পেছনে তাকে টেনে নিয়ে যেতে নিশ্চয় ঝামেলা হচ্ছিল স্মলউডের, তাই সে ওটা পরিত্যক্ত করেছে।

আমরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্লেজে তুলে দিলাম মাহলার, মেরি লিগার্ড এবং হেলেনকে। ব্রুস্টার বসলেন পেছন দিকে, অজ্ঞান অবস্থায় ওরা যাতে স্লেজ থেকে গড়িয়ে পড়ে না যায় সে খেয়াল রাখতে। অন্ধকারে আবার যাত্রা শুরু করলাম আমরা। তিনজনে মিলে গ্লেসিয়ারের মসৃণ বরফের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চললাম স্লেজ। তবে আমাদের চলার গতি খুব একটি দ্রুত নয়। বাতাসের বেগ তখন এত বেশি আর এমন ঘন তুষারপাত হচ্ছে, শীঘ্র থেমে দাঁড়াতে হল আমাদেরকে। তুষার ঝড় একটু কমে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম।

বাতাসের কবল থেকে মুক্তি পেতে বরফে গর্ত খুঁড়লাম আমরা। স্লেজ থেকে তিন অচেতন যাত্রীকে নামিয়ে গর্তে শুইয়ে দিলাম। কাজটি করতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে এমন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে খেয়ালই করিনি ব্রুস্টার স্লেজে নেই। যখন চোখে পড়ল ব্যাপারটা, চিৎকার দিয়ে উঠলাম, 'গুড গড! সিনেটর নেই। আমি ওনাকে খুঁজতে গেলাম।'

'না, যাবেন না।' বাধা দিল জ্যাকস্ট্র। 'গেলে আর পথ চিনে ফিরে আসতে পারবেন না!'

সে বাল্টোকে পাঠাল সিনেটরের সন্ধানে। দুই মিনিট পরই ফিরে এল বাল্টো। ওকে অনুসরণ করে ব্রুস্টারকে খুঁজে পেলাম আমরা। উপুড় হয়ে পড়ে আছেন বরফে। মৃত। তুষার ঝড় ইতিমধ্যে বরফের সাদা কম্বলে তার শরীর প্রায় ঢেকে দিয়েছে। এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি বরফের নিচে পুরোপুরি কবর হয়ে যাবেন। তাকে আর আমার পরীক্ষা করে দেখতে হল না। পঞ্চাশ বছর ধরে অতিভোজন আর মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান তার হৃৎপিণ্ড মারাত্মক রকম দুর্বল করে দিয়েছিল। তবে এই ভয়ঙ্কর যাত্রায় তিনি সাহস এবং সংকল্পের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন।

আমরা বরফের গর্তের মধ্যে একে অন্যের গায়ে গা ঘেঁষে বসে রইলাম তুষার ঝড় থামা পর্যন্ত। ঘুমিয়েও পড়েছিলাম বোধহয়। ঘুম ভাঙল ভোর চারটার দিকে। আমার সঙ্গীদের দিকে তাকালাম। কোনো সন্দেহ নেই মারা যাচ্ছে মাহলার। আর বারো ঘণ্টাও টিকে থাকবে কি না সন্দেহ। বেঁচে থাকার প্রতি সমস্ত আগ্রহ যেন হারিয়ে ফেলেছে হেলেন। কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মেরি লিগার্ড জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। যাগেরোর হাত

ফ্রস্টবাইটে এমন আক্রান্ত হয়েছে, আর কোনোদিন বক্সার হিসেবে লড়াইয়ের ময়দানে নামতে পারবে না সে।

অসুস্থ মানুষগুলোকে স্লেজে বসিয়ে আবার রওনা হলাম আমরা। আটটা নাগাদ থেমে গেল ঝড়। তবে আমাদের গতি অতি মন্থর। কাংগালাক গ্লেসিয়ারের বরফ এখন ভীষণ কঠিন, তাতে অসংখ্য ফাটল। আইস-রকের প্রচণ্ড সব খাম্বা আর হিমবাহের গভীর ফাটলের মাঝখানে নিরাপদ রাস্তা খুঁজছিলাম আমরা। ভাবতে কষ্টই হচ্ছিল যে হিলক্রেস্ট এখন আমাদের খুব কাছাকাছি রয়েছেন অথচ রেডিওর অভাবে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারছি না আমরা কিংবা তিনিও আমাদেরকে খুঁজে পাবেন না।

সকাল সাড়ে আটটার দিকে হঠাৎ ট্রাক্টর স্লেজটি চোখে পড়ল আমাদের। তাকে টেনে নিয়ে যেতেও নিশ্চয় ঝামেলা হচ্ছিল স্মলউড আর কোরাজ্জিনির, তাই ওটা ফেলে রেখে গেছে ওর সমস্ত উপকরণসহ– তবে রেডিও ছাড়া। স্লেজে পাওয়া কম্বল দিয়ে মাহলার এবং মেরি লিগার্ডকে ভালো করে মুড়ে দিয়ে ফের হাঁটা দিলাম আমরা। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার। আমি হা হা করে হাসতে লাগলাম।

'মাই গড ওটার কথা ভুলেই গেছিলাম আমি!'

'কীসের কথা ভুলে গেছিলেন, ডক্টর?' অসহিষ্ণু স্বরে প্রশ্ন করল মানেরো।

'ট্রাক্টর স্লেজে চল। দেখাচ্ছি। স্মলউড গর্ব করে বলে কোনোকিছুই নাকি তার চোখ এড়ায় না। কিন্তু একটা জিনিস তার চোখ এড়িয়ে গেছে এবং এখানে সে মস্ত একটা ভুলও করে বসেছে।'

আমরা ছুটে ফিরে এলাম স্লেজে। আমাদের নানান বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের মধ্যে ওগুলোকে দেখতে পেলাম। ও দুটো জিনিসই আমার উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং হাসির কারণ। একটি হল ম্যাগনেসিয়াম ফ্লেয়ার। আইস-ক্যাপে নিজেদের অবস্থান জানাতে এক্সপিডিশনে আমরা এ ধরনের ফ্লেয়ার জ্বালাই। অন্য জিনিসটি হল রেডিও বহনকারী বেলুন। এ বেলুনে গ্যাস ভরে আমরা উচ্চতর আবহমণ্ডলে পাঠিয়ে বিশেষ আবহাওয়া তথ্য সংগ্রহ করি।

'এ দুটো জিনিস দিয়ে কি না করতে পারি আমরা!' যাগেরোর দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত স্বরে বললাম আমি। জ্যাকস্ট্র এবং আমি মিলে তিনটে ম্যাগনেসিয়াম ফ্লেয়ার বেঁধে নিলাম একটি বেলুনে, তারপর গ্যাস ভরলাম ওতে, জ্বালিয়ে দিলাম ফ্লেয়ারগুলো এবং অন্ধকার আকাশে উড়িয়ে দিলাম। আমাদের মাথার হাজার মিটার ওপরে বিস্ফোরিত হল ফ্লেয়ারগুলো উজ্জ্বল আলোর ঝরনা ছড়িয়ে।

'দারুণ,' মন্তব্য করল যাগেরো, 'দারুণ।'

আরো দুটো ফ্লেয়ার আকাশে উড়িয়ে দিলাম বেলুনে বেঁধে। ফ্লেয়ারের আলো সবার চোখে পড়বে। দেখতে পাবেন হিলক্রেস্ট, উপকূলের ধারের জাহাজ এবং আমাদের সন্ধান করতে থাকা প্লেনগুলোও মিস করবে না আলোর ঝরনাধারা। তবে তক্ষুনি ভয়ানক একটি দুশ্চিন্তা আমার উৎসাহটাকে ফাটা বেলুনের মতো চুপসে দিল। সবার মতো ফ্লেয়ারের আলো কোরাজ্জিনি এবং স্মলউডও দেখতে পাবে। তারা বুঝে যাবে সার্চ পার্টি ক্রমে তাদের দিকে ধাইয়ে আসছে। ওরা খুনে, এখন ওরা ভীত এবং মরিয়া হয়ে উঠবে। আর ওদের সঙ্গে বন্দি হিসেবে আছে যাগেরোর বাবা এবং মার্গারেট।

কিন্তু আমাদের কোনো উপায় ছিল না। মাহলার এবং মেরি লিগার্ড মরতে বসেছেন। তিন নম্বর ফ্লেয়ারটাও বিস্ফোরিত হল। উজ্জ্বল আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। বুজে গেল চোখ।

জ্যাকস্ট্রর হাতের স্পর্শ পেলাম আমার বাহুতে। তাকালাম চোখ মেলে। বহুদিন পর ওর মুখে হাসি ফুটতে দেখলাম। উজ্জ্বল আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল সে। ওখানে লাল এবং সাদা আলো নিয়ে জ্বলছে একটি রকেট ফ্লেয়ার। আমাদের সাহায্যের আবেদনে সাড়া মিলেছে!

আকাশে ওই রকেটটি মনে হল একটি দুর্লভ দৃশ্য। রকেটটি দেখে যা খুশি হলাম! অমন খুশি জীবনে লাগেনি। কুড়ি মিনিট পর হিলক্রেস্টের বৃহদাকার এবং আধুনিক স্নো-ট্রাক্টরটিকে ছোট একটি পাহাড় চুড়োয় দেখেও অমন আনন্দিত হইনি। তবে হিলক্রেস্টের ট্রাক্টর দেখে পাগলের মতো হাত নাড়তে লাগলাম আমরা। দশ মিনিট বাদে ওটা আমাদের সামনে এসে হাজির হল। তবে ওই সময়টুকুকেই মনে হচ্ছিল অনন্তকাল।

হিলক্রেস্টের চমৎকার সজ্জিত ট্রাক্টরের আরাম আর উষ্ণতার মাঝে আমরা আশ্রয় নিলাম। মাহলার, মেরী লিগার্ড এবং হেলেনকে উষ্ণ ও আরামদায়ক বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল। গরম পানীয়, প্লেটভর্তি খাবার এবং সবার ওপরে এক গ্লাস হুইস্কি দিয়ে আপ্যায়ন করা হল আমাদেরকে। তবে আরাম করার ফুরসত আমাদের ছিল না।

'একটি প্লেন চলে আসবে শীঘ্র,' জানালেন হিলক্রেস্ট। ওতে মাহলারের জন্য ইনসুলিন নিয়ে আসা হচ্ছে। আমরা আরো তিনটে রকেট এবং ম্যাগনেসিয়াম ফ্লেয়ার ছুড়ে জানিয়ে দেব ঠিক কোথায় ফেলতে হবে ইনসুলিন। আধাঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে মাহলারকে ইনসুলিন ইনজেকশন দিতে পারব আমরা।'

খুব ভালো খবর তবে তাতে আমার দুশ্চিন্তা দূর হল না। হিলক্রেস্টকে

অতি সংক্ষেপে আমাদের গল্প বললাম। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। 'স্মলউড এবং কোরাজ্জিনি যদি আমাদের থেকে খুব বেশি দূরে না থাকে, আমরা যত দ্রুত সম্ভব ট্রাক্টর চালিয়ে ওদেরকে ধরে ফেলব– সেই সঙ্গে কেড়ে নেব গোল্ডেন মেকানিজম।'

'না, তা উচিত হবে না,' মৃদু গলায় বললাম আমি। 'ওরা যদি দেখে আমরা ওদেরকে ধাওয়া করেছি, সোজা মার্গারেট এবং লেভিনের মাথায় দুটা গুলি ঢুকিয়ে দেবে। আর আপনাকে বলা হয়নি লেভিন হলেন যাগেরোর বাবা। আমাদের এখন যা করতে হবে তা হল ওদের চোখের আড়ালে থেকে চলতে হবে। ওদের ট্রাক্টর থেকে আমরা দুই-তিন কিলোমিটার দূরে থাকব। গ্লেসিয়ার উপত্যকা যেখানে সমতল হয়ে আছে আর বরফ সেখানটায় আরো মসৃণ, আমরা সেখানে ওদের আগে আগে পৌঁছে গিয়ে লুকিয়ে পড়ব এবং সুযোগ বুঝে ওদের ওপর হামলা চালাব।

'কিন্তু তবু তো ওদের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতেই হচ্ছে। ওরা তো লেভিন এবং স্টুয়ার্ডেসের মাথায় বন্দুক ঠেসে ধরে রাখবে,' চিন্তিত গলায় বললেন হিলক্রেস্ট।

'কোনো মারামারি হবে না,' বললাম আমি। 'ওরা গ্লেসিয়ারের বাম দিকে থাকবে, কারণ ওদিকটা দিয়ে গাড়ি চালাতে সুবিধা আর আমরা সেখানে লুকিয়ে থাকব যেখান থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরত্বে হলেই ওদেরকে আমরা দেখতে পাব। জ্যাকস্ট্র আগে গুলি করবে কোরাজ্জিনিকে– ও সম্ভবত ড্রাইভ করবে– তারপর নেবে স্মলউডকে। জ্যাকস্ট্র মার্কসম্যান হিসেবে খুবই দক্ষ আর লং ডিস্ট্যান্স রাইফেল দিয়ে তার টার্গেট মিস হওয়ার কথা নয়।'

'কিন্তু কাজটা করা উচিত হবে না,' আতঙ্কিত গলায় বললেন হিলক্রেস্ট। 'এত মানুষ হত্যা!' জ্যাকস্ট্রর দিকে ফিরলেন। 'তুমি কি সত্যি কাজটি করবে?'

'অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে,' মিহি গলায় জবাব দিল জ্যাকস্ট্র।

হিলক্রেস্ট চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে। জস তার স্তম্ভিত ভাবটা কাটিয়ে দিল। এসে বলল মাহলারের ইনসুলিন সংগ্রহের সময় হয়ে গেছে। আমরা আকাশে ফ্লেয়ার ছোড়ার কয়েক সেকেন্ড পরই একটি প্লেন থেকে দুটো পার্সেল ফেলে দেওয়া হল। আমি ছুটে গিয়ে ওগুলো নিয়ে এলাম। মাহলারের আর মরণের ভয় রইল না।

ঘণ্টা দুই আমরা হিমবাহের বিপজ্জনক উপত্যকা দিয়ে ট্রাক্টর ছোটালাম। খাড়া রাস্তা,, বাঁকগুলো প্রায়ই গভীর খাদ নিয়ে মোড় নিয়েছে। একবার পিছলে গেলে আর দেখতে হবে না। সোজা হাজার ফুট নিচের

পাতালে। দুপুরে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। একটি পাহাড় চুড়োয় এসে পড়েছি আমরা। এখান থেকে মসৃণ আইস-ক্যাপ বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে উপকূল অবধি। কাছেই কাংগালাক হিমবাহ, তিনশ মিটার চওড়া, বাঁক নিয়ে চলে গেছে সমুদ্র অভিমুখে– বরফ জলে ভরা কফিন বেতে। দূরে দুটো জলযান দেখতে পেলাম। এগিয়ে আসছে তীরে। একটা নিঃসন্দেহে ব্রিটিশ এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার; কিন্তু আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল অপরটি। ওটা একটা ফিশিং বোট এবং ওতে কোনো পতাকা লাগানো নেই। বিনোকিউলার চোখে লাগিয়ে আবার মাছ ধরার নৌকাটা দেখলাম আমি... চেঁচিয়ে উঠলাম জসের উদ্দেশে।

'এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের সঙ্গে তোমার এখনো রেডিও যোগাযোগ আছে?'

মাথা ঝাঁকাল জস।

'ওদেরকে বলো একটা ফিশিং বোটে চড়ে দশ-বারোজন মানুষ তীরে আসছে। লোকগুলোর কাছে সম্ভবত অস্ত্র আছে। আমি নিশ্চিত ওরা গ্লেসিয়ারের দিকে যাবে। আমাদের লোকদেরকে বল তীরের লোকগুলোকে যেন হামলা করে– জলদি!'

ঠিক তখন হিলক্রেস্টের উত্তেজিত চিৎকার ভেসে এল বাইরে থেকে। 'ওদের ট্রাক্টর আসছে!'

জ্যাকস্ট্র, হিলক্রেস্ট এবং আমি কয়েকটি বরফ-পাথরের পেছনে আড়াল নিলাম, হাতে রেডি রাইফেল, অপেক্ষা করছি। ট্রাক্টরটি এখনো বেশ দূরে। আমাদের পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে গ্লেসিয়ারের যেদিকটাতে আমরা আত্মগোপন করে আছি সেদিন দিয়ে ওরা যদি আসে তবেই! জ্যাকস্ট্রর দিকে তাকালাম আমি! হিমবাহের মতোই কঠিন এবং শীতল তার মুখ, কোনো অভিব্যক্তি অনুপস্থিত। হিলক্রেস্টকে দারুণ চিন্তিত এবং অখুশি দেখাচ্ছে। খুনোখুনি তার একদমই পছন্দ নয়। আমিও পছন্দ করি না। কিন্তু এ তো মানুষ খুন নয়। এ হল জীবন রক্ষা। মার্গারেট এবং সলি লেভিনের জীবন রক্ষা করছি আমরা।

বরফের ওপর শুয়ে পড়ল জ্যাকস্ট্র, তাক করল বন্দুক, গুলি করার জন্য প্রস্তুত। ঠিক তখন ট্রাক্টর চলে এল দৃষ্টিসীমার মধ্যে। রাইফেল নামিয়ে রাখল জ্যাকস্ট্র। আমি একটি বাজি ধরেছিলাম এবং ওতে হেরে গেছি। ট্রাক্টর হাজির হয়েছে গ্লেসিয়ারের দূর প্রান্তে। স্মলউড এবং কোরাজ্জিনি তিনশ মিটারেরও বেশি দূরে। এত দূরে ওদেরকে গুলি করা অসম্ভব একটি ব্যাপার।

বারো

শনিবার বেলা সোয়া বারোটা থেকে ১২:৩০

অনন্যোপায় হয়ে নতুন একটি পরিকল্পনার কথা ভাবতে লাগলাম আমি। হামলা এড়াতে খুনিরা মার্গারেট এবং লেভিনকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখবে। কিন্তু একবার ওরা ফিশিংবোটে উঠতে পারলে মার্গারেট আর লেভিনের জীবনের দাম কী? ওদেরকে ওরা বাঁচিয়ে রাখতে যাবে কীসের স্বার্থে?

আমার চিন্তার সুতোটা ছিঁড়ে গেল হিলক্রেস্টের কথায়। 'খুনি দুটোর কাছে বোধকরি শেষ পর্যন্ত আমাদের পরাজয়ই ঘটল।'

'আপনি তো তা-ই চেয়েছিলেন, তাই না?' তিক্ত গলায় বললাম আমি।

'কী, আমি এমনটা চেয়েছিলাম! গুড গড, ওই মিসাইল মেকানিজম–'

'জাহান্নামে যাক আপনার মিসাইল মেকানিজম!' রাগে বিস্ফারিত হলাম আমি। 'ওরা ওটা রেখে দিক। ছয় মাসের মধ্যে বিজ্ঞানীরা ওর চেয়ে ভালো জিনিস তৈরি করতে পারবেন।'

আমার দিকে হতভম্বের মতো তাকিয়ে থাকলেন হিলক্রেস্ট। যাগেরো ইতিমধ্যে এসে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে। সে ক্রুদ্ধ গলায় বলল, 'ওই যুদ্ধ খেলনার সে নিকুচি করে, ডক্টর? ওই ট্রাক্টরে আমার বুড়ো বাপটা রয়েছে। আর আপনার গার্লফ্রেন্ড।'

'ওর গার্লফ্রেন্ড?' গিলক্রেস্ট ঘুরলেন, আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন অনেকক্ষণ। 'সরি পিটার। আমি বুঝতে পারিনি।'

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এল জস। উত্তেজনার চোটে হাতে গ্লাভস পরতে আর মাথায় হ্যাট চাপাতে ভুলে গেছে। 'এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার কয়েকজন লোক পাঠিয়েছে তীরে। ওদের বোট এখন ল্যান্ড করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে চার-পাঁচটা প্লেন টেক-অফ করবে। মিসাইল মেকানিজম নিয়ে স্মলউড ওই ফিশিংবোটে চড়ে পালাবার চেষ্টা করলে ওরা বোমা মারবে বোটে।'

পাঁচ সেকেন্ড বাদে একটা বিকট আওয়াজ শুনতে পেলাম। গ্লেসিয়ারের ওপারে, ট্রাক্টরের ইঞ্জিন থেকে আসছে শব্দটা। ট্রাক্টর চালাচ্ছে কোরাজ্জিনি। কিছু একটা দেখেছে কিংবা শুনেছে সে। ভয় পেয়ে এখন সর্বোচ্চ গতিতে উন্মাদের মতো ছুটিয়েছে ট্রাক্টর। খাড়া, পিচ্ছিল, রাস্তায় কেউ অত জোরে গাড়ি ছোটাবার কথা কল্পনাও করবে না।

শেষ জুয়োটা খেলার সিদ্ধান্ত নিলাম আমি। ওরা অমন গতিতে ট্রাক্টর নিয়ে ছুটতে থাকলে হয় গ্লেসিয়ারের গায়ে আছড়ে পড়ে মারা যাবে কিংবা খাদে উল্টে গিয়ে প্রাণ হারাবে। মার্গারেট এবং লেভিনও বাঁচবে না।

'তুমি ট্রাক্টরটা থামাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলাম জ্যাকস্ট্রকে।

আমার চোখে চোখ রেখে সে মাথা ঝাঁকাল। পারবে। কিন্তু আপত্তি জানাল যাগেরো। 'আপনারা ওটা করতে পারেন না! ওরা ওদেরকে মেরে ফেলবে! ওরা ওদেরকে খুন করবে! মাই গড, ম্যাসন, আপনি তো ওই মেয়েটিকে খুব পছন্দ করেন, আপনি–'

'শাটআপ!' খেঁকিয়ে উঠলাম আমি। দ্রুত রাইফেল তুলে নিলাম, সঙ্গে কিছু রশি। 'তুমি যদি ভেবে থাকো ওরা তোমার বাবাকে জ্যান্ত ছেড়ে দেবে, বোকার স্বর্গে বাস করছ তুমি।'

এক সেকেন্ড পরে বরফের ওপর মাথা নিচু করে দৌড়াতে লাগলাম আমি। আমার মাথার ওপর দিয়ে শিস কেটে বেরিয়ে যেতে লাগল জ্যাকস্ট্রর ছোড়া গুলি। প্রথম গুলিটি গিয়ে লাগল ট্রাক্টরের ইঞ্জিনে। কিন্তু ওটা আগের গতিতেই চলতে লাগল। বুলেটে কোনো ক্ষতিই হয়নি।

আমার পেছন পেছন আসছিল হিলক্রেস্ট, জস, যাগেরো এবং গিলক্রেস্টের দলের দুই লোক। আমি প্রাণপণে ছুটছি, লাফ মেরে পার হচ্ছি বরফের ফাটল এবং গর্ত। জ্যাকস্ট্রর বুলেট একের পর এক হাতুড়ির আঘাত হানছে ট্রাক্টরের ইঞ্জিনে; কিন্তু শক্ত ইঞ্জিনের কোনো ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হল না।

আমরা ট্রাক্টর থেকে শ মিটার দূরে, হঠাৎ থেমে গেল ওটা। কোরাজ্জিনি সজোরে ব্রেক কষেছে। ট্রাক্টরের ভেতরে নিশ্চয় সাংঘাতিক কিছু ঘটছে। কাছে যেতে দেখতে পেলাম কী ঘটছে। ধুন্ধুমার লেগে গেছে কোরাজ্জিনি এবং সলি লেভিনের মধ্যে। প্রচণ্ড হাতাহাতি চলছে দুজনে। লেভিন তার ন্যাড়া মাথা দিয়ে কোরাজ্জিনির মুখে আঘাত করছে। ড্রাইভারের দিকের দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। দুজনে দড়াম করে আছড়ে পড়ল জমিনে। তখনো চলছে মারামারি। লেভিনের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। কিন্তু অসম সাহসী বুড়ো মানুষটা শুধু মাথা দিয়ে লড়াই করছে কোরাজ্জিনির সঙ্গে।

আমাদেরকে দেখে কোরাজ্জিনি পিস্তল বার করে তাক করল লেভিনের দিকে। আমি ছুটে গিয়ে ধাক্কা মারলাম কোরাজ্জিনিকে। কিন্তু তার আগেই সে গুলি করেছে বুড়ো মানুষটিকে। গুলি খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লেভিন। সাদা বরফ ভিজে লাল হয়ে গেল। লেভিন নড়াচড়া করছে না।

জনি যাগেরো তার পায়ের কাছে পড়ে থাকা শরীরটির দিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। তিনটি লম্বা সেকেন্ড প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে রইল যাগেরো। তারপর যখন ঘুরে দাঁড়াল কোরাজ্জিনির দিকে, যাগেরোর মুখ নিষ্প্রাণ এবং ভাবলেশশূন্য দেখাল।

আমার ধাক্কা খেয়ে কোরাজ্জিনির হাত থেকে পিস্তল ছিটকে পড়েছে আগেই। যাগেরোর চেহারা দেখে ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেল। ছুটে পালাবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু যাগেরোর গতি তার চেয়ে অনেক দ্রুত। সে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল কোরাজ্জিনির ওপর। দুজনে আছড়ে পড়ল মাটিতে। উন্মাদের মতো একে অন্যকে লাথি, ঘুষি, খামচি মারছে।

'পিস্তল ফেলে দাও।' পেছন থেকে শোনা গেল স্মলউডের লৌহকঠিন কণ্ঠ। আমি চট করে ঘুরে দাঁড়ালাম। মার্গারেট রস তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ভয়ে রক্তশূন্য চেহারা। তার পেছনে, কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে স্মলউড। তবে তার মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।

'অস্ত্র ফেলে দাও! দুজনেই। এখুনি ফেলে দাও!'

ইতস্তত করলাম আমি। তাকালাম হিলক্রেস্টের দিকে। একটা গুলির আওয়াজ হল। আর্তনাদ করে উঠল মার্গারেট। স্মলউড তার বাম হাতের কনুইয়ের ঠিক নিচে গুলি করেছে।

'জলদি'। দাবড়ে উঠল স্মলউডল। 'পরের গুলিটা ওর কাঁধে ঢুকবে।'

আমরা আমাদের রাইফেল ফেলে দিলাম, ওর আদেশ পালন করলাম আবার। লাথি মেরে ওগুলো সরিয়ে দিলাম সবচেয়ে কাছের ফাটলটির কিনারে। দেখছি কোরাজ্জিনি আর যাগেরো বরফের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে। একজন আরেকজনের বুকের ওপর উঠে পড়ছে, পরমুহূর্তে তাকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়ে অপরজন তার বুকে উঠে দমাদম ঘুষি মেরে কাবু করার চেষ্টা করছে। স্মলউড পিস্তল তাক করে রইল ওদের দিকে। সুযোগ পেলেই গুলি করবে যাগেরোকে।

সারারাত হাঁটার দারুণ ক্লান্তি এবং ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতজোড়া কোরাজ্জিনির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যাগেরোকে মুশকিলে ফেলবে ভেবেছিলাম। কিন্তু আহত হাত নিয়েই সে কোরাজ্জিনিকে ঘুষি মেরে তার জান কয়লা করে দিচ্ছিল।

আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরণপণ লড়াই দেখছি, হিলক্রেস্ট হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরল। 'উনি নড়াচড়া করছেন ম্যাসন। উনি বেঁচে আছেন!' সলি লেভিনের দিকে হাত তুলে দেখাল সে। আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম লেভিনের পাশে। সত্যি নিঃশ্বাস নিচ্ছে সে। বরাত জোরে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে ফিরেছে বুড়ো মানুষটা। মাথার পাশে গুলি লেগেছে।

ওরা দু'জন এখনো উন্মত্ত লড়াইয়ে মত্ত। কোরাজ্জিনি হঠাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একছুটে কতগুলো পাথরের আড়ালে চলে গেল। তার পেছন পেছন বেড়ালের মতো ছুটল যাগেরো। এত জোরে দৌড়াচ্ছে, স্মলউডের ছোড়া বুলেটও তাকে স্পর্শ করতে পারল না। যাগেরো আবারও মাটিতে গেড়ে ফেলল কোরাজ্জিনিকে। আর্তনাদ শুনলাম তার। পাথরের আড়ালে চলছে দুজনের মারপিট। শুধু ঘুষি মারার শব্দ শুনছি। কে কাকে মারছে বোঝা যাচ্ছে না। একটু পরে রক্ত হিম করা একটা চিৎকার শুনতে পেলাম, তারপর তীব্র ব্যথার গোঙানি। এরপরে সব চুপচাপ।

পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল যাগেরো। তার নাকে-মুখে কালশিটে দাগ, কেটে ছরে গেছে, হাতের ব্যান্ডেজ রক্তে লাল।

'শেষ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'শেষ।'

'গুড। তোমার বাবা বেঁচে আছেন, জনি। গুলির আঘাতে তার শুধু মাথার চামড়া ছিলে গেছে। আর কোনো ক্ষতি হয়নি।'

খুশির আনন্দ ছড়িয়ে পড়ল যাগেরোর চোখে-মুখে, সে একছুটে চলে গেল বাপের কাছে, বসল পাশে হাঁটু মুড়ে। আমি দেখলাম স্মলউড যাগেরোর পিঠ লক্ষ্য করে তাক করেছে পিস্তল।

'না, স্মলউড!' চিৎকার দিলাম আমি। 'তোমার পিস্তলে মাত্র তিনটে বুলেট আছে।'

স্মলউড ঘুরল। নির্দয়, শীতল চোখ মেলে দেখল আমাকে। আমার কথার মাজেজা বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল। বুলেট তিনটা হয়তো তার পরে কাজে লাগবে। তার কাছে দাঁড়ানো জ্যাকস্ট্রর দিকে ফিরে হুকুম দিল, ট্রাক্টর কেবিন থেকে আমার রেডিওটি নিয়ে এসো। ওটা এখানে রেখে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দাও– আর আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিই।' গ্লেসিয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'নাকি ওদেরকে তোমরা লক্ষ্যই করোনি?'

সত্যি আগে দেখতে পাইনি। এখন দেখতে পেলাম। ফিশিংবোটের প্রথম লোকটি পৌঁছে গেছে গ্লেসিয়ারের পাদদেশে। একটু পরেই ওদের

দলের ছয়/সাতজন পিচ্ছিল বরফ মাড়িয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। হাসল স্মলউড। 'ওরা আমার ওয়েলকামিং পার্টি। তোমরা সবাই এখানে থাকবে। আমি মিস রসকে নিয়ে যাচ্ছি ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কেউ নড়াচড়া করবে না।'

ওরই জিত হল। আর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ও চলে যাবে। নিরাপদ অবস্থানে। রেডিও তোলার জন্য ঝুঁকল স্মলউড, তারপর বিস্মিত চোখে তাকাল আকাশের দিকে।

শব্দটা আমিও শুনেছি। এবং জানি ওটা কী। চারটা প্লেন আসছে আমাদের কাছে। বৃত্তাকারে, নিচু দিয়ে উড়ছে।

'ওগুলো আমাদের প্লেন, স্মলউড,' ভয়ঙ্কর গলায় বললাম আমি।

'আমি ওদেরকে রেডিওতে খবর দিয়ে এনেছি। ওদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে গ্লেসিয়ারের ধারে কোনো লোককে, যে কোনো লোককে হাতে কোনো কেস বা রেডিও দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করবে।' কথাটা মিথ্যা তবে তা স্মলউডের জানার কথা নয়।

'প্লেন যতক্ষণ ইচ্ছা থাকুক,' শান্ত গলায় বলল স্মলউড, 'আমার কোনো সমস্যা নেই। কারণ জানি যতক্ষণ তোমরা আমার বন্দি কেউ আমার চুল স্পর্শ করার সাহসও পাবে না। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘনিয়ে আসবে অন্ধকার। তখন আমি পালাবো।'

'তুমি পরাজয় স্বীকার করে নিচ্ছ না কেন, স্মলউড,' বললাম আমি। এই উন্মাদটার পিছু নেয়ার কোনো আশাই দেখতে পাচ্ছি না। তবু কথা চালিয়ে যেতে লাগলাম। কথা চালিয়ে যাচ্ছি কারণ একটা জিনিস আমার চোখে পড়েছে। ও ঘুরলে ও-ও দেখতে পাবে ব্যাপারটা। কিন্তু ওকে দেখতে দেয়া যাবে না। 'শোনো, স্মলউড। ওই প্লেনগুলোতে বোমাও আছে। ওরা কেন বোমা এনেছে, জানো?'

বারোজন মানুষ নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে, গ্লেসিয়ারের অপর পাশ দিয়ে। ওরা আমাদের লোক, এসেছে এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থেকে। ওরা সম্ভবত মেরিন, হাতে শক্তিশালী অস্ত্র।

'কারণ ওরা তোমাদেরকে এখান থেকে জীবিত ফিরতে দেবে না, স্মলউড'।

মেরিনরা কেন এত ধীরলয়ে অগ্রসর হচ্ছে? স্মলউডকে আরো ত্রিশ সেকেন্ড কথায় ব্যস্ত রাখতে হবে।

'ওরা ওই ফিশিংবোট ধ্বংস করে দেবে স্মলউড।'

স্মলউডের ওয়েলকামিং পার্টি, এখনো বেশ দূরে, তারা মেরিনদেরকে

দেখে ফেলে এবং চিৎকার করে হাত নাড়ছে। আমি আরো জোরে জোরে কথা বলতে লাগলাম যাতে ওদের চিৎকার-চেঁচামেচি স্মলউডের কানে না যায়। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। দলের লোকদের চেঁচামেচি শুনতে পেয়েছে স্মলউড, ঘুরল সে, এবং দেখতে পেল মেরিনদেরকে। তার চেহারা এবং কণ্ঠস্বর বদলে গেল। মানুষ নয়, এখন ওকে লাগছে একটি বন্য জন্তুর মতো।

'কারা ওরা?' হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'ওরা এখানে কী করছে?'

'তোমার কাছ থেকে মিসাইল মেকানিজম কেড়ে নিতে ওদেরকে পাঠানো হয়েছে,' জবাব দিলাম আমি। 'প্রয়োজনে তোমাকে হত্যা করতেও ওরা দ্বিধা করবে না। খেলা শেষ, স্মলউড। তোমার অস্ত্রটা দিয়ে দাও।'

ভয়ঙ্কর একটা গর্জন ছেড়ে মার্গারেটকে ধাক্কা মেরে সামনে ঠেলতে ঠেলতে স্মলউড এক লাফে উঠে পড়ল ট্রাক্টরের ড্রাইভিং কেবিনে। আমি লাফিয়ে উঠে পড়লাম ট্রাক্টরের দরজায়। 'ওরে উন্মাদ! তুই তো নিজে মরবিই! মেয়েটিকেও মেরে ফেলবি–'

খুক করে কেশে উঠল স্মলউডের হাতে পিস্তল। আমার হাতে যেন কেউ জ্বলন্ত লোহার শিক চেপে ধরল। ছিটকে পড়ে গেলাম বরফের ওপর স্মলউড ট্রাক্টরের ব্রেক রিলিজ করে দিতেই। ট্রাক্টর চলতে শুরু করেছে, জ্যাকস্ট্র এক লাফে এসে আমাকে ট্রাক্টরের সামনে থেকে টেনে সরিয়ে নিল। নইলে আরেকটু হলেই বিরাট চাকাগুলোর নিচে আমার ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যেত।

আমি সিধে হয়েই ট্রাক্টরের পেছন পেছন দৌড়াতে শুরু করলাম। আমাকে অনুসরণ করল জ্যাকস্ট্র। এদিকটাতে গ্লেসিয়ার বড্ড ঢালু আর পিচ্ছিল। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল ট্রাক্টর। ডানে-বামে কাত হতে শুরু করল। তারপর ঘুরে গিয়ে অর্ধবৃত্ত করে গ্লেসিয়ারের গা বেয়ে পেছন দিকে হড়কে যেতে লাগল। বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে কতগুলো বড় পাথরের দিকে। ওগুলোর গায়ে আছড়ে পড়লে আর দেখতে হবে না। পটল তুলবে সঙ্গে সঙ্গে।

ট্রাক্টরের কাছ থেকে শ মিটার দূরে আমি আর জ্যাকস্ট্র, দেখলাম ওটা একটা বরফ-পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে বোঁবোঁ করে ঘুরতে লাগল, তারপর রওনা হয়ে গেল বড় পাথরগুলো অভিমুখে। ধাক্কা খেল একটা বড় পাথরের সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভিং কেবিন থেকে ছিটকে পড়ে গেল স্মলউড আর মার্গারেট। দেখলাম স্মলউড সেই রেডিওটি আঁকড়ে ধরে আছে। ওরা ডিগবাজি খেতে খেতে অদৃশ্য হয়ে গেল হিমবাহের একটি ফাটলের মধ্যে।

আর তক্ষুনি গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। আমি আর জ্যাকস্ট্র লাফ মেরে বরফ জমিনে শুয়ে পড়লাম যাতে গায়ে গুলি না লাগে। দুটো প্লেন গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে উড়ছিল। ওরাই গুলি করেছে স্মলউডের লোকজন লক্ষ্য করে। ফিশিংবোটের লোকগুলো এ হামলায় দিশেহারা হয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে লাগল।

ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেছে, যে ফাটলের মধ্যে ছিটকে পড়েছে স্মলউড আর মার্গারেট সেখানে এসে উঁকি দিলাম। ওটা চওড়ায় এক মিটারেরও কম আর স্বস্তি নিয়ে দেখলাম গভীর হবে মাত্র পাঁচ মিটার। ফাটলের তলায় পাথরের নিরেট তাকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে স্মলউড এবং মার্গারেট।

আমার দিকে মুখ তুলে চইল স্মলউড, পিস্তলটা মার্গারেটের কপালে ঠেকিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'একটা রশি ফেলে দাও, ম্যাসন। একটা রশি নিয়ে এসো। এ ফাটলটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পায়ের নিচে নড়াচড়া করছে বরফ।'

মিথ্যা বলেনি সে। গ্লেসিয়ার নড়তে শুরু করেছে। জানতাম পশ্চিম গ্রিনল্যান্ডের উপকূলের গ্লেসিয়ার অবিশ্বাস্য গতিতে ছুটে আসছে এদিকে। আমিও টের পেলাম আমার পায়ের নিচে মৃদু আন্দোলিত হল বরফ।

'জলদি!' স্মলউড নিয়ন্ত্রিত কণ্ঠে আর্তি জানাল। 'জলদি করো নইলে ওকে আমি মেরে ফেলব!'

আমি জানতাম ও মিথ্যা হুমকি দিচ্ছে না।

'ঠিক আছে,' শান্ত গলায় বললাম আমি। কাঁধ থেকে রশি খুলে নিয়ে উঁচু করে ধরলাম। 'এই নাও।'

স্মলউড দুহাত তুলল ছুড়ে দেয়া রশি ধরার জন্য। আমি ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর গায়ে শরীরের সমস্ত ওজন নিয়ে। ওর কিছু করার ছিল না। ফাটলটা এমনই সরু, সরে যাবার উপায় ছিল না স্মলউডের।

পাথুরে তাকের ওপর আছড়ে পড়লাম দুজনই। ওর গলা চেপে ধরলাম দুহাতে। মাথাটা বাড়ি দিতে লাগলাম হিমবাহের ফাটলের দেয়ালে। স্মলউড আমাকে লাথি মারছে, ধস্তাধস্তি করছে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জন্য; কিন্তু আমি ওকে ছাড়লাম না। মেরে তুলোধুনো করলাম।

বরফ দ্রুত সরতে শুরু করেছে। ফাটলের দুটো দেয়ালের মাঝে এখন ফাঁক মাত্র পঁয়তাল্লিশ সেন্টিমিটার। মার্গারেট ওপরে, নিরাপদে আছে। জ্যাকস্ট্র ওকে ফাটল থেকে তুলে নিয়েছে হিলক্রেস্ট এবং তার লোকদের সহায়তায়। মার্গারেটের কোমরে রশি পেঁচিয়ে ওকে তুলে নেয়া হয়েছে।

আমার শরীর দুর্বল, চোখে ঝাপসা দেখছি। শুনতে পেলাম একটা রশি ছুড়ে দিয়ে চিৎকার করছে জ্যাকস্ট্র, 'জলদি, ড. ম্যাসন! যে কোনো মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে ফাটল।'

'আমি আসছি', জবাব দিলাম আমি। 'তবে আরেকটা রশি ফেলো মিসাইল মেকানিজমটা তুলে নেয়ার জন্য। এত কষ্টের পরে তাকে হারাতে চাই না।'

কুড়ি সেকেন্ড পরে আমি ফাটলের ওপরে উঠে এলাম। আরও পাঁচ সেন্টিমিটার সরল বরফ। শুনতে পেলাম স্মলউডের কণ্ঠ। 'আমাকে একটা রশি দাও। ঈশ্বরের দোহাই লাগে, ওপরে ওঠার জন্য আমাকে একটা রশি দাও।'

আমার মনে পড়ে গেল কতগুলো মানুষকে হত্যা করেছে এই স্মলউড। তার কারণে প্রায় প্রাণ হারাতে বসেছিলেন মেরি লিগার্ড এবং মাহলার। এই নিষ্ঠুর, নির্দয় খুনিকে কোনো দয়া প্রদর্শন নয়। আমি জ্যাকস্ট্রর দিকে তাকালাম। ওর হাতে একটা রশি আছে। কিন্তু ওর চেহারাতেও ফুটে আছে স্মলউডের জন্য প্রবল ঘৃণা। ফাটলের কিনার থেকে সরে গেল সে, হাতের রশিটা মাথার ওপর একপাক ঘুরিয়ে নিক্ষেপ করল নিচের মানুষটার দিকে। আর ঠিক তখন ফাটলটা সম্পূর্ণ বুজে গেল। বোঝার উপায় নেই কিছুক্ষণ আগেও এখানে একটা গর্ত ছিল আর গর্তের মধ্যে একটা মানুষ ছিল।

আমরা ঘুরে দাঁড়ালাম। আমি আর জ্যাকস্ট্র দুজনের মাঝখানে মার্গারেট রসকে নিয়ে কদম বাড়ালাম মেরিনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। আমাদের পায়ের নিচে আরেকবার থরথর করে কেঁপে উঠল হিমবাহের বরফ।

মূল কাহিনি : অ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিনের *'নাইট উইদাউট এণ্ড'*

